অ ন ন্যা পা ল
পুষ্পকেতুর
পঞ্চরহস্য
(সমুদ্রগুপ্তের সময়কালীন রহস্য গল্প)

অনন্যা পাল
পুষ্পকেতুর
পঞ্চরহস্য
(সমুদ্রগুপ্তের সময়কালীন রহস্য গল্প)

পুষ্পকেতুর পঞ্চরহস্য

পুষ্পকেতুর পঞ্চরহস্য

(সমুদ্রগুপ্তের সমকালীন গোয়েন্দা গল্প)

অনন্যা পাল

উৎসর্গ

আমার এই বইটি জগতের সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ
করলাম, যাঁর আশীর্বাদে বাধাবিপদ অতিক্রম
করে আমার সৃষ্টিকর্ম চালিয়ে যেতে পারছি।

ভূমিকা

ছোটবেলা থেকেই গোয়েন্দা গল্প ও ঐতিহাসিক গল্প আমার সবচেয়ে বেশী পছন্দের, ভারতবর্ষের হিন্দু যুগের সম্পর্কেও আগ্রহ সেই তখন থেকেই। লেখালেখি করতে শুরু করলাম কয়েক বছর আগে, নিজের পছন্দ বলেই রহস্য গল্প লিখতে শুরু করি, ঐতিহাসিক গল্প তো লিখতামই। একসময় মনে হল দুটো ধারাকে মিলিয়ে গল্প লিখলে কেমন হয়? সেই ভাবনা থেকেই আমার গোয়েন্দা পুষ্পকেতুর জন্ম; সে সমুদ্রগুপ্তের আমলের একজন তরুণ। আসলে গোয়েন্দা গল্পের আড়ালে, আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের স্বর্ণযুগকে তুলে ধরার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এটি।

এই বইয়ের প্রথম দুটি ছোটগল্প 'একদা নিশীথে' ও 'গহীন গরল' আমার প্রথম বই 'পুষ্পকেতু' তে প্রকাশিত হয়েছিল, বড় গল্প 'ছায়াময়' প্রকাশ পায় সাপ্তাহিক বর্তমানে নভেম্বর ২০১৯ এ, অন্য বড় গল্প 'প্রহেলিকা' ও উপন্যাসিকা 'ধুম্রজটিল' এই বইটিতে প্রথম প্রকাশিত হল।

এই বইটি প্রকাশের জন্য আমি প্রকাশক আরুনাভ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, নতুন ধারার কাজকে উৎসাহ দিতে তিনি যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য।

অনন্যা পাল

সূচিপত্র

একদা নিশীথে

ফাল্গুন প্রভাত, পাটলীপুত্রের একটি সুসজ্জিত উদ্দ্যানবাটিকার এক নিভৃত কক্ষ; জানালার পাশে রাখা পশমের আসনে বসে আছেন এক তরুণ, দীর্ঘ সুঠাম দেহ, কান্তিমান বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী। জানালার বাইরে চোখে পড়ে মনোরম কুঞ্জবীথি, সেখানে নব বসন্ত সম্ভারে প্রকৃতি অনুপমা; তবে তরুণের মন নেই সেদিকে, তিনি নিবিষ্ট হয়ে আছেন সামনের লেখন পীঠিকার ওপর। পীঠিকার একপাশে খোলা সূর্যসূত্র পুস্তক, আর সামনে রাখা লেখপট; তিনি দুরূহ জ্যামিতিক প্রহেলিকায় ভরিয়ে তুলছেন সে লেখপট একান্ত আগ্রহে। কোমল সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে তাঁর শ্বেত-শুভ্র উন্মুক্ত কাঁধে, ঘাড়ের কাছে মৃদু বাতাসে দুলছে কুঞ্চিত কেশ। আচমকা এক শুকশারী যুগলের প্রেম কলহে শান্তিভঙ্গ হয় বাগানের, চমকে বাইরে তাকিয়ে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে তরুণের ঠোঁটে; কমনীয় সে হাসিতে হালকা কৌতুক খেলা করে যায়; শুকনো গাণিতিক বিদ্যা যে তাঁর রসবোধ ক্ষুণ্ণ করেনি তা বোঝা যায় মুহূর্তেই। তরুণের নাম পুষ্পকেতু, সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বৈমাত্রেয় ভাই বিশাখগুপ্ত তাঁর পিতা। নামের মাহাত্ম্য রেখে পুষ্পকেতু সত্যিই রূপে কামদেব, তবে রাজকুলে জন্মেও যুদ্ধ পিপাসার থেকে জ্ঞানপিপাসা তাঁর অধিক; বাকি কুমারেরা যখন মৃগয়া বিহারে অবসর যাপন করেন, পষ্পকেতু গণিতের প্রহেলিকা সমাধানে ব্যস্ত রাখেন নিজেকে। তবে আরেকটি বিষয়েও তাঁর গভীর আসক্তি, সে হল সঙ্গীত; একারণেই প্রায় পিতৃব্যতুল্য সঙ্গীতজ্ঞ মহামন্ত্রী হরিষেণের সাথে তাঁর নিবিড় সখ্যতা, যা অনেককেই বিস্মিত করে।

বিশাখগুপ্ত পাটলীপুত্রের মহাদণ্ডনায়ক; নগরী ও তৎসংলগ্ন জনবীথির আইনশৃঙ্খলা রক্ষার গুরুদায়িত্ব সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত অর্পণ করেছেন তাঁর অতিপ্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে। তবে স্নেহ বশে নয়, ভ্রাতার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ন্যায়নিষ্ঠতার প্রতি আস্থা রেখেই বিচক্ষণ সম্রাট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দীর্ঘ বারো বছর ধরে সে দায়িত্ব সুনিপুণ ভাবে পালন করে চলেছেন বিশাখগুপ্ত। তাঁর এই দায়িত্বভার পুষ্পকেতু গ্রহণ করবেন ভবিষ্যতে এমন আশা রাখেন মহাদণ্ডনায়ক; মেধাবী পুত্রের মানবিক গুণের কারণে মনে মনে সমীহ করেন তাকে, প্রয়োজনে পরামর্শ নিতেও দ্বিধা করেননা বিচারসংক্রান্ত সমস্যায়।

'এমন বসন্ত প্রভাতে সখা কি জাগতিক রস ভুলে জ্যামিতিক প্রণয়ে লিপ্ত?' কক্ষে প্রবেশ করেন এক সুবেশ তরুণ, বয়স পুষ্পকেতুর মতই, ভারি প্রসন্নতা মাখা তাঁর ব্যাক্তিত্ব। ঈষৎ হেসে মুখ তুলে তাকান কুমার, বাল্যসখা উল্মুককে দেখে পরিহাস ফুটে ওঠে তাঁর চোখে। অক্ষপটবালাধিকৃত অগ্রসেন, মগধ সাম্রাজ্যের আয়-ব্যায়ের হিসাব ব্যবস্থার আধিকারিক; উল্মুক তাঁরই পুত্র, বর্তমানে পিতার তত্ত্বাবধানে শিক্ষানবিশি করছেন পুস্তপালের দপ্তরে।

'চম্পক ফুটেছে তোমার মালঞ্চে, ঋতুরাজের সংবাদ তুমিই তো রাখবে হে; আমার বর্ণহীন জীবনে জ্যামিতিতেই শান্তি।' সম্প্রতি উল্মুকের বিবাহ স্থির হয়েছে, কন্যাটির নাম চম্পা, পুষ্পকেতুর ইঙ্গিত সেইদিকেই।

'বর্ণহীন নও, তুমি বর্ণচোরা' কথাটি বলে হেসে আসন গ্রহণ করেন উল্মুক।

'তোমার গৃহের দ্রাড়িম্ব বৃক্ষটি এ বৎসর এখনও ফলবতী?'

'অ্যাঁ?' পুষ্পকেতুর অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে উল্মুক স্বভাবতঃই বিস্মিত।

'প্রাতের ফলাহারে দ্রাড়িম্ব ভক্ষণ করেছ, উত্তরীয়ের রক্তচিহ্ন জানান দিচ্ছে সেকথা।'

'দ্রাড়িম্বই যে জানলে কিরূপে?'

‘তাম্বুলে তোমার রুচি নেই, খয়ের নয় অতএব, জ্যামিতিক হিসাব’, কৌতুক খেলা করে পুষ্পকেতুর চোখে।

‘আরও কিছু বলে নাকি তোমার জ্যামিতি?’

‘জ্যামিতি নয় মিত্র, পর্যবেক্ষণ; কোনও কারণে তুমি আজ বিচলিত। বেশবাসে যত্নের অভাব, সুগন্ধ মাখতে ভুলেছ, তবে কোনও বিপর্যয় ঘটেনি, নতুবা হাস্যপরিহাস করতে না। ঘটনা কি বিবাহসংক্রান্ত?’

‘তুমি কি আজকাল তন্ত্রসাধনা করছ কেতু?’ বিমূঢ় দেখায় উল্মুককে।

‘শশ্রুদেবের আগমন ঘটেছে আজ, সঙ্গে বিস্তর উপঢৌকন। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বিবাহের জন্যে শুভ, জানিয়েছেন জ্যোতিষাচার্য’ প্রিয়সখার সলজ্জ স্বীকারোক্তিতে স্নেহাসিক্ত হয়ে ওঠে পুষ্পকেতুর মুখের ভাব।

***

মহাদণ্ডনায়কের কার্যালয় সকাল থেকেই ব্যস্ততামুখর; পিতার সাথে সভামণ্ডলীতে রয়েছেন পুষ্পকেতুও, আজ সকালে পরিস্থিতি বিশেষ গম্ভীর। গণিকা চারুশীলা এসেছে এক অদ্ভুত অভিযোগ নিয়ে, সঙ্গে নটীশ্রেষ্ঠা মদনপ্রিয়া; সাধারণ নাগরিকা নন এঁরা, সম্মানীয় রাজপুরুষদের কৃপাভোগী, অতএব ঘটনার গুরুত্ব অধিক।

‘শ্রেষ্ঠী পিনাকপাণি আমার গৃহে আসেন বেশ কিছুকাল হল; স্নেহ করেন আমায়; বস্ত্র ব্যাবসায়ী, সম্পন্ন ব্যাক্তি। সম্প্রতি উৎকৃষ্ট রেশমবস্ত্র এসেছে সুদূর প্রাচ্য থেকে, খরিদ করে সরবরাহ করতে চান মগধের বর্ধিষ্ণু জনবসতিগুলিতে জানিয়েছিলেন সেকথা। বস্ত্রসম্ভার মহার্ঘ, অর্থমূল্যে অকুলান ঘটেছিল, আমার গহনাগুলি চেয়েছিলেন সেকারণে কিছুদিনের জন্যে। বন্ধক রেখে মূল্য পরিশোধ করবেন, বাণিজ্যে অচিরেই ফেরত আসবে অর্থ, গহনাও ফেরত দেবেন, সাথে আরও উপঢৌকন’, ধীরে ধীরে নিবেদন করে চারুশীলা।

‘গহনা প্রত্যার্পনের সময় কি ফুরিয়েছে?’ প্রশ্ন করেন দণ্ডনায়ক।

‘না সময় পার হয়নি দেব।’

‘তবে সমস্যা কোথায়?’ চারুশীলা নিরুত্তর, ছলছল আঁখি, উত্তর দেয় মদনপ্রিয়া।

‘শ্রেষ্ঠীর জীবৎকাল ফুরিয়েছে, দশ দিবস পূর্বে অমানিশায় হত হয়েছেন তিনি।’

‘অহোঃ, ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন কি?’

‘না দেব, রাতের অন্ধকারে হিরণ্যবতীর জলে আত্মাহূতি দিয়েছেন শ্রেষ্ঠী।’এখনও সমস্যা কিসে বুঝতে পারেননা দণ্ডনায়ক, সময় দেন নারীদ্বয়কে ব্যাখ্যা করার।

‘শ্রেষ্ঠীপত্নী জানিয়েছেন গহনা বিষয়ে তিনি অবহিত নন’; ‘গৃহে সন্ধান করেও পাওয়া যায়নি একটি গহনাও। শ্রেষ্ঠীপত্নী আমাদের তঞ্চকতার অপবাদ দিচ্ছেন আর্য, বলছেন মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কল্পকথা রচনা করেছি’ কেঁদে ওঠে চারুশীলা।

‘হুমম...বুঝেছি; কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ছিল কি গহনা প্রদান কালে?’ হতাশ মুখে অসম্মতি জানায় গণিকা।

‘তোমরা গৃহে যাও চারুশীলে, আমরা অনুসন্ধান করব যথাসাধ্য। যদি সত্য হয় তোমার কাহিনী, ন্যায় থেকে বঞ্চিত হবে না; তবে মিথ্যাচার করে থাকো যদি শাস্তি পেতে হবে মনে রেখো সেকথা।’

‘এবিষয়ে তোমার কি মত পুত্র?’ নারী দুজন প্রস্থান করলে প্রশ্ন করেন বিশাখগুপ্ত।

‘মতামত প্রদানের পূর্বে কিছু অনুসন্ধান প্রয়োজন; আজ্ঞা পেলে চেষ্টা করতে পারি।’

‘এহেন জটিল সমস্যা প্রতিদিন আসেনা, সুবিচারের লক্ষ্যে সাবধানতা প্রার্থনীয়; তোমার বিবেচনার উপর আমি আস্থাশীল কেতু, তুমি তথ্য সংগ্রহ করো, আমি অনুমতি দিলাম।’

শীতকাল সদ্য শেষ হয়েছে, অপরাহ্নের রৌদ্র এখনও মিঠে লাগে; পাটলীপুত্রের প্রাকারের বাইরে এক সম্পন্ন পল্লীতে পিনাকপাণির দ্বিতল গৃহটি ছোট হলেও সুশ্রী। বাড়ীর চারপাশের শ্যামলিমা সযত্ন লালিত, তবে ছায়াঘেরা বাসস্থান এই মুহূর্তে বড় বেশী স্তব্ধ মনে হয়। অশ্বদুটিকে কাছেই একটি বটবৃক্ষে বেঁধে,

বেড়ার দরজা খুলে উঠোনে প্রবেশ করেন পুষ্পকেতু ও উল্মুক। বন্ধুর কাছে অভিনব গণিকা কাহিনী শুনে আকৃষ্ট হয়েছেন উল্মুক, তথ্যসন্ধানে পুষ্পকেতুর সঙ্গী হয়েছেন তাই।

'গৃহে আছেন কেউ? আমরা মহাদণ্ডকারিকের কার্যালয় থেকে এসেছি, শ্রেষ্ঠানীর সাথে দেখা করতে চাই' হাঁক দেন পুষ্পকেতু। খুলে যায় ঘরের দরজা, নিঃশব্দে অলিন্দে এসে দাঁড়ায় এক রমণী, মোটা কাপাস বস্ত্রে সর্বাঙ্গ আবৃত; শ্রেষ্ঠানীর বয়স কম, শোকে তাপে শুকনো মুখখানি, তবু তার সুশ্রিতা চোখে পড়ে।

'গৃহমধ্যে আমি একা, তাই আপনাদের অন্দরে আপ্যায়নে অক্ষম, দয়া করে এস্থানেই আসন গ্রহণ করুন'; দুখানি বেত্রাসন বিছিয়ে বলে ওঠে সে।

'আত্মীয় কেউ সাথে নেই আপনার'?

'স্বামী বাল্যকালেই অনাথ, অন্যের গৃহে বড় হয়েছেন; আত্মীয় পাই কোথায়?'

'পিতৃকুলের কেউ আসেননি! এ অবস্থায় সম্পূর্ণ একা থাকা সহজ তো নয়' পুষ্পকেতুর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটে ওঠে।

'আমার পিত্রালয় উজ্জয়িনী, পাটলীপুত্রে কেউ নেই; আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না দেব, একটি দাসী রাত্রে সঙ্গে থাকে।'

'অহোঃ, উত্তম। প্রথমেই আমাদের আগমনের কারণটি আপনাকে জানাই; চারুশীলা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে গহনা আত্মসাতের, সে বিষয়ে কয়েকটি তথ্য জানতে চাই।'

'অনুমান করেছিলাম কতক এরকমই; আপনি প্রশ্ন করুন'; শ্রেষ্ঠানির চেহারায় দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

'যে রাতে শ্রেষ্ঠী হত হন সেই রাত্রির ঘটনা জানতে চাই, নদীতটে যাবার কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল কি?'

'উনি প্রতিদিনের মতই অপরাহ্নে বন্দর-সংলগ্ন আড়ঙ্গে গিয়েছিলেন, ফিরতে বিলম্ব দেখে পল্লী প্রধানকে সংবাদ পাঠাই। তিনি সেখানে গিয়ে জানতে পারেন স্বামী গৃহের পথে রওয়ানা হয়েছেন। পরে জঙ্গল ও নদীতটে সন্ধান করতে গিয়ে ওঁর উত্তরীয়, উষ্ণীষ ও পাদুকা জোড়া খুঁজে পান নদীর এক খাড়াইয়ে।'

'দেহ পাওয়া যায়নি?'

'গিয়েছিল বোধকরি তিনদিন পরে, আমাকে দেখতে দেননি পল্লীপ্রধান।' সদ্যবিধবার দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠে বাতাস।

'আমাদের মার্জনা করবেন' বিব্রত দেখায় তরুণদ্বয়কে। একটু সময় নিয়ে আবার শুরু করেন পুষ্পকেতু।

'শ্রেষ্ঠী সম্প্রতি যে চৈনিক রেশমের বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন, সে ব্যাপারে কিছু তথ্য জানার ছিল।'

'শ্রেষ্ঠী কোনও রেশম-পণ্য খরিদ করেননি, ওঁর লেনদেন কাপাস ও মসলিন বস্ত্রের।'

'সম্প্রতি ব্যবসায় বৃদ্ধিতে মনযোগী হননি তিনি?'

'ব্যবসায়ে চূড়ান্ত অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন গত ছয়মাসকাল যাবৎ।'

'বিষয়টি একটু বিশদে বর্ণনা করুন ভদ্রে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে সব কথা জানা দরকার' পুষ্পকেতুর কপালে চিন্তারেখা ফুটে ওঠে।

শ্রেষ্ঠানী বল্লরিকা সময় নেয় কিছুটা, অতঃপর ধীরে ধীরে যা ব্যক্ত করে তা এইপ্রকার। পিনাকপাণি কিশোর বয়সে পিতা মাতাকে হারিয়ে এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় গৃহে আশ্রয় পান; পিতৃব্যতুল্য গৃহস্বামী পেশায় বস্ত্রব্যবসায়ী। তাঁর বিপণিতে সহায়কের কর্ম করতেন পিনাকপাণি, সেখানেই পরিচয় উজ্জয়িনীর বস্ত্র কারবারী সমরদত্তের সাথে। মধ্যবয়স্ক সম্পন্ন শ্রেষ্ঠীর ভালো লাগে কর্মদ্যোগী তরুণকে, সঙ্গে নিয়ে যেতে চান উজ্জয়িনীতে, রাজী না হওয়ায় তাকে পাটলীপুত্রে নিজস্ব প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কালক্রমে, নিজকন্যার সাথে বিবাহ দেন পিনাকপাণির; বসতবাটি ও স্বাধীন ব্যাবসায়ের অর্থপুঁজি সেও শ্রেষ্ঠী সমরদত্তের বদান্যতায়। বিবাহের বেশ কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত, মাঝে দুটি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে বল্লরিকা এখনও নিঃসন্তান।

‘শ্রেষ্ঠী দ্বিতীয়বার বিবাহের উদ্যোগ নেননি?’ জানতে চান পুষ্পকেতু।

‘পত্নীধনে বিত্তবান স্বামী, সপত্নী আনলে সম্মার্জনী প্রহারে গৃহছাড়া করতাম দুজনকে’ ; শ্রেষ্ঠানীর স্বভাবের প্রখরতা প্রকাশ পায় মুহূর্তেই ; পুষ্পকেতু ও উল্মুক দৃষ্টি বিনিময় করেন অলক্ষ্যে।

‘ব্যবসায়ে অমনোযোগী হবার বিশেষ কোনও কারণ ছিল কি? কোনও দুশ্চিন্তা বা রোগব্যাধি’?

‘ব্যাধি তো বটেই, চারুশীলা ব্যাধি জুটেছিল যে শ্রেষ্ঠীর ; আপনাদের প্রশ্ন শেষ হয়ে থাকলে আমি অন্দরে যাব, বেলা পড়ে এলো।’ দুই রাজপুরুষকে বিদায় করে বল্লরিকা প্রবল ঝঙ্কারে।

***

‘শ্রেষ্ঠানি যতটা রমণীয়, ততটা কমনীয় নন, কি বল হে?’ উল্মুক মন্তব্য করেন পথে।

‘তা বটে, তবে সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠেছে। দিবালোক থাকতে থাকতে চল একবার পল্লীপ্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করে আসি।’

কতগুলি ক্রীড়ারত বালকের থেকে পথনির্দেশ নিয়ে পৌঁছে যান দুজনে পল্লীপ্রধান বিষ্ণুদত্তের গৃহে ; ভাগ্যক্রমে গৃহস্বামী বাটিতেই ছিলেন, অতএব সাক্ষাৎ মেলে। বিষ্ণুদত্ত প্রৌঢ় তবে সুস্বাস্থের অধিকারি ; সম্পন্ন গৃহস্থ। বংশ পরম্পরায় গন্ধদ্রব্যের কারবার, পুত্রেরাই ব্যবসায় তত্বাবধান করে আজকাল, তিনি পল্লীসমিতির প্রধান হিসাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত রাখেন নিজেকে। প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ের শেষে কথাবার্তা শুরু হয়।

‘দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ঠিক কি ঘটেছিল যদি বর্ণনা করেন।’

‘তখন সায়াহ্ন গত, রাত্রি প্রগাঢ়-প্রায় ; গৃহের পুরুষদের আহার সম্পন্ন হয়েছে। পিনাকপাণির প্রতিবেশী-পুত্র এসে খবর দিল সে গৃহে ফেরেনি, শ্রেষ্ঠানী অতীব চিন্তিতা। অগত্যা আমি দুটি ভৃত্য ও আমার কনিষ্ঠপুত্রকে সাথে নিয়ে আড়ঙ্গে যাই। সেখানে গিয়ে শুনি, পিনাকপাণি সময়ের পূর্বেই ভাণ্ডারগৃহ থেকে বাহির হয়েছেন। অগত্যা আশেপাশের জায়াগাগুলি খুঁজে দেখি, এদিকে রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে, বাধ্য হয়ে গৃহে ফিরি।’

‘সেকি আপনারা নদীতটে সন্ধান করেননি সেরাত্রে?’

‘না করিনি, সে চিন্তা মনে আসেনি। শ্রেষ্ঠীর গনিকাগৃহে যাতায়াত আছে, তাই সেই সম্ভবনাই প্রবল মনে হয়েছিল ; শ্রেষ্ঠানিও সেরকমই কতক সন্দেহ করেছিলেন।’

‘হুমম.... নদীতটে সন্ধান করলেন কবে?’

‘পরদিন দিবাকালে। আসলে, সেদিন প্রাতে শ্রেষ্ঠানির প্ররোচনায় আমার একটি ভৃত্যকে পাঠাই গণিকালয়ে। সে ফিরে খবর দেয় গণিকা অস্বীকার করেছে শ্রেষ্ঠীর উপস্থিতি। বল্লরিকা মানতে নারাজ, তিনি নিজে সে স্থানে যেতে উদ্যোগী দেখে আমিই বলি আগে চারপাশ খুঁজে দেখা কর্তব্য। বহির্প্রান্তরের বনভূমি ও নদীতটে লোক পাঠাই, তারা এসে খবর দেয় খাড়াইয়ের এক বিপজ্জনক স্থানে একটি উষ্ণীষ, উত্তরীয় ও একজোড়া পাদুকা পড়ে আছে, মনে হয় যেন নদীজলে লম্ফনের পূর্বে পরিত্যক্ত হয়েছে। সম্ভবনার কথা চিন্তা করে শ্রেষ্ঠানিকে দেখানো হয় সেসব, তিনি শনাক্ত করেন ওগুলি তাঁর স্বামীর ব্যবহৃত সামগ্রী হিসাবে।’

‘মৃতদেহ সন্ধানের প্রচেষ্টা করেননি?’

‘করেছিলাম, আশেপাশের গ্রামগুলিতে খবর পাঠিয়ে, নদীতে জাল ফেলে, তিনদিন যাবৎ কোনও চেষ্টাই বাদ রাখিনি। নিকটেই গঙ্গা ও হিরণ্যপ্রভার সঙ্গমস্থল, খাড়াইয়ের বাঁকে নদী ভীষণা, তার উপর অমাবস্যার রাত্রি, স্রোতে ভেসে গঙ্গায় গিয়ে পড়ে থাকলে পাবার আশা থাকে না। তবু, তৃতীয় দিবসে সংবাদ আসে মহুলীগ্রাম থেকে, দুটি শব ভেসে এসেছে নদীপথে। দেখে চেনা অসম্ভব, তবে একটির অঙ্গের কর্ণকুণ্ডল ও

হস্ত বলয় দেখে সম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে করে গ্রামবাসীরা। পরে আভরণগুলি স্বামীর বলেই চিহ্নিত করেন বল্লরিকা।'একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাসের সাথে বর্ণনা সমাপ্ত করেন বিষ্ণুদত্ত।

'আপনার ভৃত্যটি, যে গণিকালয়ে শ্রেষ্ঠীর খোঁজে গিয়েছিল, তার সাথে বাক্যালাপ করা সম্ভব কি?' কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থেকে জিজ্ঞাসা করেন পুষ্পকেতু।

'অবশ্য, সে আমার ব্যাক্তিগত অনুচর। সুপর্ণ! সুপর্ণ!' হাঁক দেন পল্লীপ্রধান।

'গণিকালয়ে সেদিনকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর, ভীত হয়ো না, তোমার ক্ষতির কোনও আশঙ্কা নেই', প্রয়োজনীয় আশ্বাস প্রদান করে সূপর্ণকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন পুষ্পকেতু।

'তখন প্রাতঃকাল, গণিকালয়ের দু একটি দাসী ভিন্ন সকলেই নিদ্রামগ্ন। তাদেরই একজন চারুশীলার দাসীটিকে ডেকে দেয়। তাকে শ্রেষ্ঠীর কথা জিজ্ঞাসা করায় সে জানায় বিগত সন্ধ্যায় তিনি গিয়েছিলেন সেখানে, কিন্তু এখনও অন্দরে আছেন কিনা সে জানেনা। আমি কাকুতি মিনতি করায়, সে চারুশীলাকে খবর দেয়। অসময়ে নিদ্রাভঙ্গে গণিকা কুপিতা ছিলেন, নিজকক্ষের অলিন্দ থেকে আমাকে ভালমন্দ বলে বিদায় দেন; সঙ্গে একথাও জানান যে শ্রেষ্ঠী সেখানে নেই।'

'বেশ, তুমি এখন আসতে পারো।'এরপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে বিষ্ণুদত্তের গৃহ থেকে বিদায় নেন দুই মিত্র।

'কি বুঝলে হে?' উল্মুক জানতে চান ফেরার পথে।

'আগে বল তুমি কি বুঝলে?' প্রতিপ্রশ্ন করেন পুষ্পকেতু।

'কি জানি ভাই, গৃহস্বামিনীর প্রখরতার যে আঁচ পেলাম আজ, দেহত্যাগী না হোক গৃহত্যাগী হবার ইচ্ছা জাগরুক হওয়া অসম্ভব নয়।'

'কিন্তু রসময়ী প্রণয়িনী? সেদিকটা ভেবেছ কি?'

'না তা ভাবিনি, অত ভাবতে পারলে কি আর পুস্তপালের নীরস দপ্তরে যৌবন পাত করি?' নির্মল রসিকতায় লঘু হয় গম্ভীর আলোচনা, হেসে ওঠেন দুজনেই।

'কাল একবার গণিকালয়ে যাওয়া প্রয়োজন, সঙ্গী হতে চাও কি?' আহারান্তে প্রসঙ্গ তোলেন কেতু। বন্ধুগৃহে রাত্রিযাপনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন উল্মুক; যদিও উপলক্ষ তাঁর আশু বিবাহের আনন্দ উদযাপন, আসল উদ্দেশ্য ছিল রহস্যানুসন্ধানের বৃত্তকেন্দ্রে থাকা।

'গণিকালয়ে!' বন্ধুর প্রস্তাবে আতঙ্কিত দেখায় উল্মুককে।

'তুমি যাবে না কি সেখানে? মানে, চারুশীলাকেই কার্যালয়ে আনয়ন করালে হতো না?'

'না হে আমার প্রয়োজন শুধু চারুশীলার সাথে নয়, আমাকে যেতেই হবে। তবে তুমি যদি চম্পাবতীর কোপাগ্নির ভয়ে অরাজী থাকো, না হয় নাই গেলে'; কটাক্ষটি লক্ষভেদে সক্ষম হয়।

'চম্পাবতীর তোয়াক্কা কে করে, চলো কালই যাওয়া যাক!' রীতিমত উৎসাহিত শোনায় উল্মুকের কণ্ঠস্বর।

***

গণিকালয়টি পাটলীপুত্রের প্রাকারসীমার ভিতর হলেও নগরীর একপ্রান্তে। রাজপথের পাশেই একটি দ্বিতল অট্টালিকা, প্রধান দ্বারপথে সশস্ত্র দৌবারিক। প্রবেশদ্বার দিয়ে অন্দরে প্রবেশ করে একটি চতুষ্কোন অঙ্গন, তার চারিপাশ ঘিরে অট্টালিকার বিভিন্ন ভবন। একেকটিতে বাস করে একেকজন গণিকা নিজস্ব দাসী সহ। নটী মদনপ্রিয়া এখানকার প্রধানা, বাস করে বাটীর ভিতরভাগে একটি স্বতন্ত্র ভবনে, সুবিশাল দাসীবাহিনী তার। অঙ্গনের একপাশে প্রশস্ত নৃত্যমণ্ডপ, কারুকার্যময় তার চন্দ্রাতপ ও স্তম্ভসারি। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে সেখানে নৃত্যপরিবেশন করে মদনপ্রিয়া, অন্যসময়ে নৃত্যশিক্ষা চলে নবীনাদের। অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগে একটি অপ্ররিসর দ্বার, মূলতঃ শৌচকর্মীদের যাতায়াতের জন্য; তার বাইরে কিছুটা উদ্যান, আম্র ও পনস বৃক্ষের

ছায়াসন্নিবিষ্ট। আগে থেকে সংবাদ পাঠিয়ে গণিকালয়ে উপস্থিত হন পুষ্পকেতু ও উল্মুক, সঙ্গে আসা সহচরদের বাইরে রেখে আপাতত তাঁরা মদনপ্রিয়ার অতিথিশালায় অপেক্ষমান।

'বাইরে বসন্ত মলয়, কোকিলার কুজনে কান পাতা দায়, কামদেব এসেছেন মদনপ্রিয়ার কুঞ্জে; কি সেবা করতে পারি দেব?' কক্ষে প্রবেশ করে নটী, তার অধরে কৌতুক হাসি, কাজলনয়নে বিদ্যুৎ। পুষ্পকেতুর কর্নমূল রাঙা হয়, অস্বাচ্ছন্দ্য ফুটে ওঠে মুখের ভাবে।

'আমরা রাজকার্যে এসেছি, রসনা সম্বরন কর নটী' উল্মুক উদ্যোগী হন বন্ধুকে সাহায্য করতে।

'দেব কি কুপিত হচ্ছেন? দাসীর তবে মরণ ছাড়া গতি নেই' উল্মুককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মদনপ্রিয়া।

'চারুশীলার দাসীটির সাথে কিছু প্রয়োজন ছিল', এতক্ষণে নিজস্ব দৃঢ়তায় বলে ওঠেন পুষ্পকেতু।

'সেকি আমরা সকলে থাকতে শেষে চারুশীলার দাসী?' মুচকি হেসে নিকটবর্তী অনুচরীকে নির্দেশ দেয় মদনপ্রিয়া দাসীটিকে ডেকে আনতে।

'বার্তালাপ নির্জনে হওয়া প্রয়োজন।'

'সে তো অবশ্য, আমরা বিদায় নিচ্ছি, তবে স্মরণ করলেই দেখা পাবেন'; পরিহাসের বাণে বিদ্ধ করে বিদায় নেয় মদনপ্রিয়া। কপালের স্বেদবিন্দু মোছেন পুষ্পকেতু, বন্ধুর বিপর্যয়ে চকিত হাসি দেখা দেয় উল্মুকের ঠোঁটে।

চারুশীলার দাসী উপলার বয়স অল্প, দেখলে বোধ হয় মস্তিষ্কে বুদ্ধিও অল্পই, কোনও প্রশ্নের উত্তরই সে নিশ্চিত করে দিতে পারে না।

'শ্রেষ্ঠী পিনাকপাণি কতদিন হল যাতায়াত করতেন এখানে?'

'সে অনেকদিন।'

'অনেকদিন মানে কতদিন, ভেবে বল; অনেক বৎসর, না মাস?'

এরপর বহু চেষ্টায় তার কাছ থেকে যা জানা গেলো তা হল এই;-

গত শ্রাবণ পূর্ণিমার উৎসবে পণ্যবিথীর মেলায় গিয়েছিল চারুশীলা উপলাকে সঙ্গী করে, ফেরার পথে শকটের চাকা পথের পাশে পাঁকে আটকে যায়, চালক সাহায্যের আশায় নিকটস্থ পল্লীর দিকে যায় নারীদুজনকে যানমধ্যে বসিয়ে রেখে; এদিকে বলীবর্দ দুটি দুর্বার হয়ে ওঠে আচমকা, উপলা ভীত হয়ে চিৎকার শুরু করে, চারুশীলার অবস্থাও অজ্ঞানবৎ। সেসময় পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন পিনাকপাণি, তিনি সক্রিয় হয়ে বলীবর্দ দুটিকে শান্ত করেন, জল ছিটিয়ে চারুশীলার জ্ঞান ফেরান; ইতিমধ্যে শকট চালক ফিরে আসায় তিরস্কার করেন তাকে নারীদের একেলা ফেলে যাবার কারণে। কৃতজ্ঞ চারুশীলা শ্রেষ্ঠীকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করে, শ্রেষ্ঠী সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন সে প্রস্তাব। এরপরে, বিপণিতে বারম্বার অনুচর পাঠিয়ে চারুশীলা আকর্ষণ করে শ্রেষ্ঠীকে এবং কালক্রমে তিনি যাতায়াত শুরু করেন তার ভবনে।

'এ তো রীতিমত কাব্যকাহিনী হে, শ্রেষ্ঠীর ভাগ্যকে ঈর্ষা হয়', উল্মুক জনান্তিকে মন্তব্য করেন।

'শ্রেষ্ঠীর পরিণতিকেও ঈর্ষা কর কি?' পুষ্পকেতুর উত্তরে উল্মুক নিশ্চুপ।

'যে রাত্রে শ্রেষ্ঠী নিরুদ্দিষ্ট হন, এসেছিলেন কি তোমার ভর্তিনির কাছে?'

'এসেছিলেন প্রভু, স্বায়ংকালে এসেছিলেন, যেমন প্রায়ই আসতেন।'

'কখন ফিরে যান মনে আছে?'

'কি জানি,বলতে পারিনা; ভর্তিনি জানেন।'

'ভর্তিনিকে ভয় পেয়োনা, তোমার কোনও কথাই তিনি জানবেন না। বরং রাজকর্মচারীর কাছে সত্য গোপনে দুর্ভোগ, ভেবে বল।'উপলা সময় নেয় কিছু, তার চোখে মুখে দ্বিধা স্পষ্ট।

'শ্রেষ্ঠী আসায় আমি তাম্বুল করঙ্ক নিয়ে উপস্থিত হই ভর্তিনির শয়নকক্ষে, কিছু বিষয়ে কলহের উপক্রম হয়েছিল দুজনায়, আমাকে দেখে থেমে যায়; রাত্রে আমাকে প্রয়োজন নেই একথা জানান ভর্তিনি তখন,

আর সেইমত স্থান ত্যাগ করি আমি।'উপলাকে দেখে মনে হয় আরও কিছু বলতে চায় সে, সঙ্কোচ বশতঃ বলতে বাধছে।

'তোমার ধারণা সেইরাত্রে শ্রেষ্ঠী গণিকালয় ত্যাগ করেননি তাই তো?'

'না মানে, রাতের দৌবারিক পরাশর বড় ভালো বাঁশী বাজায়, আমি দীর্ঘক্ষণ প্রবেশ দ্বারের নিকটস্থ বিশ্রাম কুঠুরীতে বসে তাই শুনছিলাম, সেরাত্রে শ্রেষ্ঠীকে বিদায় নিতে দেখিনি।'

'তোমার অকপট ভাষণে আমরা প্রীত হয়েছি, এখন তোমার ভর্তিনির সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই, তাঁকে গিয়ে জানাও', পুষ্পকেতুর প্রশংসাবাক্যে উচ্ছ্বসিত উপলা ছুটে যায় চারুশীলাকে সংবাদ দিতে।

চারুশীলার ভবনের বহির্কুঠুরিটি অতিথি সম্ভাষণের স্থান, কক্ষের রুচিশীল সাজসজ্জা দেখে বোধ হয় অনেক মানী ব্যাক্তির আগমন হয় সেখানে; চারুশীলা অবস্থাপন্যা বলাই বাহুল্য।

'শ্রেষ্ঠী কি পূর্বাহ্নে জানিয়েছিলেন আসবেন সেদিন?'

'আপনি কোনদিনের কথা বলছেন?' চারুশীলা অকপট ভাষণে আগ্রহী নয় বুঝে নেন পুষ্পকেতু।

'যেদিন শ্রেষ্ঠী নিরুদ্দিষ্ট হন সেই রাত্রির কথা।'

'সেদিন শ্রেষ্ঠী আসেননি এখানে, প্রতিদিন আসতেন না তিনি।'

'অযথা মিথ্যালাপে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী, সত্য ভাষণ কর চারুশীলা' কঠিন শোনায় পুষ্পকেতুর কণ্ঠস্বর; 'কলহের কারণই বা কি ছিল সেই সন্ধ্যায়?' স্তব্ধ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ গণিকা, তারপর ধীরে ধীরে উত্তর দেয়।

'আচমকাই এসেছিলেন সেদিন শ্রেষ্ঠী, এদিকে প্রখ্যাত জহুরী গোকুলস্বামী আসবেন সংবাদ পাঠিয়েছিলেন অপরাহ্নেই। সেকথা জানাতে ক্ষুব্ধ হন পিনাকপাণি, গোকুলস্বামী আমার দীর্ঘদিনের পৃষ্ঠপোষক, তাঁকে অগ্রাহ্য করি কীরূপে।'

'পিনাকপাণি রাত্রিযাপন করেননি এখানে?'

'বিশ্বাস রাখুন দেব, শ্রেষ্ঠীকে কিছুপরে শান্ত করে ফেরত পাঠাই আমি; শুধু সেদিন কেন, এখানে কোনওদিন রাত্রিযাপন করেননি তিনি।'

'প্রবেশপথের প্রহরায় ছিল যে দ্বারী সে তো দেখেনি, শ্রেষ্ঠী কি আকাশপথে গমন করেছিলেন?'

'গোকুলস্বামীর সাথে সাক্ষাৎ এড়াতে তিনি খিড়কির দ্বার দিয়ে উদ্যান হয়ে বেরিয়ে যান। দ্বারী কেমন করে জানবে সেকথা।'

'আমি যদি বলি, রাত্রিভর তোমার কলহগঞ্জনায় উত্যক্ত হয়ে তিনি ভোররাত্রে নদীতে আত্মাহূতি দিয়েছেন?'

'না না এ মিথ্যা, গঞ্জনা কেন দেব,আমার সর্বস্ব দিয়েছিলাম তাঁর হাতে, সারাজীবনের সঞ্চয় গহনা, জহরাত।'

'সেও তো তোমার মুখের কথা।'

'একথা বলবেন না দেব', ডুকরে ওঠে চারুশীলা।

'আমি কিছুই বলতে চাই না, তবে আপাততঃ গহনার বিবরণ সহ একটি তালিকা রচে পাঠিয়ে দিও আমাদের কার্যালয়ে।'এরপর বিদায় নেন দুই বন্ধু, স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে চারুশীলা বহুক্ষণ।

ইতিমধ্যে কর্মচারী পাঠিয়ে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করা হয় পিনাকপাণির গৃহ; উদ্যানের মৃত্তিকা, শয়নকক্ষের ভূমিতল কিছুই বাদ থাকে না; শ্রেষ্ঠানী সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেন, 'খুঁজে দেখুন ভালো করে, চারুশীলার গহনা চুরির অপবাদের থেকে মৃত্যুও ভাল' এই ছিল তার বক্তব্য। আড়ঙ্গে শ্রেষ্ঠীর কর্মচারীকে প্রশ্ন করে জানা যায় তিনি এযাবৎ পণ্যসংগ্রহে আগ্রহী ছিলেননা তেমন, ভাণ্ডারে পণ্য অতি অল্পই রয়ে গিয়েছিল। নদীবন্দরে আগত আকর্ষনীয় মূল্যের উত্তম মসলিন উপেক্ষা করেছিলেন মাত্র কয়েকদিন পূর্বে।

'সংসার থেকে মন উঠেছিল প্রভুর, হয়তো অর্থাভাবও ঘটেছিল', চোখ মোছে পুরোনো কর্মচারী।

নগরীর পণ্যবীথিতে শ্রেষ্ঠীর বিপণীটি জনপ্রিয়, সেখানের তিনটি কর্মচারী, সর্বকনিষ্ঠটি বয়সে তরুণ। জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে চারুশীলার অনুচর প্রায়ই আসত বিপণিতে। শ্রেষ্ঠীর উপরোধে সে নিজেও গিয়েছে কয়েকবার গণিকালয়ে তাঁর বার্তা নিয়ে।

পিণাকপাণির মিত্র সম্পাতি নিজেও বস্ত্র ব্যবসায়ী, নগরীমধ্যে দুখানি কর্মব্যাস্ত বিপণী তাঁর, বন্দর সংলগ্ন আড়ঙ্গে সুবিশাল ভাণ্ডারগৃহ।

'পিনাকপাণি চৈনিক বস্ত্র সংগ্রহে আগ্রহী ছিল শুনিনি তো? হ্যাঁ কিছুকাল পূর্বে দুটি বাণিজ্যতরী এসেছিল বটে অঙ্গ থেকে উৎকৃষ্ট রেশমপণ্য নিয়ে', জানান তিনি।

'তবে মনকষ্টে ছিল মিত্র আমার, দুই রমণীর প্রেমসঙ্ঘাতে জীবন বিষময় ছিল তার; সবই কর্মফল' দীর্ঘশ্বাস ফেলেন সম্পাতি। নগরীর স্বর্ণকার সমিতির মাধ্যমে অনুসন্ধান করে জানা যায় শ্রেষ্ঠী কোনও গহনা বন্ধক রাখেননি কোনও স্বর্ণব্যবসায়ী বা মণিকারের কাছে।

'তোমার কি মনে হয় চারুশীলা মিথ্যাচার করছে?' অপরাহ্নে গৃহের একান্তে প্রশ্ন করেন বন্ধুকে উল্মুক।

'সে সম্ভবনাই তো প্রবল, নয় কি?'

'আচ্ছা, বল্লরিকা গহনা সরিয়ে ফেলেনি তো কোথাও? মানে ধর শ্রেষ্ঠী গহনা গৃহে আনলেন বন্ধক দেবার উদ্দেশ্যে, জানতে পেরে ঈর্ষাকাতর পত্নী সরিয়ে দিল গহনা। ক্ষোভে, লজ্জায় আত্মাহুতি দিলেন পিনাকপাণি।'

'শ্রেষ্ঠীপত্নীকে বড়ই বিষচক্ষে দেখেছ হে তুমি' হেসে বলেন পুষ্পকেতু।

'কেন এ যুক্তি কি এতই অসম্ভব?'

'অসম্ভব কি না জানি না তবে দুঃসাধ্য তো বটেই। বল্লরিকার পরিজন কেউ নেই এ নগরে, গহনা সরিয়ে রাখবে কোথায়?'

'ধর যদি নদীতে বিসর্জন দিয়ে থাকে?'

'বিবাহ করতে চলেছ, নারী চরিত্র এখনও বুঝলে না। ঈর্ষা যতই প্রবল হোক, ওই মূল্যবান রত্ন আভুষন নদীবক্ষে নিক্ষেপ করবে না বল্লরিকা। গহনা নিজেরই হোক বা অপরের, তা জলে ভাসিয়ে দেওয়া যে কোনও রমণীর কল্পনার অতীত।'

'তবে তোমার কি মত?'

'মত প্রকাশের সময় এখনও আসেনি হে, তবে একটি বিষয়ে সংশয় রয়েছে, শ্রেষ্ঠী পাদুকা জোড়া খুলে রেখে কেন লাফ দিলেন জলে?'

'মানে?'

'না, উষ্ণীষ ও উত্তরীয় লাফানোর সময় খুলে গিয়ে থাকবে, কিন্তু পাদুকাজোড়া সযত্নে ছেড়ে যাবেন কেন?'

'কেতু তোমার মস্তিষ্ক গরম হয়েছে; লাফানোর সময় পাদুকাও খুলে যেতে পারে।'

'না লাফানোর সময় খুলে গেলে, চর্মপাদুকা নদীজলে পড়ত, নদীতটে নয়।'

'কি জানি হে, হয়তো বৈতরণী সাঁতারে বাধা হত তাই পদুকা ত্যাগ করেছিলেন শ্রেষ্ঠী।'

'পুস্তপালের দপ্তরই তোমার উপযুক্ত স্থান' হেসে ওঠেন দুই তরুণ।

'ভদ্রা বল্লরিকা বাসস্থান ও বিপনী বিক্রয় করেছেন শ্রেষ্ঠী সম্পাতির কাছে, স্বজনহীন পাটলীপুত্রে থাকতে চাননা আর। সংবাদ পাঠিয়েছিলেন পিতৃগৃহে, কনিষ্ঠভ্রাতা এসে পরবেন দুএক দিবসে, তার সাথেই উজ্জয়িনী পাড়ি দেবেন তিনি', রাজকর্মচারী এসে সংবাদ দেয়। এরমধ্যে কেটে গেছে মাসাধিককাল, সমাধান মেলেনি গহনা রহস্যের।

'এ অবস্থায় শ্রেষ্ঠী পত্নীকে আটকানো আইনসম্মত তো নয়ই, মানবিকও নয়' মহাদণ্ডনায়ক মতামত দেন আলোচনা সভায়।

'তাছাড়া কুমার জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে চারুশীলাও গহনা বিষয়ে কিছু গোল করেনি; মিথ্যাচার ধরা পড়েছে বুঝেছে সে বিলক্ষণ', মন্তব্য করেন আর এক সভা সদস্য।

'রাজকার্যে শ্রেষ্ঠী পত্নীর পীড়ন হয়েছে যথেষ্ট, বিদায়কালে একবার সাক্ষাৎ করা উচিত', পুষ্পকেতু বলে ওঠেন। বিশাখগুপ্তের দৃষ্টিতে নীরব প্রশংসা ফুটে ওঠে মানবদরদী পুত্রের প্রতি।

'চলে যাওয়াই মনস্থ করলেন শেষ পর্যন্ত?' বল্লরিকার গৃহঅলিন্দে বসে কথপোকথন চলছে।

'কিসের আশে পড়ে থাকি বলুন? তাছাড়া ব্যবসায় চালানো রমণীর কর্ম নয়, কর্জও ছিল কিছু শ্রেষ্ঠীর। তাই সম্পত্তি বিক্রয় করে কর্জমুক্ত হয়ে এবার চলে যাব স্থির করেছি।'

'আপাততঃ সম্পত্তি গচ্ছিত রেখে যাওয়া চলত না কি? আপনার পিতা বিচক্ষণ ব্যাক্তি, পরে তাঁর পরামর্শ নিয়ে বিক্রয় করতেন।'

'পিতা গত হয়েছেন দুইবৎসর হল, ভ্রাতাদের অত সময় কোথা?' দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বল্লরিকা।

'বেশ, আসি তবে, উপদ্রব যা করেছি সে কর্তব্যের তাগিদে, মার্জনা করবেন ভদ্রে।'এরপর বিদায় নেন পুষ্পকেতু।

***

'চম্পাবতীর বিরহে অনিদ্রা হয়ে থাকে যদি, রাত্রিযাপনের নিমন্ত্রণ রইল আজ', লিপিখানি পেয়ে হাসির ঝিলিক জাগে উল্মুকের চোখে।

রাত্রি তৃতীয়প্রহর, শুক্লপক্ষের নাতি উজ্জ্বল চন্দ্রমায় আবছায়া চারিদিক। ভৃত্য এসে পুষ্পকেতুর শয়নগৃহের কপাটে আঘাত করে, 'ভদ্র ধর্মদাস দর্শনপ্রার্থী প্রভু।'

'আসুন ভদ্র, সংবাদ শুভ তো?' পুষ্পকেতু শয্যা ত্যাগ করেন নিমেষে, সেইসাথে জাগিয়ে দেন উল্মুককেও।

'সংবাদ আশাপ্রদ, কুমার সঙ্গী হবেন কি?'

'অবশ্য।'এরপর, দ্রুতগামী অশ্বে ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হন তিন রাজপুরুষ আধো অন্ধকারে।

প্রাক-ঊষার ব্রহ্মমুহূর্ত্তে ঘুমন্ত পল্লী, অশ্বগুলিকে কিছুটা দূরত্বে বেঁধে রেখে সাবধানে এগিয়ে চলেন তিনজন। অন্ধকার গৃহ সাড়াশব্দহীন। শুধু অতিমৃদু পায়ের শব্দ ধ্বনিত হয় অঙ্গনে ঝরে থাকা শুষ্ক পত্রে; একটি মাত্র দীপের আলোয় এক ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসে বহির্দ্বারের দিকে। দ্বারের সামনে অপেক্ষমান একটি গোশকট, তাতে কয়েকটি পেটিকা।

'এতরাত্রে বহির্প্রকৃতি নিরাপদ নয় ভদ্রে' নিস্তব্ধ রাত্রিতে পুষ্পকেতুর কণ্ঠস্বর বজ্রসম ধ্বনিত হয়। চমকে ওঠে ছায়াখানি, দীপের আলোয় প্রতিভাত হয় বল্লরিকার রক্তশূন্য মুখচ্ছবি।

'আপনি এখানে কেন দেব?' মৃদু স্বরে বলে ওঠে সে।

'বিদায় জানাতে এসেছি মনে করুন', মৃদু হেসে বলেন পুষ্পকেতু।

'একাই চলেছেন না ভ্রাতা সঙ্গে আছেন?' বল্লরিকা দৃষ্টিপাত করে শকটের পানে। চালকের স্থানে বসে এক বলিষ্ঠ পুরুষ, উষ্ণীষের কাপড়ে ঢাকা মুখ, একটি কালো কম্বলে সর্বাঙ্গ আবৃত। পুষ্পকেতুর নির্দেশে অপসারিত হয় পুরুষের উষ্ণীষ, মশালের আলোয় জিঘাংসাময় দেখায় তার আপাত সুশ্রী মুখমণ্ডল।

পুষ্পকেতু চালকের পাশে রাখা একটি কাপড়ে ঢাকা পেটিকা তুলে নিয়ে এগিয়ে দেন ধর্মদাসের দিকে, 'ভদ্র, চারুশীলার তালিকা অনুযায়ী মিলিয়ে নেবেন গহনা গুলি। বোধ হয় সবকটিই আছে।'

'স্বামী!' ডুকরে কেঁদে উঠে ভুমিতে লুটিয়ে পরে বল্লরিকা অসহায় ক্ষোভে।

***

মহাদণ্ডনায়কের কার্যালয়, সভামণ্ডলীর সকলেই উপস্থিত, উল্মুকও যোগ দিয়েছেন আজকের আলোচনায়।

'পিনাকপাণি জীবিত আছেন একথা মনে এলো কিভাবে কেতু?' সভার মধ্যমনি বিশাখগুপ্তের মুখ পুত্রগর্বে উজ্জ্বল।

'এক জোড়া পাদুকা, মানে নদীতটে সযত্নে ফেলে যাওয়া পাদুকাদুটি কেমন সন্দেহ জাগায়। এ যেন প্রমাণ সৃষ্টি করার চেষ্টায় রাখা হয়েছিল সেখানে।'

'কিন্তু মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, এরপরে তো সন্দেহ থাকার কথা নয়।'

'শ্রেষ্ঠীর মৃতদেহ হিসাবে সনাক্ত হয়নি সে শব। আভুষণ সনাক্ত করেছিল বল্লরিকা, সেও তো ষড়যন্ত্রের অংশীদার।'

'ঘটনাটি একটু বিষদে ব্যখ্যা করলে আমাদের কৌতুহল নিবৃত্ত হয়' অনুরোধ করেন কয়েকজন।

'শ্রেষ্ঠী উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বহুদিন ধরেই বাসনা চম্পা থেকে বাণিজ্য তরী ভাসাবেন কম্বোজ, সুবর্ণভূমি, সুমাত্রায়; আশা আছে, সাধ্য নেই। বিত্তবান শশ্রুদেবও গত হয়েছেন বেশ কিছুকাল হল। হয়তো এ আশা স্বপ্নই রয়ে যেত যদি না ভাগ্যবলে চারুশীলা তাঁকে হৃদয় দিত। প্রথম দিকে বোধকরি, শ্রেষ্ঠী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন গণিকাকে; পরবর্তীকালে লোভ মাথা চাড়া দেয়। তবে শ্রেষ্ঠীপত্নীও সামান্যা নয়, যেভাবে এতদিন শোকার্তা বিধবার অভিনয় করে ধুলি দিয়েছে আমাদের চক্ষে সে বড় বিস্ময়।'

'নদীবক্ষে প্রাপ্ত শবটি তবে কার?' প্রশ্ন করেন বিশাখগুপ্ত।

'গঙ্গাবক্ষে ভাসমান শব সাধারণ ঘটনা, এক্ষেত্রে সেটি সম্পূর্ন কাকতালীয়। মৃতব্যক্তির আভুষণ দেখানো হলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বল্লরিকা, তবে শব না পাওয়া গেলেও সকলে শ্রেষ্ঠীকে মৃত বলেই ধরে নিত। মাসাধিক কাল পিনাকপাণি বন্দর সংলগ্ন একটি নিকৃষ্ট শুণ্ডীগৃহে আশ্রয় নেন, বিদেশী নাবিকদের যাতায়াত সেখানে, পরিচয় গোপন করা সহজ। সন্দেহ ছিল তাই বন্দরের সকল শুণ্ডীগৃহ ও আবাসিকায় গুপ্তচর পাঠাই, সেখানেই একজন সনাক্ত করে শ্রেষ্ঠীকে। ততদিনে খবর আসে বল্লরিকা নগর ত্যাগে উদ্যোগী, আমি সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানাই; নিশ্চিন্ত হয় তারা। এরপর রাত্রিদিন নজর রাখা হয় শ্রেষ্ঠী গৃহে, পরের ঘটনা সকলেই জানেন। একবার বন্দরে পৌছলে নৌপথে পাড়ি দিত তারা কলিঙ্গে, নব পরিচয়ে শুরু হোত নতুন জীবন।'

'চারুশীলা মিথ্যাচার করেনি বুঝলেন কিভাবে? শত হলেও সে গণিকা' প্রশ্ন করেন কেউ।

'পিনাকপাণির প্রতি তার প্রেম ছিল অকপট, প্রেমাস্পদের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে মিথ্যাচার গণিকাও করেনা।'

বসন্ত সন্ধ্যার মনোরম বাতাস বয়ে এনেছে যুথীপুষ্পের গন্ধ, দেওয়ালের কুরঙ্গীতে জ্বলে অগরু চন্দন, নিভৃত কক্ষের একান্তে বসে বীণাবাদনে মগ্ন পুষ্পকেতু; সুমধুর সুরঝঙ্কারে স্বর্গীয় পরিবেশ। অতিচুপে প্রবেশ করেন উল্মুক, মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনতে থাকেন বহুক্ষণ। অবশেষে মিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করে বিরতি নেন কুমার।

'তোমার জীবনে জ্যামিতি সত্য না এই সঙ্গীত?'

'উভয়েই', মৃদু হেসে পুষ্পকেতু আবার শুরু করেন নতুন সুর লহরী।

*** ***

দুরূহ শব্দের অর্থ:

লেখপট – স্লেট, পুস্তপাল – হিসাববিদ, দ্রাড়িম্ব – বেদানা, অলিন্দ – বারান্দা, আড়ঙ্গ – আড়ত ও পাইকারী বাজার, সম্মার্জনী – ঝ্যাঁটা, দৌবারিক – দ্বারবান, পনস – কাঁঠাল, বলীবর্দ – বলদ, ভর্তিনি -

মালকিন

গহীন গরল

পাটলীপুত্র নগরীর রাজপুরী সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মন্ত্রীমণ্ডলী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বসতি, সেখানকার মনোরম উদ্যান ঘেরা প্রতিটি অট্টালিকা যেন একেকটি সুরম্য পটচিত্র; তার মাঝেও মহামন্ত্রী হরিষেণের প্রাসাদ পদ্মবনে রাজহংসীসম স্বমহিমায় স্বতন্ত্র, এমনই তার শোভা। উদ্যান মাঝে পাথরে বাঁধানো সুদৃশ্য পুষ্করিণী, শ্বেত কুমুদ ফুটে আছে তার কাকচক্ষু জলে। একপাশে পনস বৃক্ষের ছায়াঘেরা প্রস্তর বেদিকা, সেখানে মুখোমুখি বসে হরিষেণ ও পুষ্পকেতু। আশু গ্রীষ্মের মায়াবী অপরাহ্নে হরিষেণের বাঁশীর লহরী আর পুষ্পকেতুর বীণার ঝঙ্কারে বসন্ত ভৈরবীর অপূর্ব যুগলবন্দী; সুরের মায়ায় উদ্যানবিথী যেন গন্ধর্বলোক। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের মন্ত্রীসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠরত্ন হরিষেণ বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও জনপ্রিয়; মগধ সাম্রাজ্যের যে কোনও বিশেষ প্রশাসনিক বা কূটনৈতিক সিদ্ধান্তে তাঁর মতামত অপরিহার্য। কিন্তু এই মেষ সংক্রান্তির শুভদিনে, কর্মব্যস্ত জীবন থেকে ছুটি নিয়ে কয়েক দণ্ডের জন্যে তিনি শুধুই এক সঙ্গীত সাধক, আর সেই সঙ্গীত সাধনার প্রিয়সঙ্গী পুত্রসম পুষ্পকেতু। বেশ কিছু সময় পরে, মৃদু নূপুর নিক্বণ আর জাতিপুষ্পের সুগন্ধে আত্মস্থ হন হরিষেণ, এক হাস্যময়ী বালিকাকে দেখে বাঁশী থামান তিনি। বালিকা তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা হৈমন্তী, যার সারল্যমাখা মুখ, দুটি কৌতূহলী হরিণচোখ আর অধরের মিষ্টি হাসিতে চারপাশের সকলেই বশীভূত, হরিষেণও তার ব্যতিক্রম নন। হৈমন্তী ও তার সঙ্গিনী দাসী বেদিকার ওপর নামিয়ে রাখে রূপোর থালিতে সাজানো যব, গোধুমচূর্ণ, গুড়, ঘনদুগ্ধ আদি সহযোগে প্রস্তুত বিভিন্ন মিষ্টান্ন ও সাথে পানপাত্রে কর্পুর মিশ্রিত সুগন্ধি তক্র।

'তুমি নিজে নিয়ে এলে পুত্রী?'

'বা রে, আজ মেষ সংক্রান্তির বিশেষ মিষ্টান্ন যে, ধাই মা বলেছেন, মিষ্টান্ন সেবনেই নতুন বছরের শুভারম্ভ।'

'মিষ্টান্ন কি তুমি নিজেই প্রস্তুত করেছ হৈম?' পুষ্পকেতুর প্রশ্নে যে সুক্ষ পরিহাস রয়েছে বালিকা তা বোঝেনা।

'না, আমাকে পাক শালে যেতে দিলেনা তো ধাই মা; তবে তক্র আমি নিজে বানিয়েছি, তাই না চপলা?' সঙ্গিনী দাসীটিকে সাক্ষী মানে সে।

'সেক্ষেত্রে তক্র পান করা উচিৎ হবে কি? মানে আমাদের দুর্বল পাকস্থলী এই স্বর্গীয় সুধা সইতে পারলে হয়।'কেতুর কথায় হেসে ওঠেন হরিষেণ, হৈম রাগ করে চলে যেতে চায়, কেতু প্রবোধ বাক্যে শান্ত করেন তাকে। পানাহার চলছে, এসময়ে ভৃত্যের সাথে রাজপুরী থেকে আগত এক দূত এসে হাজির হয়।

'কি হয়েছে জয়ন্ত, এই অসময়ে হঠাৎ?' হরিষেণ বিস্মিত হন।

'ঘটনা কিছ গুরুতর প্রভু, অতিথি শালায় বিরিঞ্চিদেবের ভেদ বমি শুরু হয়েছে, মানী ব্যক্তি, রাজকার্যে এসে এই বিপত্তি; মহাপ্রতিহারি আপনাকে সংবাদ দিতে বললেন।'

'রাজবৈদ্য বামদেবের কাছে সংবাদ গেছে কি?'

'তাঁকে আনতে লোক পাঠানো হয়েছে আমি এখানে আসার পূর্বেই।'

'তাই তো হে, চিন্তার কথা; তুমি এগোও আমি আসছি।' কিছু পরে, চিন্তিত মুখে মহামন্ত্রী রওয়ানা দেন রাজ অতিথিশালার দিকে।

বৈশালীর উপারিক বিরাটসিংহ অতি ক্ষমতাবান পুরুষ, সম্রাটের প্রিয়পাত্র; সম্প্রতি রাজপরিবারের কুমার ময়ূখের সাথে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যাটির বিবাহ প্রস্তাব করে রাজসভায় পাঠিয়েছেন কুলগুরু বিরিঞ্চিদেবকে।

বিরিঞ্চি, নিজেও বিশিষ্ট ব্যক্তি,শাস্ত্র ও কূটনীতিতে পণ্ডিত; শোনা যায়, তাঁর পরিচালনায় একটি সুদৃঢ় গুপ্তচরবাহিনী অহোরাত্রো নজর রাখে প্রতিবেশী হিমালয় রাজ্যগুলিতে; অতএব রাজআতিথ্যে তাঁর এ হেন অসুস্থতা সম্রাটের পক্ষে বিব্রতকর।

হরিষেণ অতিথিশালায় পৌঁছে দেখেন বামদেবের পরিচালনায় তাঁর দুই সহচর রোগীর সেবায় ব্যস্ত। বিরিঞ্চিদেবের অচৈতন্য দেহ থেকে থেকেই ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে, মুখখানি যন্ত্রণায় নীলবর্ণ।

‘কিরকম বুঝছেন দেব?’ হরিষেণের প্রশ্নের উত্তরে একটি হতাশাব্যঞ্জক দীর্ঘশ্বাস ফেলেন রাজবৈদ্য।

‘আশা একরকম নেই বললেই চলে, ফুস্‌ফুস রসস্থ হয়েছে, হৃদযন্ত্রের অবস্থাও ভালো নয়।’

‘ভেদবমির কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?’

‘পানাহারের অসাবধানতাতেই হয়ে থাকা সম্ভব, বৈশালী থেকে পাটলীপুত্র যাত্রাপথে যদি কলুষিত জল পান করে থাকেন কোনও পুষ্করিণী থেকে, সেক্ষেত্রে ভেদবমি অসম্ভব নয়।’

‘বিরিঞ্চিদেব আমাদের আতিথ্যে রয়েছেন গত পাঁচদিন যাবৎ, তাহলে এই অসুস্থতার দায় আমাদের উপর বর্তায় না তো?’

‘পাঁচদিন? না ভেদবমি তারও পূর্বে সেবিত পানীয় থেকে হওয়া সম্ভব নয়; অসাবধানতা ঘটেছে কিছু অতিথিশালাতেই।’

‘বটে! তাও তাঁর অনুচরের কাছে অনুসন্ধান করে দেখছি, যাত্রাপথে তিনি কি পানাহার করেছিলেন; এ বড়ো লজ্জার বিষয় হল আচার্য; আপনি যেভাবে হোক অতিথির প্রাণরক্ষা করুন।’ হরিষেণ আবেগে বামদেবের করস্পর্শ করেন।

বিরিঞ্চিদেবের অনুচর বটুক জানায়, পথিমধ্যে জলসত্র অথবা পান্থশালা ভিন্ন কোথাও তার প্রভু পানাহার করেননি; ‘তিনি মানীব্যক্তি, আমাদিগের মত যত্রতত্র জলপান করবেন কেন?’

সমস্ত রাত্রি চলে যমে মানুষে টানাটানি, বামদেব নিজে উপস্থিত থাকেন রোগীর পাশে সর্বক্ষণ। অবশেষে পূর্বাকাশে সূর্যোদয়ের কিছুপরে, শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন বিরিঞ্চিদেব। সংবাদ পেয়ে দ্রুত উপস্থিত হন হরিষেণ অতিথিশালায়, রাত্রিজাগরণের চিহ্ন তাঁর চোখে মুখেও সুস্পষ্ট।

‘এখন বিরাটসিংহের কাছে সংবাদ পাঠানো প্রয়োজন; সম্রাটকেও অবগত করা দরকার’, হরিষেণ কতক স্বগোক্তি করেন বামদেবের সামনে।

‘বিরাটসিংহের কাছে কি সংবাদ পাঠাবেন তা একবার আলোচনা করে দেখবেন মহামন্ত্রী’ রাজবৈদ্য মন্তব্য করেন।

‘আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন আচার্য?’

‘মৃতদেহ সম্পূর্ণ নীলবর্ণ ধারণ করেছে, রোগীর বমনও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি আমি; সব লক্ষণ থেকে সন্দেহ হয় বিষক্রিয়ায় ঘটেছে এই মৃত্যু।’

‘কি বলছেন আপনি বামদেব? আপনার কথা যদি সত্য হয়, এই মৃত্যুকে ঘিরে রাজনৈতিক অসন্তোষ তৈরী হবে, ঘোর অমঙ্গল!’

মন্ত্রণাগৃহের রুদ্ধকক্ষে বিরিঞ্চিদেবের মৃত্যুকে ঘিরে আলোচনা বসেছে মহামন্ত্রী হরিষেণ ও দ্বৈমাতুরদেব, মহাপ্রতিহারি সোমদত্ত, মহাদণ্ডনায়ক বিশাখগুপ্তের মধ্যে, সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত সে আলোচনায়। মৃত্যু বিষয়ে ঠিক কি সংবাদ পাঠানো হবে বিরাটসিংহকে সে বিষয়ে চলছে মতান্তর।

‘হৃদরোগে প্রাণ হারিয়েছেন ব্রাহ্মণ, একথা জানালে তো সবদিক রক্ষা হয়’ দ্বৈমাতুরদেব মন্তব্য করেন।

‘না, আসল কথা বেরিয়ে পড়বে অচিরেই; বটুক প্রকাশ করবে সকল কথা বৈশালী ফিরে গিয়ে’, হরিষেণ বলেন।

‘তাছাড়া, সেবকদল, বামদেবের সহচর, যে কারও রসনা শিথিল হলেই কল্পকাহিনী ছড়াবে দাবানলের মত’, মহাপ্রতিহারি আশঙ্কার কথা জানান।

‘আমার মনে হয়, মৃত্যু রহস্যের সমাধান হওয়া প্রয়োজন; প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়লে বিরাটসিংহ জানবেন তাঁর কুলগুরুর মৃত্যুবিষয়ে সম্রাট কতটা আন্তরিক’, বিশাখগুপ্ত সুচিন্তিত মতামত জানান এতক্ষণে।

‘তবে আশু অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ হোক; অপরাধী কে, কি বা তার উদ্দেশ্য, আমিও জানতে আগ্রহী’ সম্রাট নির্দেশ দেন মন্দ্রগম্ভীর স্বরে।

‘অনুসন্ধান অতিগোপনে করা প্রয়োজন, একার্যের দায়িত্ব আমার পুত্র পুষ্পকেতুর উপর দিতে চাই রাজন’; বিশাখগুপ্ত অনুরোধ করেন।

‘কেতু বুদ্ধিমান,বিচক্ষণ; একার্যের জন্য আমিও তাকে উপযুক্ত মনে করি মহারাজ’ হরিষেণ সমর্থন করেন বিশাখগুপ্তকে।

‘আমি অনুমতি দিলাম’ সম্রাটের ঘোষনার সাথে আলোচনা শেষ হয়।

***

‘ভদ্র, অতিথিশালের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ তথ্য প্রয়োজন; সেবকেরা কে কি কাজের দায়িত্বে থাকে, সর্বোপরি পানাহারের বন্দোবস্ত কি এ সবকিছুই জানতে চাই অনুসন্ধান আরম্ভের আগে।’ কথা হচ্ছে সোমদত্তের কার্যালয়ে; তাঁর কার্যালয় রাজ-অতিথিশালার উত্তরপ্রান্তে।

‘অবশ্য; আপনার কাজে যাবতীয় রকম সহযোগিতা করা আমার কর্তব্য।’

এরপর সোমদত্ত যা বললেন তা এই প্রকার। অতিথিশালাটি তিনটি ভাগে বিভক্ত, এক অংশ, যেটি রাজপথ সংলগ্ন, সেখানে মধ্যপদস্থ রাজকর্মচারীরা রাজকার্যে এসে আশ্রয় নেয়, দ্বিতীয় অংশটি দক্ষিণপ্রান্তে আম্রকুঞ্জসংলগ্ন; এটি মূলতঃ সামন্তরাজ্যেগুলির দূত ও প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত; তৃতীয় অংশটিতে দুইখানি মহল রাজপুরী সংশ্লিষ্ট বনবীথির একপাশে। এগুলি বিশেষ রাজপুরুষদের জন্য সংরক্ষিত; বর্তমানে একটিতে ছিলেন বিরিঞ্চিদেব, অন্যটি আপাতত অনধিকৃত। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের অতিথিদের জন্য আহার প্রস্তুত হয় অতিথিশালার পাকশালে, কিন্তু তৃতীয় অংশের বিশেষ অতিথিদের পানাহার আসে রাজপুরীর পাকশাল থেকে। বিরিঞ্চিদেবের তিনবেলার খাদ্য বয়ে আনত রাজপুরীর দাসী সন্ধি, মাননীয় অতিথিকে সামনে বসে আহার করিয়ে শূণ্য বাসন নিয়ে ফিরে যেত সে প্রতিবার। এছাড়া শ্রীরূপ নামের অতিথিশালার এক সেবক নিযুক্ত ছিল বিরিঞ্চিদেবের সেবায়; অতিথিশালার যাবতীয় পানীয় জল আসে রাজপুরীর মিষ্টজলের কূপগুলি থেকে, মাননীয় অতিথির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। এরপর পুষ্পকেতু জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন সন্ধি ও শ্রীরূপকে।

‘বিগত পাঁচদিন তুমিই খাদ্যপানীয় এনেছ বিরিঞ্চিদেবের জন্য?’

‘হ্যাঁ দেব, পাকশাল থেকে যেরূপ গুছিয়ে দেওয়া হোত সেভাবেই নিয়ে আসতাম প্রতিদিন।’

‘পানীয় জল কোথা থেকে এনেছিলে এই কদিন?’

‘পানীয় জল শ্রীরূপ ভরে দিত কলসে আমি খাদ্যের সাথে তক্র অথবা কালিঙ্গের রস নিয়ে আসতাম পাকশাল থেকে, আচার্য মিষ্ট কালিঙ্গ বড় পছন্দ করতেন’, একথা বলে চোখ মোছে সন্ধি।

‘মেষ সংক্রান্তির দিন দিবাকালে কি খাদ্য এনেছিলে?’

‘রোজকার মতই খাদ্য এনেছিলাম, কিন্তু প্রভু ফিরিয়ে দেন আহার্য্য, বলেন ক্ষুধা নেই, বমনেচ্ছা জাগছে; বয়স হয়েছে, হয়তো পূর্বরাত্রের আহার গুরুপাক হয়ে থাকবে।’

‘তুমি কতদিন হল রাজপুরীতে নিযুক্ত হয়েছ?’

‘বাল্যকাল থেকেই এই কার্যে আছি, আমার বড় ভগিনীও বিবাহের পূর্বে রাজপুরীতে দাসীকর্ম করত, এখন সে সভানায়কের অধীন দ্বাররক্ষীর গৃহিণী।’ কথাকটি বলে চকিতে হাসে সন্ধি। রাজপুরীর পরিচারিকারা

সাধারণত সকলেই সুদর্শনা হয়ে থাকে, সন্ধিও ব্যতিক্রম নয়, উপরন্তু সদ্য যৌবনা; তবে তার চেহারা ও আচরণে একপ্রকার চপলতা আছে, যেন নিজসম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন।

'বেশ, তুমি এখন আসতে পারো', প্রয়োজনে ডেকে পাঠাবো আবার।'

'অতিথিশালায় কতদিন হল নিযুক্ত হয়েছ?'

'পাঁচবৎসর যাবৎ এখানকার অতিথিদের সেবায় আছি দেব, মহাপ্রতিহারি আমার নিষ্ঠায় খুশী হয়ে বিশেষ অতিথিশালার কার্যে নিযুক্ত করেছেন বিগত একবৎসর।' মধ্যবয়স্ক শ্রীরূপের চেহারা বলিষ্ঠ, আচরণে বিনয়ের সাথে আত্মপ্রত্যয়ের মিশ্রণ, বোঝা যায় সে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, যে কোনও গুরুদায়িত্ব পালনের উপযোগী।

'এর আগে কি কর্ম করতে?'

'আমি কুম্ভকার, কর্মশালা ছিল একটি নিকটবর্তী গ্রামে। গৃহিণী কঠিন রোগে পড়ল মৃত সন্তান প্রসব করে, শেষে সেও চলে গেল। কর্জ হয়েছিল প্রচুর, শেষকালে সব ছেড়ে পাটলীপুত্রে আসি কর্মের আশায়। ক্রমে প্রভু সোমদত্তের নজরে পড়ি, তারপর থেকে এই অতিথিশালাতেই আছি।'

'পুনরায় বিবাহ করনি?'

'নাঃ, সংসারধর্মে রুচি নেই আর; এখানে বেশ আছি খাদ্য-বাসস্থানের চিন্তা নেই, বেতনও ভালো।'

'বিরিঞ্চিদেবের পানীয় জল তুমি এনে দিতে কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজপুরীর মিষ্টজলের কূপ থেকে প্রতিদিন মাটির কলসে জল ভরে এনে, সিক্তবস্ত্রে জড়িয়ে শীতল করে রাখতাম।'

'আচার্যের কক্ষে তুমি আর সন্ধি ভিন্ন কে কে আসত?'

'বটুক আসত, আর গত দুইদিবসে তাঁর সঙ্গের লোকজন এসেছিল, এছাড়া কক্ষ পরিষ্কার করতে আসত মঞ্জরী।'

'মঞ্জরী কে? সে কি অতিথিশালার পরিচারিকা?'

'ঠিক তা নয়, তার স্বামীর একটি মালঞ্চ আছে, মঞ্জরী বাহারে পুষ্পস্তবক তৈয়ার করে সরবরাহ করে এই অতিথিশালায়, পণ্যবিথীতে একটি বিপণিও আছে তার। অতিথিশালার অন্য অংশে সেবকেরাই কক্ষ পরিমার্জনা করে থাকে, তবে বিশেষ অতিথি বিরিঞ্চিদেব, মঞ্জরীর পুষ্পবিন্যাস দেখে তুষ্ট হয়ে তাকে কক্ষসজ্জার অনুরোধ করেন; প্রভু সোমদত্তও আপত্তি করেননি তাতে। সেই আসত কক্ষ পরিমার্জনা করতে, সেইসাথে পুষ্পস্তবক, ধূপ ও গন্ধচূর্ণে শোভিত করত পরিবেশ।'

'মঞ্জরীর সাথে একবার বার্তালাপ প্রয়োজন, ডেকে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর তাকে; আর বটুককে প্রেরণ কর এখন। আর একটি কথা, বিরিঞ্চিদেবের কক্ষের পানীয়জল কি ফেলে দেওয়া হয়েছে?'

'না দেব, ও কক্ষের কবাট বন্ধ রেখেছেন মহাপ্রতিহারি।'

'বেশ তোমার প্রভুকে বল পানীয় জলের কলসীটি আমি সাথে নিয়ে যাব।'শ্রীরূপ অবাক হলেও বিস্ময় প্রকাশ করে না, প্রশিক্ষিত সেবকের মতই আজ্ঞাপালনে তৎপর হয়।

বটুকের পক্ক চেহারা দেখে তার বয়স অনুমান করা শক্ত, তবে যৌবন বিগত নয় সেকথা বোঝা যায়; তার সাথে একটি পাঁশুটে রঙের কুক্কুর প্রভুভক্ত সেবকের মতই দুম্ব নাড়িয়ে হাজির হয় পুষ্পকেতুর সমুখে; পালক ও পালিত দুজনের সখ্যতায় সম্ভবত প্রভুভক্তি একটি বিশেষ অঙ্গ। বটুকের রক্তবর্ণ চক্ষু ও শুস্ক মুখ দেখে বোধহয় প্রভুর এই অকস্মাৎ মৃত্যুর শোক সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

'কতদিন হল কর্ম করছ বিরিঞ্চিদেবের সাথে?'

'আজন্মকাল; আমি প্রভুর প্রাসাদের দাসীপুত্র, জ্ঞান হতে পিতাকে চোখে দেখিনি, প্রভুপত্নীর দয়ায় মানুষ।'

'বটে, আচার্যের কক্ষে যেসকল পথসঙ্গীরা এসেছিল বিগত কয়েকদিনে তাদের নাম ও বিবরণ চাই।'

‘পথসঙ্গী নয়, তারা প্রভুর ভূসম্পত্তির সঞ্চালক ও গ্রামপ্রধান।’

‘তাঁর ভূসম্পত্তি কোথায়?’

‘অমরাপুরা আর সূর্যপুরায়, সূর্যপুরায় তাঁর বিশাল অট্টালিকা; দশ বৎসর পূর্বে বিরাটসিংহ বৈশালীর উপারিক পদ পেলে, তাঁর সঙ্গেই বৈশালী গমন করেন প্রভু। এদেশের ভূসম্পত্তি রক্ষার্থে আসেন সম্বৎসর; এক্ষণে পাটলীপুত্র এসেছেন জেনে, অনুচরেরা সংবাদ নিতে এসেছিল; রাজকার্য সেরে যাবেন নিজ আলয়ে এমনই কথা ছিল’; বলতে বলতে চোখ ভিজে আসে বটুকের।

শ্রীরূপ অল্পক্ষণের মধ্যে মঞ্জরীকে তার বাটী থেকে ডাকিয়ে আনায়; সে মধ্যযৌবনা ও সুশ্রী, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ভারি মধুর তার ব্যক্তিত্ব, এক নির্মল স্নিগ্ধতায় আকর্ষণীয় তার সুশ্রীতা। পরনে বাসন্তী অন্তরীয়, উত্তরীয়টি পলাশ রাঙা; গলায়, কানে গুঞ্জার গহনা, কবরীতে স্বর্ন চম্পক; সবমিলিয়ে সে যেন সত্যিই বসন্তকুঞ্জের মালিনী।

‘অতিথিশালায় তোমার নিত্য যাতায়াত ভদ্রে?’

‘হ্যাঁ দেব, পুষ্পরাজি নিয়ে আসি প্রাতে’; মঞ্জরীর গলার স্বরেও কোকিলার কুহুতান।

‘বিরিঞ্চিদেবের কক্ষে কখন আসতে?’

‘প্রাতে পুষ্পরাজি ভাণ্ডারিকের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে, আচার্যের কক্ষ পরিমার্জনা করতে আসতাম।’

‘বিরিঞ্চিদেব উপস্থিত থাকতেন কক্ষে?’

‘থাকতেন, তিনি জপ করতেন সেসময়ে।’

‘মেষ সংক্রান্তির দিন কি করছিলেন তিনি?’

‘সেদিন আমি আসিনি, গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিলাম।’

‘সেকি, উৎসবের দিন, পুষ্পের বিশেষ প্রয়োজন থাকে সেইদিবসে, তাও এলেনা?’

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে আবার বলে ওঠে মঞ্জরী,’ বললাম তো গৃহে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম।’

সোমদত্তের অনুমতি নিয়ে পুষ্পকেতু শ্রীরূপকে সঙ্গী করে বিরিঞ্চিদেবের কক্ষটি পরিদর্শনে যান; উন্মুক্ত অলিন্দ সংলগ্ন সুবিশাল কক্ষটির জানালা দিয়ে চোখে পড়ে শ্যামল বনবীথি; কক্ষের একপাশে মৃতের পালঙ্ক শয্যাহীন। অন্যপাশে লেখনপীঠিকার উপর সযত্নে গোছানো লেখার সামগ্রী আর একটি শুষ্ক জাতিপুষ্পহার; কুরঙ্গীতে শূন্য ধূপাধার, শুধু ছাই পড়ে আছে কিছু চারপাশে। পানীয় জলের মৃৎকলস রাখা একটি কাঠের পাটাতনে, পাশে রাখা সুদৃশ্য তাম্বুলকরঙ্ক।

‘তাম্বুলের অভ্যাস ছিল আচার্যের?’ প্রশ্ন করেন পুষ্পকেতু।

‘হ্যাঁ, বৈশালী থেকেই এনেছিলেন সব উপাচার, নিজহাতে রচনা করতেন সুগন্ধি তাম্বুল, কি তার গন্ধ! সংক্রান্তির দিন খাদ্য ফিরিয়ে দিলেন, তবু তাম্বুল খাওয়ায় ক্লান্তি ছিলোনা’, অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রীরূপ।

‘জলাধারটি পাল্কীতে উঠিয়ে দাও হে, গৃহে নিয়ে যাব’, ব্যবস্থা সম্পন্ন করে গৃহে ফেরেন পুষ্পকেতু; মধ্যাহ্ন পার হয়েছে ততক্ষণে।

স্নানাহার সেরে কক্ষে ফিরে পুষ্পকেতু দেখেন প্রিয়মিত্র উল্মুক বসে আছেন তাঁর অপেক্ষায়।

‘শুনলাম বিশেষ রাজকার্যে ব্যস্ত আছো, নাওয়া খাওয়ারও সময় নেই, ব্যপার কি হে?’ ঘটনা জানতে ব্যগ্র হন উল্মুক।

‘কি করি বল, মিত্র যখন বিবাহের পাত্র, রাজকার্যে নিজেকে ব্যস্ত না রেখে উপায় কি!’ আগামী পূর্ণিমা তিথিতে বন্ধুর বিবাহকে ঘিরে রসিকতা করেন পুষ্পকেতু।

‘একথায় ভুলছিনা, আসল ঘটনা বিস্তারে বল’, উল্মুক ছাড়ার পাত্র নন; অতএব জানাতে হয় সকল কথা।

‘কাউকে সন্দেহ হয় তোমার?’

‘সন্দেহ সকলকেই হয়, প্রশ্ন হচ্ছে বিষক্রিয়া হল কি রূপে?’

‘পানীয় জলে মেশানো হয়েছে বিষ এই তো সন্দেহ তোমার?’

‘ভেবেছিলাম তাই, কিন্তু, দুটি পুঁটি মৎস্য ছাড়া হয়েছিল কলসের জলে, তারা দিব্য সন্তরণে ব্যস্ত।’

‘বিষ তো আহার্যেও মেশানো হতে পারে, আহার্যের পরীক্ষা তো হয়নি।’

‘হ্যাঁ পানীয়ে না মেশালে আহার্য থেকেই হতে হবে বিষক্রিয়া। সন্ধি চপলা নারী, তার কোনও গুপ্তপ্রেমী থাকা অসম্ভব নয়; হয়তো এ তাদেরই কাজ।’

‘পাকশালে সম্ভাবনা নেই বলছ?’

‘সেখানে সন্ধির চোখ এড়িয়ে বিরিঞ্চিদেবের আহার্যে বিষ কে মেশাবে? না হে কোনও কিছু স্পষ্ট নয়, উপরন্তু আচার্যকে হত্যা করে কিসের লাভ?’

‘আরে এ এক চক্রান্ত আমার বিরুদ্ধে, স্পষ্ট দেখছি আমি’ উল্মুক গম্ভীর স্বরে ঘোষনা করেন।

‘চক্রান্ত তোমার বিরুদ্ধে! কিরকম?’

‘আজ থেকে ছয়দিবস পরে আমার বিবাহ, এমত অবস্থায় তুমি কি আর যেতে পারবে হে? বিরিঞ্চিদেবের হত্যা যে আমার আনন্দ মাটি করার জন্যে একথা তো স্পষ্ট!’ উল্মুকের চোখে হাসির ঝিলিক।

‘নিশ্চিন্ত থাক হে বন্ধু, তোমার বিবাহে আমার উপস্থিতি আটকাতে পারবেনা কোনও অর্বাচীন’, প্রাণখোলা পরিহাসে মেতে ওঠেন দুই মিত্র।

***

‘কি প্রকার বিষ প্রয়োগ হয়েছিল আন্দাজ হয় কিছু বৈদ্যরাজ?’, বামদেবকে একান্ত সাক্ষাতে প্রশ্ন করেন পুষ্পকেতু।

‘স্পষ্ট করে বলা কঠিন, তবে বৃহৎ পরিমানে শরীরে প্রবেশ করেছিল সে বিষ, সমস্ত অঙ্গ বিকল হয়েছিল ধীরে ধীরে।’

‘সহজে পাওয়া যায় এমন কিছু, ধুতরো হতে পারে কি?’

‘না ধুতরো নয়।’

‘আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?’

‘ধুতরোর বিষক্রিয়ায় রোগী ভুল বকে, উন্মাদপ্রায় হয়ে যায়; সেসব লক্ষণ ছিলোনা বিরিঞ্চিদেবের।’ চিন্তিত মুখে বামদেবের কাছে বিদায় নেন পুষ্পকেতু।

‘আহার্য পরিবেশনকালে আর কেউ থাকতো সেখানে?’ পুষ্পকেতু পরদিন প্রাতে সন্ধির সাথে নতুন করে শুরু করেন জিজ্ঞাসাবাদ।

‘হ্যাঁ বটুক থাকত, কখনও বা শ্রীরূপ, আর থাকত বক্র।’

‘বক্র কে?’

‘কেন, আচার্যের প্রিয় সারমেয়? বক্রকে না দিয়ে কিছু মুখে তুলতেন না তিনি, বড় স্নেহ করতেন অবলা জীবটিকে।’

***

‘বিরিঞ্চিদেবের কি শত্রুতা ছিল কারও সাথে, বলতে পারো?’ পুষ্পকেতু আবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন বটুকের সাথে।

‘আমি সামান্য অনুচর, কেমন করে জানব? তবে বিত্তবানের প্রতি ঈর্ষা তো অনেকেরই থাকে?’

‘শুধুমাত্র ঈর্ষা থেকে কেউ প্রাণনাশ করেনা, কারও সাথে বিবাদ, দ্বন্দ কিছু ছিল কিনা নিজগ্রামে সেকথা জানতে চাইছি।’

‘তেমন কিছু আমার জানা নেই দেব; আমি থাকতে তাঁর এই সর্বনাশ ঘটে গেলো এই বড় ক্ষেদের বিষয় আমার কাছে।’

‘এ বিষয়ে তুমি আর কি করতে পারতে, অকারণে কষ্ট দিয়োনা নিজেকে’, পুষ্পকেতু স্বান্তনা দেন বটুককে।

‘প্রভুকে হারিয়ে বক্রও কি বেদনাগ্রস্ত?’ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কুক্কুরটিকে দেখে মন্তব্য করেন পুষ্পকেতু।

‘বিরিঞ্চিদেব ওর প্রভু ছিলেননা, ওকে পালন করেছি আমি।’

‘কিন্তু শুনলাম, স্নেহ করতেন খুব, নিজ থালি থেকে আহার্য খাওয়াতেন একে?’

‘প্রয়োজনকে স্নেহ ভাবা ভ্রম। প্রভু অতি সাবধানী ব্যক্তি ছিলেন, কোনও আহার্য বা পানীয় পরীক্ষা না করে গ্রহণ করতেননা পরগৃহে; আর বিষ পরীক্ষকের কার্যটি ছিল আমার; যবে থেকে বক্রকে পালন করেছি, আমার হয়ে এই কার্যটি ওই করে থাকে।’

‘সেকি একথা আগে বলনি তো? আহার্য-পানীয়, ওই মৃৎকলসের জল সকল কিছুই পরীক্ষা করে গ্রহণ করতেন বিরিঞ্চিদেব?’ বটুক উত্তরে সম্মতি জানায়।

***

‘এই মূহুর্তে একবার বিরিঞ্চিদেবের কক্ষটিতে যাওয়া প্রয়োজন, শ্রীরূপ নয়, আপনি নিজে আসুন আমার সাথে’ সোমদত্তকে বিস্মিত করে ছুটে যান পুষ্পকেতু তাঁর কার্যালয়ে। কক্ষদ্বার খোলা হলে সেখান থেকে তাম্বুলকরঙ্কটি সাথে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যান কেতু; বামদেবের হাতে প্রদান করেন সেটি পরীক্ষার জন্য।

‘উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করলে চোখে পড়ে চূর্ন পিণ্ডটির রঙ যেন ঈষৎ ধুসর; চূর্ণের ঝাঁজে বিষের স্বাদও ঢাকা পড়বে; অবশ্য খদিরেও মিশ্রিত হতে পারে বিষ, বর্ণে, স্বাদে চাপা পড়ে যাবে তার উপস্থিতি’ স্বগোক্তি করেন বামদেব। ‘আমি পরীক্ষা করে দেখব কেতু, তুমি এখন এসো।’

মহাদণ্ডকারিকের কার্যালয়ে আলোচনায় বসেছেন বিশাখদত্ত ও পুষ্পকেতু, দুজনের মুখেই চিন্তার ছাপ।

‘তোমার কথামত দৃষ্টি রাখা হয়েছে সন্ধি, শ্রীরূপ ও মঞ্জরীর গতিবিধিতে। সন্ধির একটি প্রণয়ী আছে, সে মহাপ্রতিহারির অধীনস্থ কর্মচারী; সম্ভবত সেকারণেই সন্ধি অতিথিশালায় যাতায়াতের সুযোগ পায়। বিশেষ অতিথিদের সেবা করে সে নিছক পারিতোষিক লাভের আশায়, নাকি আরও কোনও গভীর উদ্দেশ্যে সে এই কার্যে উৎসাহী বলা কঠিন। মঞ্জরী শ্রেষ্ঠীকন্যা, পিতৃকুলের স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে সাধারণ মালাকারকে প্রেম বিবাহ করেছিল সে কয়েক বৎসর পূর্বে, তার বিবাহিত জীবন সুখী বলেই বোধ হয়, একটি পুত্রসন্তান আছে। তবে সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, পুত্রটিকে বিদ্যাশিক্ষা করাতে চায় আশ্রমে পাঠিয়ে, নগরবীথির বিপণিটিও তারই উদ্যোগের ফল। শ্রীরূপের সম্পর্কে যা জানা গেছে, বেশ চমকপ্রদ; সে সূর্যপুরা গ্রামের বাসিন্দা, শোনা যায় তার পত্নী বিরিঞ্চিদেবের গৃহে পরিচারিকার কর্ম করত; তার অসুস্থতার কালে বেশ কিছু অর্থসাহায্য যায় গৃহস্বামীর কোষাগার থেকে; রমণীর মৃত্যু হলে সমস্তই কর্জ বলে দাবী করে বিরিঞ্চিদেবের কোষাধ্যক্ষ। কার্যত ভূস্বামীর নিগ্রহেই সবকিছু ছেড়ে গৃহত্যাগী হয় শ্রীরূপ।’ পিতার বক্তব্য শুনে স্তব্ধ হয়ে থাকেন পুষ্পকেতু বেশ কিছুক্ষণ।

‘নিরীক্ষা যেমন চলছে চলুক, সন্ধির প্রণয়ীর গতিবিধি নজরে রাখার ব্যবস্থা করুন পিতা, এদিকে দেখি বামদেব কি সংবাদ দেন।’

***

হরিষেণের গৃহের বিশ্রামকক্ষ, মধ্যাহ্নভোজন সেরে সেখানে মুখোমুখি বসে মহামন্ত্রী ও পুষ্পকেতু; পরিবেশ বিষাদ গম্ভীর।

'শ্রীরূপের উদ্দেশ্য ও সুযোগ দুই ছিল, তাকে দেখেও বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়। কিন্তু শুধুমাত্র ঋণভার দুর্বহ হলে কেউ হত্যা করে কি?' পুষ্পকেতু সংশয় প্রকাশ করেন।

'বাকি সকলে? তারাও তো সন্দেহের উর্দ্ধে নয় কেউই?'

'তা নয়, কিন্তু বিরিঞ্চিদেবকে হত্যা করে কার লাভ? কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনা দেব, কালো যবনিকা ক্রমশঃ চিন্তার গতি রোধ করছে।'

'সুযোগ তো সন্ধিরই সব চেয়ে বেশী ছিল, সে রমণী, উপরন্তু রমণীয়, আহার্য পরীক্ষার নিয়ম তার সমুখে শিথিল হয়ে থাকতেও তো পারে?' হরিষেণ বলেন।

'সে যুক্তি তো মঞ্জরীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য দেব।'

'আহার্যে মঞ্জরী বিষ কিপ্রকারে মেশাবে?'

'বিষ যদি তাম্বূলে থাকে? সুন্দরী যুবতী নিজহস্তে তাম্বূল রচে দিলে প্রৌঢ় কি প্রত্যাখ্যানে সমর্থ হতেন?'

'আর বটুক, সুযোগ তো তারও ছিল?'

'বিরিঞ্চিদেব কূটবুদ্ধি সাবধানী ব্যক্তি, বটুকের প্রভুভক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হয়ে তাকে সর্বক্ষণের অনুচর করতেন না। তাছাড়া, প্রভুগৃহে আজন্ম লালিত হয়েছে সে বিরিঞ্চিদেবের আনুকুল্যে; তাঁর মৃত্যুর পশ্চাতে সেখানে তার স্থান নাও হতে পারে, অতএব এই হত্যায় বটুকের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নেই কোনও।'

'চিন্তায় বিনিদ্র রাত্রি যাপন করছি কেতু, রহস্যের কিনারা নাহলে সম্রাটের কাছে বড় অপদস্থ হতে হবে আমাদের' দীর্ঘশ্বাস ফেলেন হরিষেণ। কোনও আশ্বাস বাণী শোনাতে পারেননা পুষ্পকেতু, কিছুপরে নিঃশব্দে বিদায় নেন তিনি গম্ভীর মুখে।

উদ্যানসংলগ্ন বহির্দ্বারের দিকে হেঁটে চলেছেন পুষ্পকেতু, আচমকা ক্রন্দনরতা হৈমন্তীকে দেখে গতিরোধ হয়।

'কি হয়েছে হৈম, চোখে জল কেন?' স্নেহভাষণ শুনে বালিকার কান্না আরও বেড়ে যায়।

'ধাইমা ফেলে দিয়েছে আমার আভুষণ, চপলাকে দূর করে দেবে বলেছে।'

'সেকি এতবড় নির্যাতন কিহেতু?' হৈমন্তীর বালিকাসুলভ গৃহকলহে কৌতুক বোধ করেন পুষ্পকেতু, হয়তো বা গভীরসমস্যায় জর্জরিত চিত্ত কিছুটা বিনোদনের পথ খোঁজে।

'চপলা ভারি সুন্দর একছড়া গুঞ্জামালা গেঁথে এনেছিল, আমার গলায় সেখানি দেখে ধাইমা কেড়ে নিল জোর করে, ফেলে দিল আবর্জনায়। চপলা এনে দিয়েছে শুনে, তিরস্কার করেছে তাকে, বলেছে গুঞ্জাবীজে ভয়ানক বিষ, জেনেশুনে এনেছে, দূর করে দেবে ওকে আবার একার্য করলে।'

'কি বললে?' পুষ্পকেতু স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকেন বহুক্ষণ, হৈমর অভিযোগ কানে যায় না আর। এরপর অতিদ্রুত ফিরে চলেন আবার হরিষেণের প্রাসাদে।

'আপনি শীঘ্র অতিথিশালায় যান আর্য, মঞ্জরীকে সেখানে আনবার ব্যবস্থা করুন; আমি বামদেবকে নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি সত্বর। হরিষেণকে আর কিছু জিজ্ঞাসার সুযোগ না দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যান পুষ্পকেতু বামদেবের গৃহের উদ্দেশ্যে।

'গুঞ্জাবীজের বিষ মৃত্যুর কারণ হতে পারে কি বৈদ্যরাজ?' বামদেবের গৃহে পৌঁছে প্রশ্ন করেন পুষ্পকেতু।

'গুঞ্জাবীজ, মানে রক্তি?' কিছুক্ষণ সময় নেন বামদেব কিছু বলার আগে।

'রক্তির ভিতরকার অণ্ড অতি মারাত্মক একথা সত্য, তবে বাইরের শক্ত খোলস ভেদ করে তা বাইরে আসেনা। সেকারণেই, রত্নশ্রেষ্ঠীরা রত্নের ওজন মাপতে ব্যবহার করেন রক্তি।'

'কিন্তু, কেউ যদি খোলস ভেঙে অণ্ডচূর্ণ করে আহার্যে মেশায় তাহলে?'

'তুমি কি বলতে চাইছ আমি বুঝেছি কেতু, রক্তিচূর্ণের রঙ প্রায় সাদা, ঈষৎ হরিদ্রাভ; বামদেবের মৃত্যু এই বিষ থেকে হওয়া সম্ভব, রোগের লক্ষ্মণও সেইরূপ। ভালো কথা, তাম্বূলকরঙ্কের প্রতিটি উপাচার আমি পরীক্ষা করেছি, চূর্ণপিণ্ডটি বিষাক্ত ছিল।'

'যবণিকাপাতের সময় এসেছে দেব, আপনি দয়া করে একবার অতিথিশালায় চলুন'; বামদেবকে পাল্কীতে তুলে অশ্বপৃষ্ঠে রওয়ানা হন পুষ্পকেতু।

বিরিঞ্চিদবের কক্ষমধ্যে চারটি আসনে বসে চার রাজপুরুষ, হরিষেণ, সোমদত্ত, বামদেব ও পুষ্পকেতু, কক্ষসজ্জা হুবহু পূর্বের মত, এমনকি মৃৎকলসটিও কাঠের পাটাতনে রাখা আগের মতই, ভুল হয় বুঝিবা বিরিঞ্চিদেব এখনও বাস করছেন সেখানে। পুষ্পকেতুর আহ্বানে শ্রীরূপ, বটুক, সন্ধি ও মঞ্জরী কক্ষে প্রবেশ করে; সকলের চোখেই উৎকণ্ঠা, শুধু মঞ্জরীর শান্ত মুখে নেই কোনও ভাবাবেগ।

'মেষ সংক্রান্তির আগেরদিন যখন তুমি কক্ষ পরিমার্জনায় এলে ঠিক কি ঘটেছিল?' মঞ্জরীকে প্রশ্ন করে পুষ্পকেতু।

'কিছু তো হয়নি দেব, রোজকার মতই কার্য শেষ করে বিদায় হই আমি।'

'রোজকার মতই? তবে পরেরদিন এলেনা কেন অতিথিশালায়? গুঞ্জার বিষ সেদিনই প্রয়োগ করেছিলে তো?' পুষ্পকেতুর প্রশ্নে চমকে ওঠে সকলে, মঞ্জরীর চোখে দেখা দেয় নিদারুণ ভয়, নিজের অজান্তেই ছুঁয়ে দেখে সে গলার মালাখানি।

'সত্য করে বল, বিষ নিজে প্রয়োগ করেছিলে, না শ্রীরুপকে দিয়েছিলে যথাসময়ে প্রয়োগ করতে?'

'এ আপনি কি বলছেন দেব? আমি কেন একার্য করব?' শ্রীরূপ প্রবলভাবে প্রতিবাদ করে।

'যে ব্যক্তি ভূসম্পদ কেড়ে নিয়ে গৃহছাড়া করল, হয়তো বা কেড়ে নিয়েছিল আরও বেশী কিছু, হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে তাকে বিশ্বাস করতে বল একথা?'

হঠাৎ শ্রীরূপের মুখের পেশী কঠিন হয়ে ওঠে, 'হ্যাঁ, ইচ্ছা জাগেনি একথা বলব না; মনে হয়েছিল ঘুমের মধ্যে গলা টিপে তিল তিল করে হত্যা করি নরাধমকে, ঠিক যেভাবে মরেছিল বেতসী; কিন্তু পারিনি, বিশ্বাস করুন আমি পারিনি'; ভুমিতে বসে পড়ে শ্রীরূপ চূড়ান্ত হতাশায়।

'এখনও সময় আছে সত্য প্রকাশ কর মঞ্জরী, নিজের শিশুপুত্রের কথা ভেবে সব খুলে বল' পুষ্পকেতুর বক্তব্যে আবেদনের সুর। দীর্ঘ মূহুর্তের জন্য সময় নেয় মঞ্জরী, নীরব অশ্রুতে ভেসে যায় তার স্নিগ্ধ মুখখানি।

'আচার্যের কুদৃষ্টি পড়েছিল আমার উপর, এ আমি বুঝেছিলাম প্রথম দিনেই; কিন্তু কাউকে বলতে পারিনি ভয়ে, কেই বা বিশ্বাস করত দরিদ্র মালিনীর কথা। সংক্রান্তির পূর্বদিন, কক্ষে একলা ছিলেন আচার্য; আমার পশ্চাতে কপাট রূদ্ধ করে কুপ্রস্তাব দেন তিনি, আমি অসম্মতি জানানোয় ভয় দেখান কুলটা অপবাদে সমাজ ছাড়া করবেন। তারপর বলপ্রয়োগের চেষ্টা করেন, কিন্তু সেসময়ে আচমকা বটুক এসে পড়ে, আমার চিৎকারে জানালা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে সে, আমি সেখান থেকে ছুটে পালাই। বিশ্বাস করুন, আমি এর বেশী কিছু জানিনা' ডুকরে কেঁদে ওঠে মঞ্জরী।

'বটুক বাকী কথা কি তুমি বলবে, না আমাকেই বর্ণনা করতে হবে?' পুষ্পকেতুর স্বর গম্ভীর।

'বলবার তো বিশেষ কিছু নেই দেব, সামান্য অনুচর আমি, লোকে বলে দাসীর অবৈধ সন্তান। সেদিন মঞ্জরী চলে যেতে ক্রোধে উন্নত্ত হয়ে মস্তকে পদাঘাত করেছিলেন বিরিঞ্চিদেব, যাকে আমার মা আজন্ম দেবতা ভাবতে শিখিয়েছিল। জন্মদাতা হয়েও তিনি চিরকাল ব্যবহার করেছেন আমায় অনুগত কুক্কুরের মত, আমার অভাগা জননী কলঙ্কের কালি মেখে জীবনপাত করেছে অকালে। সব সয়েছি কর্তব্যজ্ঞানে, কিন্তু আমার সেই মাতাকে অপমান! বেশ্যাপুত্র বলে সম্বোধন করেছিল সেদিন ওই নারীলোভী ধর্ষক! যা করেছি কোনও পরিতাপ নেই আমার। মঞ্জরীর গলার ছিন্নমালা পড়েছিল ভূমিতে; প্রভু স্নানাগারে গেলে চূর্ণপিন্ডে

মিশিয়ে দেই বিষ, তাম্বূল পরীক্ষা করিয়ে চর্বণ করবেন না জানতাম যে', এক বিদ্বেষ হাসি জেগে ওঠে বটুকের মুখে, চোখের কোল হতে ঝরে পড়ে দুইবিন্দু অশ্রু।

'বটুকই যে অপরাধী সে সন্দেহ হল কি রূপে?' গৃহের একান্তে পুষ্পকেতুকে প্রশ্ন করেন হরিষেণ।

'প্রথমে সন্দেহ হয়নি, বিষপ্রয়োগ সাধারণত রমণীর অস্ত্র, অথবা গুপ্তচরের বা কূটনৈতিক গুপ্তহত্যার হাতিয়ার। সেক্ষেত্রে শ্রীরূপের যতই উদ্দেশ্য থাক, তাকে অপরাধী ভাবতে পারছিলাম না, সে হত্যা করলে হয় ছুরিকাঘাতে অথবা শ্বাসরূদ্ধ করে কার্যসিদ্ধি করত। সন্ধি চপলমতি, হত্যা করার মত স্নায়ুবল তার নেই। গুঞ্জাবিষের কথা জেনে মঞ্জরীকেই সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু বিরিঞ্চিদেব যে কলসের জলও পরীক্ষা ভিন্ন পান করতেননা সেকথা তার জানার কথা নয়, অতএব সে এ কার্য করলে, জলেই বিষ মেশাতো। সেক্ষেত্রে, বাকী থাকে বটুক; কূটনীতিজ্ঞ প্রভুর অনুচর, গুপ্তহত্যা ও বিষবিজ্ঞান সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া, বিরিঞ্চিদেবের কক্ষে যখন মঞ্জরীকে বিষের কথা বলি, বটুক অজান্তেই কক্ষমধ্যে পূর্ববৎ রাখা তাম্বূলকরঙ্কটির দিকে দৃষ্টিপাত করে; আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম। এই পরীক্ষাটি করার জন্যেই সকল বস্তু আগের মত কক্ষে সাজিয়ে রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলাম এই চারজনের অজান্তে।'

'তোমাকে কি বলে আশীর্বাদ করি কেতু, আজ কতবড় লজ্জা থেকে রক্ষা করলে তুমি আমাদের সকলকে! বল বৎস, কি পুরস্কার চাও? তোমাকে কিছু দিতে পারলে তৃপ্ত হব আমি।'

'পুরস্কার নয় আনুকুল্য চাই দেব।'

'আনুকুল্য, কি বিষয়ে?'

'সমুদ্রযাত্রা, ভিন্নদেশ, ভিন্নসংস্কৃতি, এ আমার বহুকালের অভিলাষ, আপনার পৃষ্ঠপোষকতায় সম্ভব হতে পারে তা।'

'বেশ, আমি চেষ্টা করব; তুমি সম্ভবনাময় পুরুষ, ব্যপ্ত হোক তোমার অভিজ্ঞতা, ক্ষুদ্র গন্ডিতে বাঁধব না তোমায়, শুভমস্তু।'

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি; মায়াবী চন্দ্রমা, ফুলসাজ আর উলূরবে স্বপ্নময় বিবাহসভা; সদ্য বিবাহিত বর-বধূকে ঘিরে রেখেছে আত্মীয় বন্ধুদল, আশীর্বাণী ও উপঢৌকনে উৎসব মাতোয়ারা। উল্মুকের একপাশে নিঃশব্দে এসে আসন গ্রহণ করেন পুষ্পুকেতু; উৎসবের বিশেষ সজ্জায় তিনি আজ সাক্ষাৎ কন্দর্প।

'বাঁধা পড়লে অবশেষে? গৃহিণীর করায়ত্ত হয়ে বোধ করছ কেমন?' পরিহাস করেন পুষ্পকেতু স্বভাবসিদ্ধ স্বরে।

'এ বন্ধন ভারি মধুর; তুমিও বুঝবে অচিরেই।'

'না বন্ধু, তুমি বন্ধন পিয়াসী; আমার মুক্তি সুদূর দিগন্তের পরপারে' পুষ্পকেতুর উদাসী স্বর ভেসে যায় বাতাসে, প্রাসাদ অলিন্দে বেজে ওঠে মিলন রাগিণী, মায়াবী আলোয় জাগে ভবিষ্যতের আশ্বাস।

*** ***

দুরূহ শব্দের অর্থ:

শ্বেত কুমুদ – সাদা শালুক, পনস – কাঁঠাল, জাতিপুষ্প – জুঁই ফুল, তক্র – দইয়ের ঘোল, মহাপ্রতিহারি – রাজপুরীর ব্যাবস্থাপক, উপারিক – রাজ্যপাল, মেষ সংক্রান্তি – চৈত্র সংক্রান্তি, কালিঙ্গ – তরমুজ, গুঞ্জা – কুঁচফল, রক্তি – রতি, তাম্বুলকরঙ্ক – পানের বাক্স, অলিন্দ - বারান্দা

প্রহেলিকা

পাটলীপুত্র নগরী গঙ্গা, সদানীরা ও হিরণ্যপ্রভার সঙ্গমস্থলে গড়ে ওঠা এক সুরম্য জনপদ, বহুশতাব্দী ধরে শক্তিশালী মগধ সাম্রাজের প্রাণকেন্দ্র ও রাজধানী। তবে পাটলীপুত্রের এই বৈভবের অন্যতম কারণ তার ভৌগলিক অবস্থান। নদীসঙ্গমে গড়ে ওঠা এই নগরীর উপান্তে নির্মিত সুবিশাল বন্দর পশ্চিমে ভৃগু কচ্ছ ও পূর্বে তাম্রলিপ্তের মাধ্যমে সুদুর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দুয়ের সাথেই সংযোগ রক্ষায় সমর্থ হয়েছে। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সুদক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার গুণে পত্তনীর পরিবেশ দেশীয় তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল; ফলে, দেশী বিদেশী বণিকদের আনাগোনায় এই নদী বন্দর কর্মচঞ্চল ও বর্ধিষ্ণু।

বাণিজ্যের প্রয়োজনে নগর প্রাচীরের বাইরে বন্দরসংলগ্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে অনেকগুলি ছোট, বড় পান্থশালা ও শুণ্ডালয়। বর্ধিষ্ণু পান্থশালাগুলি প্রধানত দেশী ও বিদেশী বণিকদের সাময়িক আবাসস্থল, আবার বাণিজ্য সংক্রান্ত বৈঠকেরও কেন্দ্র অনেকক্ষেত্রেই। শুণ্ডালয়েও হরেকরকম মানুষের যাতায়াত; সন্ধ্যাকালে শীতল পানীয়, অক্ষক্রীড়া, এছাড়াও নানান বিনোদনের বন্দোবস্তপূর্ণ পানশালাগুলি কিছু সময়ের জন্য স্বদেশ বিরহ ভুলে থাকার আশ্রয়।

ভদ্র রৈবতের পানশালাটি বর্ধিষ্ণু ও অত্যন্ত জনপ্রিয়, বিত্তশালী ব্যবসায়ী ও বিদেশী নাগরিকদের নিত্য যাতায়াত সেখানে। বিকেল থেকেই অতিথি সমাগমে ব্যস্ত হয়ে ওঠে পানসভা কক্ষ; দীপস্তম্ভের মায়াবী আলো আর চম্পকগন্ধী কাম্পিল্যের সুবাসে পরিবেশ হয় মোহময়। সুবেশ সেবকের দল ত্রস্তপায়ে অভ্যর্থনা জানায় অতিথিদের, ফুলমালা, তাম্বুল হাতে এগিয়ে আসে সুন্দরী পরিবেষিকারা। সুরা পরিবেষন ছাড়াও মানী অতিথিকে সঙ্গদানেও বিশেষ পটু এই সুরসিকাগণ। নিভৃতে একাকী সময় যাপনের উদ্দেশ্যে একান্ত কক্ষেরও বন্দোবস্ত আছে অতিথি বিশেষের জন্যে। তবে এই পানশালাটির আরেকটি সম্পদ হল কিলাত, সে এক খর্বকায় মানব; রহস্যালাপ ও শারীরিক অনুশীলন দেখিয়ে মনরঞ্জনে পাটলীপুত্রে তার জুড়ি মেলা ভার।

***

স্বায়ংকাল আসন্নপ্রায়, গোধূলির রঙের ছোঁয়া নদীবক্ষে, ব্যস্ত বন্দরে কর্মবিরতির উদ্যোগ; সুন্দর পোশাক ও সাজসজ্জায় বণিক ও শ্রেষ্ঠীরা চলেছেন দিবসের ক্লান্তি দূর করতে বিভিন্ন পানশালায়। রৈবতের শুণ্ডালয়ের ভিতরে অতিথি সমাগম শুরু হয়েছে, পানকক্ষের একপাশের বেদীতে বসে আছেন এক সঙ্গীতকার, তাঁর বাঁশীতে বেজে উঠেছে মধুর তান। কিলাত রংবিরঙ্গী বিচিত্র পোশাকে সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে কক্ষময়, কিছুপরে শুরু হবে তার অভিনব উড়ান খেলা, কক্ষের ছাদ থেকে ঝোলানো রজ্জুতে ভর করে সে উড়ে বেড়াবে বায়বীয় কপির মত। এবিষয়ে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে ইতিমধ্যেই, এ খেলা বিপজ্জনক, বিশেষ উপলক্ষ ভিন্ন কিলাত দেখায়না এটি। এক বিদেশী রাজপুরুষের আতিথ্যকে ঘিরে এদিনের এই আয়োজন। রাজপুরুষ ভীমদেব যৌধেয়বাসী, অক্ষক্রীয়ায় বিশেষ আসক্ত, সবান্ধব যাওয়া আসা করছেন বিগত কয়েকদিন, কিলাতকে এরই মধ্যে বিশেষ সন্তোষের চোখে দেখেছেন তিনি।

রাজপুরুষ তখনও আসেননি, কয়েকজন ভিনদেশী বণিক বসে আছেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে; শ্রেষ্ঠী সোমদত্ত ও ভদ্রিল কোনও বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন, তাঁদের দুজনেরই সুবিশাল ভাণ্ডশালা আছে বন্দরে। এসময়ে কক্ষে প্রবেশ করেন রুদ্রষেণ, পোষাক ও ব্যক্তিত্বে তিনি অন্যদের থেকে কিছু আলাদা, এক নজরেই বোঝা যায় সেকথা। রুদ্রষেণ পাটলীপুত্রের এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, শুল্ক বিভাগের কর্মী। বিগত একমাস যাবৎ বিশেষ দায়িত্বে বন্দর চত্বরেই বহাল আছেন, সেই অবধি নিয়মিত এই শুণ্ডালয়েই সন্ধ্যাকাল যাপন করেন

তিনি। স্বভাবগম্ভীর মানুষটি বাক্যালাপ সামান্যই করে থাকেন, তবে সেবক ও পরিবেষিকাদের পারিতোষিক দেন মুক্তহস্তে। রৈবতের পানশালায় তাঁর বিশেষ খাতির পদমর্যাদাগুণে।

রুদ্রষেণ কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি শূণ্য উৎপীঠিকার সমুখে গিয়ে বসেন, এটি তাঁর পছন্দের জায়গা, রৈবত সেটি প্রতিদিন সংরক্ষিত রাখে তাঁর জন্য। রুদ্রষেণ স্বল্পবাক এবং হয়তো কিছুটা উদ্ধতও, তবে পানকক্ষের কেন্দ্রতে বসে অতিথিদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে পছন্দ করেন সুরা পানের অবকাশে। কিছু সময়ের মধ্যে ঘর ভরে ওঠে; একসময় সপারিষদ দেখা দেন ভীমদেবও। তাঁকে দেখে কিলাত এগিয়ে যায় হাসিমুখে, অনুমতি নিয়ে শুরু করে সে তার অভিনব খেলা। উপরের খিলান থেকে ঝুলছে কয়েকটি রজ্জু, একখানি বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে তার একটি ধরে ঝুলে পড়ে কিলাত; আর তার পর শুরু হয় এক থেকে আরেক রজ্জু ধরে তার বায়বীয় সঞ্চারণ। অতিথিরা বাহবা রবে উৎসাহ দেন, ভীমদেবের চোখেমুখে উত্তেজনা, এ দৃশ্য তাঁকে বিস্মিত করেছে সন্দেহ থাকে না। সেবকের দল সতর্ক ভাবে লক্ষ্য রাখে কিলাতের উপর, তাদের চোখেমুখে আশঙ্কা। রুদ্রষেণ অবশ্য খেলায় তেমন মনযোগী নন, তিনি লক্ষ্য করছেন অতিথিদের অভিব্যক্তি; অযথা জীবনের ঝুঁকি নেওয়া তাঁর কাছে বাতুলতা মাত্র।

'অতি উত্তম! জয়তু কিলাত!' ভীমদেব সরব হন অতি উচ্ছ্বাসে, আর ঠিক তখনই ঘটে যায় এক বিপর্যয়, কিলাত সামনের ঝুলন্ত রজ্জুটি ধরতে গিয়ে ব্যার্থ হয়। সমস্ত কক্ষে নিমেষে নেমে আসে এক শ্বাসরোধকারী নিস্তব্ধতা, শূন্য থেকে অসহায়ভাবে পতন ঘটে কিলাতের, তবে ভূমি নয়, সে আছড়ে পড়ে রুদ্রষেণের পৃষ্ঠে। একঝটকায় তাকে মাটিতে ফেলে উঠে দাঁড়ান রুদ্রষেণ, তাঁর মুখভাব থমথমে, নিষ্ঠুর ভাবে পদাঘাত করেন তিনি কিলাতকে অসম্ভব ক্রোধে। রৈবত ছুটে আসে কিলাতকে সরিয়ে নিতে, অতিথিরা নিজেদের মধ্যে উষ্মা প্রকাশ করেন এই অমানবিক ঔদ্ধত্যে। অল্পসময় পরে, রৈবতের সাথে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে কিলাত রুদ্রষেণের কাছে, তখনও তার চোখেমুখে বিপর্যয়ের রেশ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে এর পরে, বংশীবাদকের সুরজাল বয়ে আনে স্বস্তি।

প্রায় দুইদণ্ডকাল কেটে গেছে, 'পানপাত্র খালি যে আর্য?' বিলোল কটাক্ষ হেনে সুন্দরী মহল্লিকা সুরাভাণ্ড হাতে রুদ্রষেণের পাশে এসে দাঁড়ায়। সে ব্যস্ত ছিল নিকটে বসা এক বিদেশী বণিকের সেবায়, রুদ্রষেণ বহুক্ষণ চুপচাপ, পানীয়তেও আগ্রহ দেখাননি কিলাতঘটিত বিড়ম্বনার পর থেকে। সম্ভবত রৈবতের ইশারাতেই সে মনযোগী হয়েছে প্রভাবশালী অতিথির প্রতি; মহল্লিকাকে রুদ্রষেণ পছন্দ করেন।

'প্রয়োজন নেই' রুদ্রষেণ রুষ্টস্বরে উত্তর দেন, তাঁর মুখের ভাবে একপ্রকার জান্তব বিকৃতি।

'একথা বললে যে ব্যাথা পাই প্রভু; সুরা কি প্রয়োজনে পান করার বস্তু? না হয় এই অধমার মান রাখতেই নিন', কথাকটি বলে মহল্লিকা সুরা ঢেলে দেয় তাঁর পাত্রে অনুমতির অপেক্ষা না করে, সেই সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে সে।

'এই অযাচিত আগ্রহ অন্যস্থানে প্রকাশ কর দাসী!' পানপাত্র ঠেলে সরিয়ে দেন অতিথি, পানীয় ছলকে ছড়িয়ে পড়ে পীঠিকার উপরে। দাসী সম্বোধনে অপমানে রক্তাভ হয় মহল্লিকার মুখশ্রী; তবু অভ্যস্ত পেশাদারিত্বে আন্তরিক ভাব বজায় রাখে সে।

'তবে এই মিষ্ট তাম্বুল নিন' একখানি তাম্বুল রুদ্রষেণের ওষ্ঠপ্রান্তে ধরে মহল্লিকা, নিজের বামহাতখানি আলগোছে ছড়িয়ে দেয় সে অতিথির স্কন্ধে অন্তরঙ্গতায়। রুদ্রষেণের মুখচোখ অগ্নিগর্ভ, কপালে জমে উঠেছে স্বেদবিন্দু, এক ঝটকায় মহল্লিকার হাত খানি সরিয়ে, তার কেশগুচ্ছ চেপে ধরে সজোরে ধাক্কা মারেন তিনি, 'কুহকিনি দূর হ!' মহল্লিকা ভূপতিত হয়, পীঠিকার পদস্তম্ভে লেগে কপাল কেটে রক্ত ঝরতে শুরু করে তার।

'কাপুরুষ! দুর্বলের উপর পৌরুষ দেখাও?' পার্শ্ববর্তী পীঠিকার বণিক গর্জে উঠে রুদ্রষেণের সামনে এসে দাঁড়ান, কিছুপূর্বে এঁর সেবাতেই ব্যস্ত ছিল মহল্লিকা; পূর্বের কিলাতপর্বও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন নীরবে। 'সাহস থাকে আমার সাথে শক্তিপরীক্ষায় এসো', রুদ্রষেণকে প্ররোচিত করেন তিনি। কক্ষমধ্যে পুনরায় নেমে

আসে স্তব্ধতা; জনগনের নীরব সমর্থন বণিকের পক্ষে, সন্দেহ থাকে না। হঠাতই উন্মত্ত ক্রোধে কোষবদ্ধ ছুরিকা বের করে বণিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন রুদ্রষেণ, বণিকও ছুরিকা বের করেন আত্ম প্রতিরোধে। আচমকা শুণ্ডালয়ের পরিবেশ যে এরূপ ভয়াবহ হয়ে উঠবে কল্পনা করেনি কেউই; অথচ এই মরণপণ দ্বন্দযুদ্ধে মধ্যস্থতা করতে যাওয়া আত্মহত্যার সামিল। বাধ্য হয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে সকলেই।

মল্লযুদ্ধের প্রচণ্ডতায় ভূলিণ্ঠিত হয়েছেন দুজনেই, তবু একে অন্যের দৃঢ় বন্ধন থেকে বিচ্যুত হননি কেউই, ঝন্ঝন্ শব্দে রুদ্রষেণের ছুরকাটি ছিটকে পড়ে একসময়, আর সেই সাথে এক মরণান্তক আর্তনাদে সচকিত হয় পরিবেশ। রৈবত মরীয়া হয়ে ছুটে যায় কাছে, ততক্ষণে রুদ্রষেণ প্রাণহীন পুতুলের মত ধরাশায়ী, বণিক হতভম্ব বিস্ময়ে চেয়ে আছেন প্রতিপক্ষের বুকে বিঁধে থাকা ছুরিকাটির দিকে। হুটোপুটি, চিৎকার, নারীকণ্ঠের রোদন, এসকল বিভ্রান্তির মাঝে কেটে যায় বেশ কিছুটা সময়, 'এখনও শ্বাস চলছে!' হেঁকে ওঠে এক সেবক এর মাঝখানে। নিকটবর্তী কোনও বৈদ্যকে খবর দিতে ছুটে বেরিয়ে যায় কয়েকজন রৈবতের নির্দেশে। শ্বাস দ্রুত ক্ষীণ হয়ে আসে, অবচেতনায় তলিয়ে যেতে থাকেন বলিষ্ঠ রাজপুরুষ। বণিক কিছুদূরে হেঁটমুণ্ডে বসে থাকেন, বিদ্ধস্ত, বিহ্বল; যেন সত্যকার পরাজয় হয়েছে তাঁরই।

বৈদ্য আসেন, দেহ পরীক্ষা করে হতাশভাবে মাথা নাড়েন, 'বড় দেরী হয়ে গেছে', মৃদুস্বরে নিধান দেন তিনি। মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত, ইচ্ছাকৃত হত্যা নয়, তবু বন্দর রক্ষীদের সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন। রক্ষীরা এসে প্রাথমিক তদন্ত শেষে দেহ নিয়ে যায় দণ্ডাধিকারিক কার্যালয়ে; অস্বাভাবিক মৃত্যু নথীভুক্ত করা প্রয়োজন, তায় রুদ্রষেণ রাজকর্মচারী। বণিক ও রৈবতকেও সঙ্গে নেন তাঁরা, এঁদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হবে অধিকারিকের দপ্তরে।

***

কুমার পুষ্পকেতু নিজ কক্ষের নিভৃত কোনে একখানি পীঠিকার উপর নিবিষ্ট হয়ে আছেন, একান্ত মনযোগে একটি জ্যামিতিক প্রহেলিকা সমাধানে ব্যস্ত তিনি। কুমারের জ্যামিতিপ্রীতির কথা সকলেই জানে, এই তরুণ বয়সে রাজকুলজাত হয়েও তিনি অবসর যাপন করেন জ্যামিতি ও সঙ্গীতচর্চায়; অনেকের কাছে এ এক বিস্ময়। সকালের স্নিগ্ধ আলোয় কুমারের এই নিবিষ্ট রূপ বড় মনোরম, তাঁর মুখখানি সৌন্দর্য ও বুদ্ধির দীপ্তিতে অসামান্য।

'প্রভু আপনাকে স্মরণ করেছেন দেব, তিনি কার্যালয়ে আছেন', গৃহসেবক এসে সংবাদ দিতে, মনযোগ ভঙ্গ হয় পুষ্পকেতুর, কিছুটা বিস্মিত দেখায় তাঁকে।

'পিতা এই প্রত্যুষেই কার্যালয়ে?' স্বগোক্তি করেন তিনি, এরপর অতিদ্রুত প্রস্তুতি নেন বাইরে যাবার উদ্দেশ্যে।

মহাদণ্ডনায়ক বিশাখগুপ্তের ন্যায়পরায়ণতা ও কর্তব্যবোধ সর্বজনবিদিত; সম্রাটের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিসাবে নয়, নিজগুণেই এই পদ তিনি আলোকিত করে চলেছেন প্রায় এক যুগ কাল। অতি প্রত্যুষে কার্যালয়ে তাঁর উপস্থিতি কোনও বিশেষ প্রয়োজনে সে কথা বলাই বাহুল্য; তবে পুত্র পুষ্পকেতুকেও এই জরুরী আহ্বান কোনও জটিল সমস্যারই ইঙ্গিত বহন করে। বুদ্ধিমান পুত্রের বিশ্লেষনী ক্ষমতার উপর তাঁর অগাধ আস্থা, পুষ্পকেতুও এবিষয়ে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন বারম্বার।

***

‘একটি বিশেষ কারণে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি কেতু, ভদ্র চিত্রক একটি গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করতে চান’, কক্ষে উপস্থিত আর এক মধ্য বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি নির্দেশ করেন বিশাখগুপ্ত। চিত্রক একজন অভিজ্ঞ দণ্ডাধিকারিক, কর্মজীবনের শুরুতে গুপ্তচর বিভাগে দায়িত্ব পালনের সুবাদে বিষবিজ্ঞান ও শরীরবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি হত্যাজনিত সমস্যায় শরীর পরীক্ষা করে থাকেন দণ্ডালয়ের পক্ষ থেকে।

‘কাল রাত্রে বন্দর সংশ্লিষ্ট একটি শুণ্ডালয়ে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবগত আছেন কি আর্য?’ পুষ্পকেতুকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করেন চিত্রক।

‘হ্যাঁ পিতার মুখে শুনেছি সে কথা; আপনি কি সে বিষয়েই কিছু জানাতে চান?’

‘কতকটা তাই; দেহ পরীক্ষা করে বিভ্রান্ত বোধ করছি। গত সন্ধ্যায় বন্দর রক্ষীদের বক্তব্যের সাথে আমার পর্যবেক্ষণের কিছু বিরোধ ঘটেছে, বিভ্রান্তি সে কারণেই।’এরপরে চিত্রক যা বলেন তা এইপ্রকার।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী ছুরিকাঘাতে মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু দেহ পরীক্ষা করে তিনি দেখেন যে ছুরিকাঘাত গভীর ছিল ঠিকই কিন্তু তা প্রাণঘাতী নয়। ছুরিকা বুকে বিদ্ধ হলেও হৃদপিণ্ড স্পর্শ করেনি। দেহে বিষের লক্ষ্মণ স্পষ্ট, আন্দাজ হয় মৃত্যু বিষক্রিয়া থেকে ঘটেছে। সম্ভবত ছুরিকাটিতে বিষ মাখানো ছিল। এ অবস্থায়, মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত একথা বলা চলেনা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল এমন ধারণা অসঙ্গত নয়।

‘সেক্ষেত্রে ঘটনাটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা কর্তব্য, বণিককে আটক করেছেন কি ভদ্র?’ পুষ্পকেতু প্রশ্ন করেন।

‘বণিক বিদেশী, সম্মানিত ব্যক্তি, দণ্ডাধীশের অনুমতি ভিন্ন কারারুদ্ধ করা সমীচীন বোধ হয়নি; তবে তিনি শুণ্ডালয়েই অপেক্ষমান, সেখানে প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।’

‘ঠিক কি ধরণের বিষ ব্যবহৃত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ভদ্র?’

‘এখনি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারিনা, তবে এ অতি তীব্র বিষ, মৃত্যু ঘটেছে অতিদ্রুত।’

পরিস্থিতি বিচার করে পুষ্পকেতু শুণ্ডালয়ে যাওয়া স্থির করেন, পূর্বদিনের ঘটনার সঠিক বিবরণ পেতে যাবতীয় প্রত্যক্ষদর্শীর সাথে কথা বলা প্রয়োজন।

***

শুণ্ডালয়ে পৌঁছিয়ে প্রথমে রৈবতের সাথে দেখা করেন পুষ্পকেতু, তার কাছে ঘটনার বিশদ বিবরণ শোনেন তিনি। বণিক ভৃগুকচ্ছের বাসিন্দা, নাম জয়কেশী; সম্বৃদ্ধ গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ী, কর্মোপলক্ষে পাটলীপুত্রে এসেছেন বেশ কয়েকবার। এছাড়া বাকী অতিথিদের মধ্যে ভীমদেব সপারিষদ এই প্রথম এসেছেন পাটলীপুত্রে, বন্দরসংলগ্ন একটি বর্ধিষ্ণু পানশালার একাংশ ভাড়া নিয়ে রয়েছেন বেশ কিছুদিন হল। স্থানীয় ব্যবসায়ী সোমদত্ত ও ভদ্রিল নগরীর অভ্যন্তরে শ্রেষ্ঠী পল্লীতে বাস করেন, দুজনেই মসলা ব্যবসায়ী। বাকী যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, কেউই নিয়মিত অতিথি নন, তাঁদের অবস্থান জানা নেই রৈবতের।

‘ঘটনাকালে উপস্থিত সকলের সাথেই কথা বলতে চাই ভদ্র, আপনি ব্যবস্থা করুন।’

‘আমার কর্মচারীরা সকলে এখানেই রাত্রিযাপন করে, পরিবেষিকা চারজন কাছেই থাকে, ডেকে আনার বন্দোবস্ত করছি। কিন্তু মানী অতিথিদের কেমন করে সংবাদ পাঠাই প্রভু?’ রৈবতকে চিন্তিত দেখায়।

‘আপাততঃ এদের সাথেই কথা বলব, আপনি অতিথিদের ঠিকানা জানাবেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় আমরাই করে নেব।’

এরপর শুরু হয় সাক্ষাৎকারপর্ব; সঙ্গত কারণেই প্রথমে ডাক পড়ে বণিকের, তিনি একান্ত কক্ষে বিশ্রাম করছিলেন, ধীর পায়ে এসে আসন গ্রহণ করেন। বণিক সুপুরুষ, পোশাক ও আভুষণ দেখে তাঁর আর্থিক সাচ্ছ্বল্য অনুমান করা যায়; বয়স যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিক্ষণে, যদিও দেহের গঠন অত্যন্ত বলিষ্ঠ, যা

আর্যাবর্তের পশ্চিমা দেশগুলির একটি বৈশিষ্ট। চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ, তিনি একজন পদস্থ ব্যক্তি আচরণে তা স্পষ্ট হয় ; তবে সাম্প্রতিক ঘটনার বিপাকে একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত।

'রূদ্রষেণের সাথে পরিচয় কতদিনের ভদ্র?' পুষ্পকেতুর প্রশ্নে চমকে ওঠেন জয়কেশী।

'পরিচয় ছিলনা।'

'বিনা পরিচয়েই হত্যা করলেন?'

'হত্যা? এ কি বলছেন আপনি? এ নিছক দুর্ঘটনা, আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করেছিলাম আমি।' স্খলিত শোনায় বণিকের স্বর।

'কিন্তু তাঁকে দ্বন্দযুদ্ধে আপনিই প্ররোচিত করেছিলেন অস্বীকার করতে পারেন সেকথা?'

'পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল, যেকোনও পুরুষ আমার স্থানে এরূপ ব্যবহারই করত।'

'সেসময়ে এখানে আপনি ভিন্ন কোনও পুরুষ ছিল না, এই কি আপনার মত ভদ্র?' একথা শুনে ক্রোধে রক্তবর্ণ দেখায় বণিকের মুখ।

'নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ মগধে অপরাধ, জানা ছিল না আর্য। আমাদের দেশে নিয়ম কিছু ভিন্ন।'

'বিষাক্ত ছুরিকার আঘাতে পরিকল্পিত হত্যা, সেও কি অপরাধ নয় আপনাদের দেশে?'

'বিষাক্ত ছুরিকা?' বিহ্বল দেখায় জয়কেশীকে।

'আপনার ছুরিকায় বিষ ছিল, অস্বীকার করতে পারেন ভদ্র?'

না না, এ সব মিথ্যা!', অসহায় আর্তিতে ভেঙ্গে পড়েন বণিক। তাঁকে আপাততঃ রক্ষীদের প্রহারায় রেখে অন্যদের সাথে বাক্যালাপ শুরু করেন পুষ্পকেতু।

'ভদ্র রুদ্রষেণকে তুমি কতদিন ধরে দেখছ?' সেবক বল্লভকে প্রশ্ন করেন কুমার। বল্লভ সেবকদের মধ্যে প্রধান ও সবচেয়ে পুরোনো কর্মচারী।

'প্রায় মাসাধিক কাল হল তিনি রোজই আসতেন প্রভু।'

'একাই আসতেন সর্বদা, না সঙ্গীও থাকত কেউ? অন্যান্য অতিথিদের সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল তাঁর?'

'একাই আসতেন, তেমন মিশুক স্বভাবের ছিলেননা ভদ্র, নীরবে সুরাপানে সন্ধ্যাযাপন করে বিদায় নিতেন।'

'শ্রেষ্ঠী জয়কেশী কতদিন হল আসছেন?'

'সেও প্রায় মাসাধিককাল হবে, তার আগে ওঁকে কখনও দেখিনি।'

'উনি মেলামেশা করতেন বাকী অতিথিদের সাথে?'

'মেলামেশা করতেননা সেভাবে, তবে কারও অক্ষক্রীড়ায় সঙ্গীর অভাব ঘটলে খেলায় যোগ দিতেন মাঝে মধ্যে।'

'জয়কেশীর সাথে আলাপ পরিচয় ছিল রুদ্রষেণের?'

'এখানে তাঁদের আলাপ করতে দেখিনি কখনও, তবে একে অপরকে চিনতেন কিনা বলতে পারিনা।'

'কালকের দ্বন্দযুদ্ধ জয়কেশীর অযথা প্ররোচনায় ঘটেছিল কি? এব্যাপারে তোমার কি মত।' প্রশ্ন শুনে কিছুটা সময় নেয় বল্লভ, শেষে সসঙ্কোচে উত্তর দেয় সে।

'অপরাধ নেবেননা প্রভু, আমি সামান্য সেবক। তবু ভদ্র রুদ্রষেণের কাল সন্ধ্যার আচরণ অতি গর্হিত ছিল। প্রথমে কিলাত, তারপর মহল্লিকা; হয়তো কিলাত পৃষ্ঠে পড়ে যাওয়ায় আঘাত পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সে তো একটা দুর্ঘটনা। তাঁর পৃষ্ঠে না পড়লে কিলাতের প্রাণসংশয় ঘটতে পারত, অথবা জীবনভর পঙ্গু হয়ে যেতো সে।' বল্লভের কাছে আরো যা জানা গেলো সে হল, মহল্লিকার সঙ্গ পছন্দ করতেন জয়কেশী, বিগত কয়েকদিনে কিছু বেশীই অন্তরঙ্গতা ঘটেছিল দুজনের। রুদ্রষেণও অন্যদের তুলনায় অধিক সদয় ছিলেন মহল্লিকার প্রতি, গতকালের পূর্বে কোনওদিন অন্যায় আচরণ করেননি তার সাথে।

এরপর একে একে বাকী সেবক ও পরবেষিকাদের সাথে কথা হয়, বল্লভ যা জানিয়েছে, তার বাইরে এরা কিছু জানাতে পারে না। সর্বশেষে প্রশ্নোত্তরের জন্য ডাক পড়ে যথাক্রমে মহল্লিকা ও কিলাতের।

'কতদিন যাবৎ এই কর্মে নিযুক্ত আছ?' মহল্লিকাকে প্রশ্ন করেন পুষ্পকেতু। মহল্লিকা সুন্দরী যুবতী, পেশাগত ভাবে হয়তো চটুলাও; তবে এই মূহুর্তে তার শান্তশ্রী শুণ্ডালয়ের পরিবেশে যেন কিছুটা বেমানান।

'বিগত চার বর্ষকাল।'

'তার আগে কোথায় কর্ম করতে?'

'কর্ম করতাম না, গৃহস্থালী সামলাতাম।'

'তুমি গৃহস্থ কন্যা?' কিছুটা অবাক হলেও, নিজেকে সামলে নেন কুমার। শুণ্ডালয়ের পরিবেষিকারা সাধারণত গণিকা পল্লী থেকেই আসে।

'এহেন পরিণতির কারণ?'

'কারণ আর কি, অকাল বৈধব্য, শ্বশুরগৃহের গঞ্জনা। অন্যের আশ্রয়ে বড় হয়েছি, অনাথা; স্বামী দরিদ্রকন্যা জেনেও পরিবারের অমতে বিবাহ করেছিলেন।' মহল্লিকার দীর্ঘশ্বাসে ভারি হয়ে ওঠে কক্ষের বাতাস।

দুর্ঘটনাজনিত কোনও অতিরিক্ত সংবাদ দিতে পারে না সে, শুধু জানায়, রুদ্রষেণের উগ্র মেজাজের পরিচয় আগেও পেয়েছে সেবকেরা, যদিও তার সাথে এই প্রথমবার। জয়কেশী অত্যন্ত ভদ্রব্যক্তি, মহল্লিকার অতীতের পরিচয় জেনে অবধি তার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন তিনি।

'তোমার কিলাত নামটি কি পিতৃদত্ত?'

'আজ্ঞে না; এই প্রাণটুকু ভিন্ন কিছুই পিতৃদত্ত নয়।' কিলাতের শ্লেষপূর্ণ মন্তব্যে কৌতুহল বোধ করেন পুষ্পকেতু; সেকথা বুঝে নিজ মন্তব্য ব্যাখ্যা করে সে। জন্মের কিছু কাল পরে, তার বিকৃত আকার সংসারে অভিশাপ ডেকে আনবে এই আশঙ্কায় নদী সংলগ্ন এক বটবৃক্ষের তলায় তাকে ফেলে রেখে যায় পরিবারের লোকজন; হয়তো নদীবক্ষে ভাসিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু শেষ মূহুর্তের দুর্বলতায় তা সম্ভব হয়নি। বন্দরের একটি গণিকালয়ের বৃদ্ধ রক্ষী প্রাতঃস্নান করতে গিয়ে তাকে আবিষ্কার করে, অসহায় শিশুকে ফেলে যেতে মায়া হওয়ায় সে নিয়ে যায় নিজকক্ষে। এরপর সেই গণিকালয়েই মানুষ হয়েছে কিলাত, খর্ব চেহারার কারণে উপহাস করেই তার এই নাম রাখে সুরসিকা গণিকার দল। উপহাসময় জীবনে, হাস্যরসকে জীবিকা করে নিতে কেটে গিয়েছিল অনেকগুলি বছর। এখন এই শুণ্ডালয়ে চাকুরীর দৌলতে সে সকলের প্রিয়পাত্র; এক রোমক নটের কাছ থেকে বিচিত্র নটখেলা শিখে তার জনপ্রিয়তা ও সঙ্গতি দুইই বেড়েছে।

'রুদ্রষেণের সাথে কিরূপ সম্পর্ক ছিল তোমার?'

'উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাথে নগন্য কৃপাভোগীর যেরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিৎ, তার অধিক কিছু নয়', মৃদু হেসে জবাব দেয় কিলাত।

'তোমার প্রতি বিরূপ হবার কারণ ঘটেছিল কি কিছু?'

'এই বিকৃত আকারই তো বিরূপতার পক্ষে যথেষ্ট প্রভু, এর অধিক কিছু ঘটে নি; তবে কাল সন্ধ্যায় পতনকালে তাঁর পৃষ্ঠ অবলম্বন করেছিলাম, এই অপরাধও তো সামান্য নয়।'

'কালকের দুর্ঘটনায় জয়কেশীর আচরণকে সমর্থন কর তুমি?'

'না করিনা; অন্যায়ের প্রতিবাদের অছিলায় প্রাণনাশ সমর্থনযোগ্য নয়।'

'তোমার ধারণা এই প্রাণনাশ নিছক দুর্ঘটনা নয়?'

'দুর্ঘটনা অবশ্যই, তবে উগ্রব্যক্তিকে অহেতুক উত্তেজিত করা সঙ্গত নয়।'এই উত্তরে কপালে চিন্তার ভাঁজ গভীর হয় কুমারের। আপাতত প্রশ্নপর্ব শেষ করে ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণে মনযোগী হন তিনি, এব্যাপারে

সহযোগিতা করে একজন প্রহরী। বিগত রাত্রি থেকেই বন্দর আধিকারিক কক্ষটিকে অর্গলবদ্ধ রেখেছিলেন পরবর্তী অনুসন্ধানে সূত্র নির্ধারণের প্রয়োজনে।

পানকক্ষটির মাঝখানে কতগুলি পীঠিকা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, উল্টে পড়ে আছে সুরাদান; ভূমিতে একটি অংশে শুকনো রক্তের দাগ বিগত সন্ধ্যার বিভৎস্যতার সাক্ষ্য বহন করছে, আর তার পাশেই পড়ে আছে শুকনো ফুলের মালা অকরুণ পরিহাসে। মাথার উপরে কড়িকাঠ থেকে স্থানে স্থানে ঝুলছে কয়েকটি মজবুত নারিকেল রজ্জু; যে পীঠিকাটিতে রুদ্রষেণ বসেছিলেন সেটির উপরে লম্বমান একখানি রজ্জু, এই রশিটি ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে নীচে পড়েছিল কিলাত সন্দেহ থাকেনা। পীঠিকাটির উপর তখনও রয়েছে একখানি অর্দ্ধপূর্ন সুরাপাত্র, কি মনে হতে সেটি সঙ্গে নেবার নির্দেশ দেন পুষ্পকেতু। চারপাশের পরিবেশ একবার বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করে কক্ষত্যাগের জন্য অগ্রসর হতে, কিছু একটা চামড়ার পাদুকায় বিদ্ধ হয়েছে, অনুভব করেন কুমার। পাদুকার তলা থেকে বস্তুটি বের করে হাতে নিয়ে দেখেন, একটি ক্ষুদ্র অথচ তীক্ষ্ণ ধাতববস্তুর ভগ্নাংশ, দেখে পরিচয় অনুমান করা কঠিন, সেটিকেও সঙ্গে নেন তিনি কি মনে করে।

পরবর্তী আদেশ না মেলা অবধি, বণিককে শুণ্ডালয়েই প্রহরাধীন রাখার নির্দেশ দিয়ে কার্যালয়ে ফেরেন কুমার। সেখানে চিত্রকের সাথে দেখা করে সংগৃহীত বস্তুগুলি তাঁকে পরীক্ষা করার অনুরোধ করেন পুষ্পকেতু।

'আপনি কি সন্দেহ করেন ছুরিকাতে বিষ ছিল না?' চিত্রককে বিস্মিত দেখায়।

'ছুরিকাতেই বিষ ছিল আপনি নিশ্চিত কি ভদ্র?'

'না সেভাবে কিছু বলা কঠিন, তবে বিষক্রীয়ায় মৃত্যু ঘটেছে, এব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ঘাড় শক্ত, হাত পায়ের পেশীতে প্রবল টান, সময়ের বহুপূর্বেই মৃতদেহে কাঠিন্য এসেছে, এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে পচনের পূর্বাভাস। আমার ধারণা বিষতিন্দুর প্রভাবে মৃত্যু ঘটেছে রুদ্রষেণের। তবে মৃতের কাঁধে ও গলায় আঁচড়ের চিহ্ন আছে, মল্লযুদ্ধ চলাকালীন এই ক্ষত ঘটেছে সম্ভবত, এই ক্ষতস্থান দিয়েও বিষ ঢুকে থাকতে পারে।'

'বিষতিন্দু, মানে কিচিলা ফলের বীজ? কিন্তু এই বিষ তো সহজলভ্য নয়! গুপ্তহত্যায় এ বস্তু ব্যবহার হয়ে থাকে জানি। তার অর্থ এই যে, ঝোঁকের মাথায় নয় পূর্বপরিকল্পিত এই হত্যা।' চিন্তিত দেখায় পুষ্পকেতুকে। 'আপনি পাত্রের সুরায় বিষ আছে কিনা পরীক্ষা করান ভদ্র।'

'বেশ, পরীক্ষা করে দেখব; তবে সুরাপানের মাধ্যমে বিষ শরীরে গেলে মৃত্যু এত তাড়াতাড়ি হোত না আর্য। বিষের লক্ষ্মণ পরিস্ফুট হোত মৃত্যুর বেশ কিছু আগে থেকেই।'

'জয়কেশীর ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তে এসেছ কি কেতু?' বিশাখগুপ্ত প্রশ্ন করেন; চিত্রকের সাথে আলোচনার পর পিতাকে অনুসন্ধান বিষয়ে অবহিত করতে তাঁর কার্যালয়ে উপস্থিত হয়েছেন কুমার।

'পারিপার্শ্বিক প্রমাণ ও সাক্ষীদের বয়ান জয়কেশীকেই অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে; ভদ্র চিত্রকও নিশ্চিত যে মৃত্যু বিষক্রীয়া থেকেই ঘটেছে।'

'তবে তাকে বন্দী করতে বাধা কোথায়? তোমার মনে কি সংশয় আছে কোনও?'

'পূর্বপরিকল্পিত হত্যার পিছনে যথেষ্ট কারণ থাকা চাই, এক্ষেত্রে জয়কেশীর স্বার্থ সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়োজন; বিদেশী বণিককে সন্দেহের বশে নির্যাতন করা অনুচিত বলে মনে করি পিতা।'

'কিন্তু অনন্তকাল তাকে শুণ্ডালয়ে পাহারায় রাখা চলেনা, আবার মুক্তি দিলে পাটলীপুত্র ছেড়ে পলায়নের আশঙ্কা। আমার মতে তাকে কারারূদ্ধ করা দরকার, তবে বন্দীশালায় সুখ সুবিধার যাতে ক্রটি না হয় সে বিষয়ে নির্দেশ দেব কারা প্রতিহারিকে।'

জয়কেশীকে কারারূদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে আলোচনা শেষ করেন বিশাখগুপ্ত।

***

‘আমার প্রতি এরূপ অত্যাচারের অর্থ কি কেতু?’ ব্যস্তপায়ে কুমারের শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন উল্মুক, বাল্যবন্ধুর প্রতি অভিযোগ আনলেও তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস।

‘তোমাকে অত্যাচার করছি আমি? এতদিন তো জানতাম কেবল চম্পাবতীরই সে ক্ষমতা আছে’, কপট বিস্ময়ে অনুযোগের উত্তর দেন কেতু। উল্মুকের সদ্যবিবাহিতা পত্নী চম্পাবতীকেই রসিকতার অস্ত্র করেন তিনি।

‘ওসব বললে শুনছি না; শুণ্ডালয়ের ঘটনা শীঘ্র খুলে বল।’ অতএব হত্যারহস্যের সকল কথা বিস্তারিত জানাতেই হয় মিত্রকে।

‘এক্ষেত্রে সমস্যাটা কোথায়? জয়কেশী যে হত্যাকারী সেকথা পরিষ্কার’, উল্মুক মতামত দেন।

‘হত্যা সেই করেছে, তা সুনিশ্চিত প্রায়, কিন্তু কেন একাজ করল গোলমাল সেখানেই।’

‘আরে, এত বোঝ আর এটা বুঝলে না? মহল্লিকা! মহল্লিকাকে সে স্নেহ করে, তার এই অপমান মেনে নিতে পারেনি তাই।’

‘জয়কেশী কি পূর্ব থেকে জানত যে রুদ্রষেণ মহল্লিকাকে অপমান করবে? নাকি বিষাক্ত ছুরিকা সাথে নিয়ে ঘোরা তার ব্যাসন?’

‘বিদেশী বণিক, আত্মরক্ষার্থে বিষাক্ত ছুরিকা রাখে হয়তো; গুপ্তচর নয়তো?’

‘ভৃগুকচ্ছ ক্ষত্রপ রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র, সেদেশের রাজপরিবার শকবংশীয়, মগধের মিত্রশক্তি নয়। গুপ্তচরবৃত্তির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায়না। কিন্তু, রুদ্রষেণকে হত্যা করবে কেন? তবে কি তিনি জয়কেশীর সত্য পরিচয় জেনে ফেলেছিলেন? সন্ধান করতে হবে এবিষয়ে।’ পুষ্পকেতু মন্তব্য করেন।

‘তাহলেই বল, সমস্যার সমাধান করে দিলাম কেমন?’

‘বুদ্ধি তোমার দিনে দিনে চন্দ্রকলার মত বৃদ্ধি পাচ্ছে; এ কি তবে পুস্তপালের দপ্তরে হিসাবচর্চার গুণ?’

‘হিসাবচর্চা নয়, হৃদয়চর্চার গুণ; তবে তুমি সেসব বুঝবে না’, পুষ্পকেতুকে তাঁর বিবাহ বিমুখতার প্রতি ইঙ্গিত করে খোঁচা দেন উল্মুক।

‘কাল প্রাতে ভীমদেব ও শ্রেষ্ঠীযুগলের সাথে সাক্ষাৎ করব, সংবাদ পাঠিয়েছি।’

‘আমাকে সঙ্গী করবে আশা করি?’

‘অবশ্য! পুস্তপালের চেয়ে তোমার উপর আমার দাবী কি কিছু কম?’ হেসে ওঠেন দুজনেই।

***

বন্দরসংলগ্ন পান্থশালাটির কৌলিন্য বোঝা যায় ভবনের স্থাপত্যশৈলী দেখে; উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা মধ্যম আকারের গৃহটির কারুকার্যমণ্ডিত থাম ও দরজা-জানালার সুদৃশ্য খিলানে সুক্ষ রুচির পরিচয়। প্রাচীরদ্বারের ভিতরে সযত্নে লালিত পুষ্পবিতান, গৃহের পিছনদিকে পরিচ্ছন্ন অশ্বশালা, সবকিছুতেই দক্ষ ব্যবস্থাপনার ছাপ সুস্পষ্ট। ভবনটির পূর্বপ্রান্তের মহলটিতে সপারিষদ বাস করছেন ভীমদেব, এই অংশটি স্বয়ংসম্পূর্ন ও ভবনের বাকী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন। পুষ্পকেতু ও উল্মুক উপস্থিত হলে ভীমদেবের এক অনুচর তাঁদের একটি বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে যায়; শীতল তক্র, মিষ্টান্ন, আপ্যায়নের বন্দোবস্ত রীতিমত রাজকীয়, মনে মনে স্বীকার করেন দুই মিত্র। অপেক্ষায় কেটে যায় বেশ কিছু সময়, কিন্তু রাজপুরুষের দেখা মেলেনা। ‘প্রভুর নিদ্রাভঙ্গে বিলম্ব ঘটে, আপনারা একটু ধৈর্য্য ধরুন আর্য’, অনুচর সবিনয়ে জানায়। ‘শ্যালক মহাশয় বোধকরি অধিক রাত্রি অবধি রাজকার্য করে পরিশ্রান্ত’ উল্মুক মৃদুস্বরে মন্তব্য করেন, কুমার বিরক্তি ভুলে হেসে ওঠেন তাঁর মন্তব্যে।

প্রায় একদণ্ডকাল পরে কক্ষে প্রবেশ করেন ভীমদেব, সময়ের পূর্বে নিদ্রাভঙ্গের রেশ স্পষ্ট তাঁর চোখেমুখে। তিনি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, পোশাক আশাকে অতি সৌখিন, চেহারাটি দুগ্ধ-ঘৃতের প্রভাবে সুডৌল; এক প্রকার

উগ্র দাম্ভিকতা দিয়ে ব্যক্তিত্বের অভাবকে ঢেকে রাখার চেষ্টা তাঁর আচরণে। প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময় শেষে শুরু হয় সাক্ষাৎকার পর্ব।

'আপনি মাননীয় রাজপুরুষ, যৌধেয়রাজ কিপুনদের শ্যালক; মগধাধীশের আতিথ্য না নিয়ে বন্দরের এই পান্থশালায় উঠলেন কেন?' ভীমদেবকে প্রশ্ন করেন পুষ্পকেতু।

'রাজকার্যে আসিনি, রাজ আতিথ্য নেব কেন?'

'কি কার্যে এসেছেন তবে?'

'দেশভ্রমণ, অবসরযাপন।'

'এখান থেকে কোথায় যাবার ইচ্ছা রাখেন?'

'ভেবে দেখিনি এখনও, এই জায়গাটি বেশ সরেশ, হয়তো আর কোথাও না যেতেও পারি।'

'দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল আর্য। সেদিন সন্ধ্যায় রুদ্রষেণের আশেপাশে কারা ছিলেন, বলতে পারেন কিছু?'

'সে আমি কি করে বলব? আমি তো খেলা দেখায় মত্ত ছিলাম, কিলাত পড়ে গিয়ে সব মাটি করল যদিও।'

'আপনার কি মনে হয়, রুদ্রষেণের ব্যবহার অন্যায্য ছিল কিলাত ও মহল্লিকার প্রতি?'

'কিলাত তো একটা ভাঁড়, তাকে বিরক্ত হয়ে প্রহার করে থাকলে সে কিছু নয়। তবে সুন্দরী নারী, হোক না গণিকা, তাকে নির্যাতন করা অত্যন্ত অন্যায় আচরণ।'

'সেক্ষেত্রে জয়কেশীর প্রতিক্রিয়া আপনি সমর্থন করেন?'

'হ্যাঁ করি, তবে ঐ হুঙ্কার অবধিই ঠিক ছিল; রুদ্রষেণ যে অমন ছুরিকা নিয়ে চড়াও হবে সেটা বেচারী বোঝেননি সম্ভবত।'

'রুদ্রষেণ ও জয়কেশীর সাথে আপনার পরিচয় হয়েছিল কি আর্য?'

'রুদ্রষেণের নামটিও তো জানলাম তার মৃত্যুর পশ্চাতে, তবে জয়কেশীর সাথে দু একদিন অক্ষক্রীড়ার সৌভাগ্য ঘটেছে; পটু খেলয়াড়, তবে বড্ড হিসেবী, খেলে আমোদ হয় না।'

'মহল্লিকা সম্পর্কে আপনার মত কি?'

'মন্দ নয়', মন্তব্যের সাথে যে হাসিটি তাঁর ঠোঁটে উঁকি দিল তাকে আর যাই হোক ভদ্রোচিত বলা চলে না। এরপর ভীমদেবের কাছে বিদায় নিয়ে দুই বন্ধু পথে নামেন; ভদ্রিলের বন্দরসংলগ্ন ভাণ্ডার তাঁদের লক্ষ্যস্থান।

'কিলাতকে প্রহার করা চলে, তবে সুন্দরী নারীর প্রতি দুর্ব্যবহার অসঙ্গত। ভীমদেবের ন্যায় অন্যায় বোধ অসাধারণ!' উল্মুক মন্তব্য করেন।

'মিত্রদেশ যৌধেয়রাজের শ্যালক, তবু এরূপ অজ্ঞাতপরিচয়ে জীবনযাপন; রাজ আতিথ্য না নিলেও, অন্তত নগরীর বিশিষ্টজনেদের সাথে তো যোগাযোগ স্থাপন করবেন? কিছু গোলমাল আছে এর মাঝে।' পুষ্পকেতু নিজের দ্বিধার কথা জানান মিত্রকে।

'মিথ্যা পরিচয়ে সুবিধা ভোগের চেষ্টা হয়তো। বিদেশী রাজপুরুষ জানালে বিশেষ আপ্যায়ন পাওয়া যায়; রুদ্রষেণ হত হয়ে গোলমাল বাধবে তা কি আর জানা ছিল?'

'সে সম্ভবনা উড়িয়ে দেওয়া চলেনা, সেক্ষেত্রে শ্রীমানের সত্য পরিচয় জানা প্রয়োজন।'

অল্পসময়েই ভদ্রিলের ভাণ্ডারগৃহ এসে পড়ে, অশ্বশকট থেকে নামতেই শ্রেষ্ঠীর ভৃত্য আপ্যায়নে এগিয়ে আসে। ভাণ্ডারের একটি বহির্কক্ষে ভদ্রিল আগে থেকেই কুমারের আসার অপেক্ষায় ছিলেন। মধ্যবয়স্ক সদাশয় মানুষটি ব্যস্ত হয়ে পড়েন আন্তরিক আতিথেয়তায়। তিনি জানান, শ্রেষ্ঠী সোমদত্তের ভাণ্ডারগৃহ নিকটেই, ভৃত্য গেছে তাঁকে সংবাদ দিতে। কিছুপরে তিনি ও এসে পড়বেন, কুমারকে কষ্ট করে যেতে হবে না তাঁর কাছে।

'সেদিন সন্ধ্যায়, রুদ্রষেনের নিকট কারা গিয়েছিল লক্ষ্য করেছিলেন কি ভদ্র?' পুষ্পকেতু জানতে চান।

'বারুণি শুরুতেই সুরা দিয়ে আপ্যায়ন করেছিল, সে যেমন করে থাকে বিশেষ অতিথিদের; তবে তাকে বাদ দিলে মহল্লিকা ছাড়া আর কাউকে তাঁর সাথে ঘনিষ্ট হতে দেখিনি।'

'আপনার পরিচয় ছিল আশা করি তাঁর সাথে?'

'আমি শ্রেষ্ঠী, শুল্কদপ্তরের আধিকারিককে চিনব না তাই কি হয়? তবে পরিচয় ছিলনা। কি থেকে কি হয়ে গেলো! রৈবত ভদ্রব্যক্তি, মাঝখানে পড়ে তার হয়রানিই সবচেয়ে বেশী।' আক্ষেপের সুরে মন্তব্য করেন ভদ্রিল, রুদ্রষেণের প্রতি যে তাঁর বিশেষ সহানুভুতি নেই বোঝা যায় সেকথা।

আলাপচারিতার মাঝে সোমদত্ত এসে পড়েন, তিনি বয়সে ভদ্রিলের তুলনায় কনিষ্ঠ; দুজনের সম্পর্কও বেশ অন্তরঙ্গ, মনে হয় ব্যবসায়িক লেনদেনও আছে নিজেদের মধ্যে। পুষ্পকেতুর প্রশ্নের উত্তরে সোমদত্ত জানান যে তিনি রুদ্রষেণের দিকে পিছন করে বসেছিলেন, সেকারণে কে বা কারা তাঁর নিকটে গিয়েছিল সেদিন, তিনি বলতে পারবেন না। তবে অন্যদিনের তুলনায় তাঁর আচরণ অধিক উগ্র ছিল; কোনও কারণে অত্যন্ত অস্থির ছিলেন আধিকারিক মহাশয়, তাঁর মুখচোখের ভাব ছিল বেশ অস্বাভাবিক। জয়কেশী সম্পর্কে দুজনেই জানান, তাঁকে সজ্জন বলেই মনে হয়েছে তাঁদের; ভীমদেব সম্পর্কে মন্তব্য এড়িয়ে যান তাঁরা, বিতর্ক এড়াতেই সম্ভবত।

***

কারাগৃহের অপ্রশস্ত কক্ষের এককোণে একটি আসনে অন্যমনস্ক ভাবে বসে আছেন জয়কেশী, সামনে রাখা থালিকায় কিছু ফল, মিষ্টান্ন ও যবমণ্ড। দেওয়ালের উপরভাগের জানালা দিয়ে সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে পাথরের মেঝেতে, সেই আলোকে বণিকের মুখ শীর্ণ ও চিন্তাক্লিষ্ট; খাদ্য অভুক্ত পড়ে থাকে।

'কেমন আছেন দেব?' একটি সুমিষ্ট স্বরের সম্বোধনে চমকে দ্বারের পানে চেয়ে দেখেন জয়কেশী; ছায়ান্ধকার প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থাকা নারীমূর্তির সাথে শুণ্ডালয়ের সুরসিকা সেবিকার মিল পাওয়া যায়না। মোটা সুতীর কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা, মুখ প্রসাধনহীন, দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে দৃঢ়তার ছাপ।

'তুমি এখানে কেন ভদ্রে? এই স্থান নারীর উপযুক্ত নয়', বিস্মিত দেখায় জয়কেশীকে।

'এই স্থানে আপনারও তো থাকার কথা নয় প্রভু; আজ আমার কারণেই আপনার এই পরিণতি!' গভীর হতাশায় কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে মহল্লিকার।

'আমার অদৃষ্ট আমারই, নিজেকে অকারণে দোষ দিও না।'

'কিন্তু আপনি যে বিষপ্রয়োগ করেননি, একথা আমার থেকে বেশী কেউ জানেনা; আজ সেকথাটিই আপনাকে জানাতে এলাম প্রভু।'

'আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস আছে জেনে সুখী হলাম, কিন্তু কতটুকু জানো তুমি আমার সম্পর্কে?'

'যা জানি, আমার কাছে সেটুকুই যথেষ্ট দেব। আমার মত হতভাগিনীর জন্য আপনি যা করেছেন, কয়জন করে? আপনি চিন্তা করবেন না, সত্যের জয় হবেই।'মহল্লিকার দুচোখ বেয়ে নেমে আসে নীরব অশ্রু, জয়কেশী স্তব্ধ হয়ে থাকেন গভীর আবেগে।

***

মহামন্ত্রী হরিষেণের সুরম্য প্রাসাদটি সকাল থেকেই কর্মব্যস্ত; গৃহস্বামী রাজসভার অতি বিশিষ্টব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় বিভাগের অথিকর্তা, সম্রাটের অতি নিকটের জন। তাঁর কাছে সাধারণ মানুষেরও অবারিত দ্বার, বিশেষ প্রয়োজনে দ্বারস্থ হন অনেকেই পরামর্শ লাভের আশায়। প্রাসাদের একটি অন্তরঙ্গ বিশ্রামকক্ষে পুষ্পকেতু ও হরিষেণ বিশেষ আলোচনায় বসেছেন আজ, কুমারকে পত্র পাঠিয়ে ডেকে এনেছেন তিনি।

'তোমাকে এভাবে ডেকে পাঠাতে হল, পরিস্থিতি কিছু গম্ভীর বৎস্য।'

'আপনি না ডাকলে আমি নিজেই আসতাম দেব, আমারও কিছু আলোচনা ছিল আপনার সাথে।'

'বেশ, আগে আমার বক্তব্য তোমাকে জানাই, সব কথা জানলে তোমারও সুবিধা হবে বলেই আমার বিশ্বাস।' এরপর হরিষেণ যে বিবরণ দেন তা এই প্রকার,-

প্রায় চারমাস আগে বন্দরে দুই পেটি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র আসে, কিন্তু তারপর আর শুল্ক প্রদান করে সে সামগ্রী ছাড়াতে আসেনা কেউ; এক পশ্চিমা বণিকের পণ্য ছিল এগুলি। বাধ্য হয়ে বন্দরের পান্থশালাগুলিতে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায়, কয়েকদিন পূর্বেই শ্রেষ্ঠী একদিন মধ্যরাত্রে তড়িঘড়ি পান্থশালা ত্যাগ করেছেন, সেইসাথে সম্ভবত পাটলীপুত্রও। এরূপ ব্যবহারের অর্থ পাওয়া যায়না, সামগ্রী রাখা থাকে সরকারী ভাণ্ডারে। এরপর কেটে যায় আরো দুই মাস, কিন্তু আবারও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে, এক বিদেশী বণিক তাঁর মশলা সম্ভার বন্দরে ছেড়ে রেখে অদৃশ্য হন আচমকা। শুল্ক দপ্তর থেকে এই নিয়ে খোঁজ শুরু হয়, ইতিমধ্যে এক স্থানীয় স্বর্ণব্যাবসায়ী চন্দ্রদত্ত নিজে শুল্ক দপ্তরে এসে জানান যে এক মালব দেশীয় শ্রেষ্ঠী তাঁর কাছে কিছু গহনার ক্রয়চুক্তি করে আর আসেননি; শ্রেষ্ঠীর খোঁজে পান্থশালায় গিয়ে তিনি শোনেন শ্রেষ্ঠী নিরুদ্দেশ হয়েছেন। এতগুলি নিরুদ্দেশের ঘটনা অস্বস্তিকর, যদিও আইনভঙ্গ হয়নি কিছু, কিন্তু এবিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করে হরিষেণ স্বয়ং রুদ্রষেণকে সেই কাজে যুক্ত করেন। রুদ্রষেণ পুরাতন আধিকারিক ও বিচক্ষণ, সবদিক দিয়ে এই গোপন তদন্তের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনদিন পূর্বে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে মহামন্ত্রী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। এরপর, পুষ্পকেতু হত্যারহস্যের অনুসন্ধান করছেন জানতে পেরে এবিষয়ে তাঁকে সকল কথা জানানো কর্তব্য মনে হয়, সেকারনেই আজকের এই আলোচনা পর্ব।

পুষ্পকেতু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন সব কথা শুনে, তাঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ গভীর হয়, রহস্য নিঃসন্দেহে আরও জটিল আকার ধারণ করেছে এই নতুন তথ্য পেয়ে। হরিষেণ নিরুদ্দিষ্ট বণিক ও তাদের পান্থশালার একটি তালিকা তৈরী করিয়ে রেখেছিলেন আগে থেকে, এখন সেটি তিনি কুমারকে দেন।

'তোমারও কিছু বক্তব্য ছিল বলছিলে?' হরিষেণ আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হন।

হত্যার ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন পুষ্পকেতু, আর তারপর জানান কি বিষয়ে সাহায্য চান। 'এই হত্যার সাথে যুক্ত দুজন বিদেশীর সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন, সে ব্যাপারেই আপনার সাহায্য পেতে চাই দেব। প্রথমজন, জয়কেশী, সে ক্ষত্রপ দেশীয় বণিক, ভৃগুকচ্ছে বাস, বিগত একমাস কাল এখানে রয়েছে ব্যবসায়িক কারণে। আমাদের সন্দেহ বিষাক্ত ছুরিকা দিয়ে পরিকল্পনা করেই হত্যাটি ঘটিয়েছে সে, অথচ রুদ্রষেণের সাথে আপাতভাবে কোনও বৈরিতা ছিলনা তার।

অন্যজন ভীমদেব, তিনি নিজেকে যৌধেয়রাজ কিপুনদদেবের শ্যালক বলে পরিচয় দিয়েছেন, অথচ বন্দর সংলগ্ন একটি পান্থশালায় অজ্ঞাতপরিচয়ের মত জীবনযাপন করছেন। রাজপুরুষের এরূপ আচরণ অত্যন্ত সন্দেহজনক, এঁর পরিচয় সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।'

'আমি যতশীঘ্র সম্ভব সংবাদ সংগ্রহ করে জানাবো; তবে সুরাপাত্রে বিষপ্রয়োগের সম্ভাবনা কি একেবারেই নেই?'

'ভদ্র চিত্রক ইতরপ্রাণীর উপর প্রয়োগ করেছেন পাত্রের অবশিষ্ট সুরা, তাতে বিষ ছিলনা দেব।'

আলোচনা শেষে বিদায় নেন পুষ্পকেতু, কার্যালয়ে দুজন আধিকারিক তাঁর অপেক্ষায় আছেন, এঁরা ঘটনাকালে উপস্থিত সকলের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের কাজে যুক্ত।

***

প্রাথমিক অভিভাদন শেষে বরিষ্ঠ আধিকারিক ধর্মদাস সংগৃহীত তথ্যের বিবরণ দেন পুষ্পকেতুকে। জয়কেশীর যাতায়াত ছিল মহল্লিকার গৃহে, তবে রুদ্রষেণকে সে ব্যক্তিগতভাবে চিনত এমন কোনও সংবাদ

পাওয়া যায়নি। ভদ্রিল ও সোমদত্তের সাথে জয়কেশীর কোনও ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল না, যদিও এঁরা একে অপরকে চিনতেন। ভীমদেবের পরিচিত মহল মূলতঃ গণিকাপল্লী ও শুণ্ডালয়গুলিতেই সীমাবদ্ধ, জয়কেশীর সাথে তারও কোনও যোগাযোগের সংবাদ মেলেনি। গত একমাস যাবৎ রুদ্রষেন বন্দরের বিভিন্ন পান্থশালা ও গণিকাপল্লীতে যাতায়াত করতেন, তবে তিনি দিবাকালেই যেতেন সেইসব স্থানে। দুর্ঘটনার দিন রুদ্রষেন বন্দর সংলগ্ন কার্যালয়ে বেশ কিছু সময় কাটান, এছাড়া সেদিন স্বর্ণবণিক চন্দ্রদত্তের কর্মশালাতেও গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কোথাও এমন কিছু ঘটেনি যা থেকে তাঁর সন্ধ্যাকালের রূঢ় ব্যবহারের কোনও সদুত্তর মেলে।

সবশেষে আসে মহল্লিকার কথা, তার সম্পর্কে ধর্মদাস যা জানান সে বড় চমকপ্রদ। মহল্লিকার স্বামী অরুণি নগরীর এক বর্ধিষ্ণু গৃহে অশ্বপালের কর্ম করত, গৃহস্বামীর অশ্বপ্রীতির কথা সর্বজনবিদিত, চারখানি উৎকৃষ্ট অশ্ব ছিল তাঁর সংগ্রহে। অরুণি প্রভুগৃহেই রাত্রিবাস করত, মাঝে মাঝে নিজগৃহে যেত ছুটি নিয়ে, শাল্মলি গ্রামে তার বসত ভিটা; মহল্লিকা তখন শ্বশুরগৃহেই থাকত বাকি পরিবারের সাথে। চার বছর আগে একদিন রাতে অশ্বশালায় আগুন লাগে, ছোটাছুটি গোলমালের মাঝে অরুণি অশ্বশালে ঢোকে পশুদের বাঁধনমুক্ত করতে; অশ্বগুলি মুক্তি পেলেও অরুণি আর বের হতে পারেনি অগ্নিবলয় থেকে, সেখানেই তার মৃত্যু হয়। সেসময়ে লোকমুখে একটি গুঞ্জন শোনা যায় যে গৃহস্বামী একরকম জোর করেই অরুণিকে বাধ্য করেছিলেন জ্বলন্ত অশ্বশালায় প্রবেশ করতে। সেই গৃহস্বামী ছিলেন আধিকারিক রুদ্রষেণ।

'মহল্লিকাও কি জানত তার স্বামীর মৃত্যুতে রুদ্রষেনের ভুমিকার কথা?' পুষ্পকেতু প্রশ্ন করেন ধর্মদাসকে।

'সেকথা বলা শক্ত, তবে রুদ্রষেণ অরুনির পিতাকে কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন; ফলে তার পরিবার কোনও ক্ষোভ প্রকাশ করেনি।'

সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠছে ভদ্র, আপনাকে আরো কিছু অনুসন্ধান কার্যের ভার দিতে চাই।' পুষ্পকেতু হরিষেণের কাছ থেকে পাওয়া নিরুদ্দিষ্ট বণিক ও তাঁদের পান্থশালার তালিকাটি ধর্মদাসকে দেখিয়ে, বিশদ বিবরণ দেন।

***

'এ তো রীতিমত রোমহর্ষক ব্যাপার; রুদ্রষেণ ব্যক্তিটি পৃথিবীসুদ্ধ লোককে ক্ষেপিয়ে রেখেছিল দেখছি।' উল্মুক বন্ধুর কাছে সব কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

'সমস্যা সেখানেই, হত্যা করার যথেষ্ট কারণ হয়তো অনেকেরই ছিল, কেবল যাকে বন্দী করা হয়েছে তার উদ্দেশ্যই তেমন সবল নয়। তাছাড়া হত্যার ইচ্ছে থাকলেও তা কার্যকরী করার স্নায়ু বেশীরভাগ মানুষেরই থাকে না।'

'যাক, এটাই স্বান্তনা; নাহলে পুস্তপালের দপ্তরে কলম পিষ্টন করে আমারই কেমন হত্যাবৃত্তি প্রবল হচ্ছে ক্রমে ক্রমে।' উল্মুক গুরুতর আলোচনার মাঝেও গম্ভীর থাকতে পারেননা বেশীক্ষণ। হাস্যালাপে পরিবেশ হালকা হয়ে আসে, কিন্তু দীর্ঘকাল বজায় থাকে না এই পরিস্থিতি। গৃহসেবক এসে সংবাদ দেয়, কার্যালয় থেকে জরুরি আহ্বান এসেছে, কুমারের উপস্থিতি সেখানে একান্তভাবে কাম্য। অতঃপর দুই মিত্র ব্যস্ত হয়ে কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।

***

'মহল্লিকা আপনার সাক্ষাতের আশায় বসে আছে বহুক্ষণ, দেখা না করে যাবে না সে কিছুতেই', কার্যালয়ে পৌঁছতে এক কর্মচারী এসে সংবাদ দেয় পুষ্পকেতুকে।

‘আমার সাথে কি এমন প্রয়োজন তোমার, যা অন্যকে বলা চলেনা?’ প্রতীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করে প্রশ্ন করেন কুমার মহল্লিকার উদ্দেশ্যে।

জড়োসড়ো হয়ে কক্ষের এককোনে বসে থাকা নারীমূর্তি সচকিত হয় এই সম্ভাষনে; তার শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে চমকে ওঠেন পুষ্পকেতু। এই কয়েকদিনেই যেন কত বদলে গেছে শুণ্ডালয়ের রসময়ী পরিবেষিকা! ঝড়ের প্রকোপে বাস্তুহারা পাখীর মতই অসহায় তার মুখচোখ।

‘যা বলার নির্ভয়ে বল ভদ্রে’, সহানুভুতি ঝরে পড়ে কুমারের কণ্ঠস্বরে।

‘আপনার কাছে আজ নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করতে এসেছি আর্য’ মহল্লিকা রূদ্ধস্বরে বলে ওঠে।

‘কিসের অপরাধ?’ বিস্মিত হন কুমার।

‘ভদ্র রুদ্রষেণকে হত্যার অপরাধ।’

‘কি বলছ তুমি? হত্যা করেছ, একথা আগে বলোনি, হঠাৎ আজ বলতে এলে কেন?’

‘আমার কারণে একজন নিরপরাধী শাস্তি পাবেন, এ কথা ভেবে শান্তি ছিল না মনে, আপনি আমাকে বন্দী করুন প্রভু!’

‘ও! জয়কেশীর বন্দীদশা ঘোচাতে তোমার এই নতুন কাহিনী?’

‘কাহিনী নয় দেব, এ সত্যি!’

‘বেশ, হত্যা করলে কিভাবে?’

‘বিষ প্রয়োগ করেছিলাম।’

‘বিষপ্রয়োগে মৃত্যু ঘটেছে, একথা সকলেই জানে, কি ভাবে প্রয়োগ করলে জানতে চাই আমি। সুরাপাত্রে মিশিয়েছিলে?’

‘আপনি সুরা পরীক্ষা করিয়েছেন নিশ্চয়, পেয়েছেন কিছু?’ এক বিচিত্র হাসি খেলে যায় মহল্লিকার ঠোঁটে। ‘আমার এই অঙ্গুরীয়ের তীক্ষ্ণধারে বিষ মিশিয়ে আধিকারিকের স্কন্ধে আঘাত করেছিলাম।’ মহল্লিকা তার বামহস্তের অনামিকায় পরিহিত গহনাটি খুলে পুষ্পকেতুর দিকে তুলে ধরে, অঙ্গুরীয়ের উপরিভাগ ফুলের আকৃতি, আর তার পাঁপড়িগুলি সরু ও তীক্ষ্ণ; ইচ্ছা থাকলে এ দিয়ে কাউকে নখরাঘাত করা অসম্ভব নয়।

‘কি বিষ ব্যবহার করেছিলে?’

‘কিচিলার বীজ’, মহল্লিকার দৃঢ় উত্তরে কিছু মূহুর্তের জন্য স্তব্ধতা নেমে আসে কক্ষমধ্যে। অবশেষে কুমার প্রশ্নপর্ব শুরু করেন আবার।

‘এ বিষ তুমি পেলে কোথায়? আড়ঙ্গে মেলেনা এ বস্তু, জনবসতিতে ফলেনা এই বিরল উদ্ভিদ।’

‘আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অপারগ, ক্ষমা করবেন দেব।’

‘এবিষয়ে কি বলতে হবে, জয়কেশী প্রশিক্ষন দেন নি বোধকরি? কারাগারে তার কাছে গিয়েছিলে তুমি অস্বীকার করতে পারো সেকথা?’ পুষ্পকেতুর বিদ্রূপবাক্য কশাঘাতের মত নেমে আসে।

‘শ্রেষ্ঠীকে এর মধ্যে জড়িত করবেন না আর্য, দয়া করুন!’

‘তোমার এই প্রহসন ক্ষমার অযোগ্য, এখুনি এ স্থান ত্যাগ কর ভদ্রে।’

‘বেশ তবে শুনুন, কিলাতের সংগ্রহ থেকে চুরি করেছিলাম কিচিলা বীজচূর্ণ গোপনে।’

‘কিলাত! কিলাতের কাছে বিষতিন্দু থাকে কি কারণে?’

‘কিলাত নেশাসক্ত ব্যক্তি, গঞ্জিকায় আসক্ত সে। মাঝে মধ্যে কোনও কোনও অতিথিকেও গঞ্জিকা সরবরাহ করে সে গোপনে, আমি জানতাম সেকথা। প্রভু রৈবতও জ্ঞাত আছেন এ বিষয়ে, তবে ব্যবসায়ের খাতিরে নির্লিপ্ত থাকেন তিনি। একদিন তার বায়বীয় খেলা শুরুর আগে একটি ক্ষুদ্র রৌপ্য কোষ থেকে সূচাগ্র পরিমান চূর্ণ সেবন করতে দেখে কৌতুহলী হই। প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে কিলাত জানায় এ কিচিলা বীজচূর্ন, মারাত্মক বিষ; তবে সূচাগ্র পরিমান সেবনে স্নায়ূ সতেজ হয়, মারণ খেলার পূর্বে তাকে সাহস যোগায় এ বস্তু।’

‘রুদ্রষেণকে হত্যা করলে কি কারণে?’

‘আজ তাঁর কারণেই এই শুণ্ডালয় ঠিকানা হয়েছে আমার, কেউ বলে দাসী, কেউ গণিকা। এতকাল পরে আধিকারিককে পানশালায় আসতে দেখে ক্রমে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে মনে; তিনি তো আমায় চিনতেন না, কাজ সহজ হয়েছিল তাই।’ মহল্লিকার পাণ্ডুর মুখে হাসির ঝলক যেন কান্নারই নামান্তর।

‘অঙ্গুরীয়টি রেখে তুমি এখন গৃহে যাও ভদ্রে, আমার অনুমতি ভিন্ন স্থান ত্যাগ করার চেষ্টা কোরনা।’

‘গৃহে যাব? বন্দী করবেন না আমায়?’

‘আপাততঃ গৃহেই বন্দী থাকো, এই আমার ইচ্ছা।’ মহল্লিকা সসংকোচে কক্ষ থেকে প্রস্থান করে, তার চোখেমুখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর।

‘যেতে দিলে ওকে? যদি পলায়ন করে?’ উল্মুক এতক্ষণ নীরবে প্রত্যক্ষ করছিলেন পরিস্থিতি, এখন মিত্রের সিদ্ধান্তে উদ্বিগ্ন বোধ করেন।

‘জয়কেশী যতক্ষণ কারাবন্দী, মহল্লিকা কোথাও যাবে না।’

‘তুমি কি মহল্লিকার স্বীকারোক্তি বিশ্বাস করোনি তবে?’

‘অবিশ্বাসও করিনি, তবে জয়কেশী তার সাথে যুক্ত ছিল কিনা সেটা দেখা দরকার; এখন একবার কিলাতের সাথে কথা বলতে হবে।’ এরপর কিলাতকে কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে আসে প্রহরী, তার সাথে শুরু হয় বাক্যালাপ।

‘তুমি গঞ্জিকা সেবন কর?’

‘বন্দর চত্বরে অল্পবিস্তর সকলেই সেবন করে প্রভু, আমিও ব্যতিক্রম নই’, কিলাত সবিনয়ে মেনে নেয়।

‘আর বিষতিন্দু সেও সকলেই সঙ্গে রাখে বুঝি?’ মুহূর্তে সচকিত হয় কিলাত, এরূপ প্রশ্ন সে একেবারেই আশা করেনি, স্পষ্ট হয় সেকথা।

‘আপনার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছি না দেব।’

‘বেশ, স্পষ্ট করেই বলছি তবে, তোমার সংগ্রহে বিষতিন্দু আছে একথা জানতে পেরেছি সম্প্রতি। তুমি জানো বোধহয় রুদ্রষেনের মৃত্যু ঘটেছে বিষপ্রয়োগে, আর তা বিষতিন্দু।’

‘ওঃ, এতক্ষণে বুঝলাম। বিদেশী বণিক সম্মানিত ব্যক্তি, তাকে শাস্তি দেওয়া সহজ নয়; এই বিকৃতদেহ বামনকে হত্যাকারী সাব্যস্ত করতে পারলে সবদিক রক্ষা পায়’, বিদ্রূপ ফুটে ওঠে কিলাতের প্রত্যুত্তরে।

‘এই অভিযোগ এনে স্বয়ং সম্রাটকে অবমাননা করেছ তুমি অর্বাচীন! মগধ সাম্রাজ্যের ন্যায়দণ্ডে উচ্চনীচ ভেদ নেই সেকথা তোমার জানা উচিৎ। বিষতিন্দু সংগ্রহে থাকলেই কেউ হত্যাকারী হয়ে যায় না, সত্য বল, তোমার কাছে আছে সে বিষ?’

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে সম্মতি জানায় কিলাত। ‘প্রতিবার রজ্জুপথে মারণখেলা দেখাবার কালে ভাবি, হয়তো আজই শেষ হবে সব; এখন যারা বাহবা দিচ্ছে, মুহূর্তের ভুলে পতন ঘটলে আমার রক্তাক্ত দেহ দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে তারাই। এভাবে হাসিমুখে জীবনের বাজি রাখা বড় সহজ নয় আমার মত নগন্য মানুষের কাছে। বেশ কিছুকাল আগে এক কলিঙ্গদেশীয় বণিকের সহানুভুতি পেয়েছিলাম, বণিক চীনাদেশে কারবার করেন; তিনিই দিয়েছিলেন বিষতিন্দু, সেদেশে ওষধি প্রস্তুত করতে ব্যবহার হয় এই বিষ। অতি অল্পমাত্রায় সেবন করলে স্নায়ু সবল হয় বলেছিলেন বণিক, তবে সাবধান করেছিলেন এর তীব্র বিষক্রীয়ার সম্পর্কে। কিন্তু, এর সাথে হত্যার সম্পর্ক কি?’

‘ওই বিষপাত্রটি একবার দেখতে চাই, সঙ্গে প্রহরী দিচ্ছি, নিয়ে এসো সত্বর।’

‘সে আর সম্ভব নয় আর্য, সম্প্রতি সেটি খুঁজে পাচ্ছিনা আমি।’

‘মহল্লিকা জানত তোমার এই বিষের কথা?’

‘মহল্লিকা? তবে কি সেই...?’ চিন্তিত দেখায় কিলাতকে, কিছুটা বিস্মিতও। এরপরে, তাকে বিদায় দিয়ে গৃহে ফেরেন পুষ্পকেতু, সঙ্গী হন উল্মুকও।

***

'জয়কেশী এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এই তোমার বিশ্বাস?' মধ্যাহ্নভোজের পরে দুই মিত্র বিশ্রাম করছেন, উল্মুক প্রসঙ্গ তোলেন সেসময়ে।

'সবদিক বিচার করে সেরকমই মনে হয়; তবে ধর্মদাস কি সংবাদ আনে দেখি, রুদ্রষেণের অসমাপ্ত তদন্তের দিকটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জয়কেশী যদি এই হত্যা করে থাকে, তা সে মহল্লিকার জন্য নয়, কোনও বৃহত্তর স্বার্থে আঘাত লেগেছিল তার, এই আমার ধারণা। তবে মহল্লিকা সত্য বলছে এও সম্ভব, ঘটনাচক্রে জয়কেশী জড়িয়ে পড়বে এ তার কল্পনার অতীত ছিল।'

'প্রেম বড় বিচিত্র বস্তু তাই না?'

'সে তো তুমি ভালো বলতে পারবে হে', পুষ্পকেতুর রসিকতায় দুজনেই হেসে ওঠেন।

দুই তরুণের আলাপচারিতা হত্যারহস্যের গণ্ডীতে বাঁধা থাকেনা বেশীক্ষণ, মনোরম দ্বিপ্রহরের অলস মেদুরতা আচ্ছন্ন করে হৃদয়।

***

এরপর কেটে গেছে কয়েকটি ঘটনাবিহীন দিন, নিত্যকার কাজের মাঝে কুমারকে থেকে থেকে ছুঁয়ে গেছে রহস্যের চিন্তাজাল। একদিন দিবার অগ্রভাগে হরিষেণের গৃহ থেকে এক দূত এসে দিয়ে যায় একটি পত্র। পত্রে হরিষেণ জানিয়েছেন দুই বিদেশীর সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য। ভীমদেব সত্যই কিপুনদদেবের শ্যালক, তবে লাম্পট্য ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য তিনি স্বদেশে কুখ্যাত; সম্প্রতি একটি গণিকালয়ে ঘটে যাওয়া এক হত্যাকে ঘিরে তাঁর নাম জড়ায়; যৌধেয়রাজ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেন। কিছুকাল দেশান্তরে কাটিয়ে ভগ্নীর মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করে দেশে ফিরবেন সম্ভবত এরকমই পরিকল্পনা তাঁর।

জয়কেশী সম্পন্ন বণিক, রোমক সাম্রাজ্যের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে তাঁর; গৃহে তিনটি শিশুসন্তান, পত্নী দুই বছর আগে কনিষ্ঠটির জন্মকালে মারা যান, এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহ করেননি তিনি। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে প্রায়ই ভ্রমণ করেন বিভিন্ন প্রদেশে, তাঁর পরিচিতিও ব্যপ্ত, তবে আইন বহির্ভুত কার্যকলাপের কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি। যদিও ব্যবসায়ের আড়ালে গুপ্তচরবৃতির সম্ভবনা উড়িয়ে দেওয়া যায়না, সে কার্যের সুযোগ তাঁর আছে।

সেদিনই দ্বিপ্রহরে ধর্মদাস নিখোঁজ বণিক বিষয়ক তদন্তের তথ্যসহ দেখা করেন বিশাখগুপ্তের কার্যালয়ে।

'এই সবকটি ঘটনাতেই লক্ষ্য করার বিষয় এই যে এঁরা প্রত্যেকেই বিদেশী ও অত্যন্ত সম্পন্ন ব্যক্তি। পান্থশালা থেকে মধ্যরাত্রে প্রায় চোরের মত অন্তর্হিত হয়েছেন সকলেই, এমনকি প্রয়োজনীয় দু একটি পেটী ভিন্ন সঙ্গে নেননি কিছুই; তাঁদের ফেলে যাওয়া সামগ্রী থেকে পান্থশালার বকেয়া মূল্য আদায় হয়েছে প্রতিক্ষেত্রেই।'

'বন্দরে এঁদের ঘনিষ্ঠ কেউ ছিল কিনা জানা গেছে কি?' পুষ্পকেতু প্রশ্ন করেন।

'কাজের উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ থাকলেও তেমন বিশেষ কারো কথা যানা যায়নি কোনও ক্ষেত্রেই। তবে দুটি বিষয়ে এঁদের মধ্যে আশ্চর্য্য মিল পাওয়া গেছে; প্রথমতঃ অক্ষক্রীড়ায় আসক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ, কোন না কোন সময়ে প্রত্যেকেরই রৈবতের পানশালায় যাতায়াত ছিল।'

'রৈবতের পানশালা!' বিশাখগুপ্ত চমকিত হন।

'আমি কতক এরকমই অনুমান করেছিলাম পিতা। রৈবত একজন আপাত ভদ্রলোক, তার পানশালাটি লোকপ্রিয়, এখানেই নিহিত আছে কোনও রহস্যের জাল', পুষ্পকেতু মন্তব্য করেন।

‘কিছু অনুমান করতে পারছ কি বৎস্য?’

‘ধুসরতা সরে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে সবকিছু, এখন শুধু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা। আপনি আশীর্বাদ করুন দেব, যেন সত্যসন্ধানে সফল হই।’

‘শুভমস্তু।’

***

উল্মুককে সঙ্গী করে রৈবতের পানশালার সান্ধ্য আসরে উপস্থিত হন পুষ্পকেতু, ধর্মদাস ও দুইজন প্রহরী নিরাপদ দূরত্বে অপেক্ষায় থাকে, যাতে প্রয়োজনে সাহায্যে আসতে পারে। রৈবত কিছুটা বিস্মিত হলেও হাসিমুখে এগিয়ে আসে অভ্যর্থনায়, প্রায়পূর্ণ সভাস্থলের মধ্যবর্তী একটি অংশে বসার ব্যবস্থা করে দেয় সে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে। বল্লভ সুরা হাতে এগিয়ে এলে, শীতল তক্রের অনুরোধ জানান কুমার, নেপথ্যে বেজে চলে সুললিত বাঁশীর সুর। আজও মহল্লিকা অতিথি সেবায় ব্যস্ত, তবে সে দূরত্ব বজায় রেখে এড়িয়ে চলে রাজপুরুষ ও তাঁর সঙ্গীকে। একপাশে অনেকগুলি পিঠিকা জুড়ে ভীমদেব সপারিষদ সুরাপানে মত্ত, দুটি সুরসিকা তাঁদের সেবায় তটস্থ। গুটিকয় অতিথি অক্ষক্রীড়ায় ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে, রৈবত নিজে তাঁদের সুখ সুবিধার তদারকিতে মগ্ন। অক্ষক্রীড়া পণ রেখে খেলা হয়, পণ জিতুন যে পক্ষই, এতে বিলক্ষণ শুণ্ডপতিরও লাভ থাকে কিছু। বংশীবাদন থেমে যায় আচম্বিতে, কক্ষে প্রবেশ করে কিলাত, বর্ণময় পোশাক ও বিচিত্র সাজসজ্জায় সে আকর্ষনীয়। আগ্রহ ফুটে ওঠে অতিথিদের চোখেমুখে, কিলাতের জনপ্রিয়তা সন্দেহাতীত। সে সকলকে অভিভাদন করে শুরু করে তার খেলা। সেদিন নারীসুলভ চলন ও মুকাভিনয়ে ছিল তার রসকৌতুকের বিষয়, অল্পসময়েই মাতিয়ে দেয় সে আসর, আর তার মাঝেই চলে শরীরী কসরৎ কৌতুকের ছলে; বাহবায় ফেটে পড়ে পানকক্ষ, অতিথিদের সাথে সেবক ও রসিকারাও যোগ দেয় হাসিতে। খেলা শেষ হয়, এরপর ঘুরে ঘুরে তাম্বুলপাত্র হাতে অতিথিদের সম্মুখে যায় কিলাত পারিতোষিকের আশায়, সকলেই দরাজহস্তে অর্থদান করেন; ভীমদেব দুটি রৌপ্যমুদ্রা ফেলে দেন থালিতে, কিলাত কৃতজ্ঞতা জানায় আভূমি অভিবাদনে। পুষ্পকেতুর সমুখে উপস্থিত হয় সে ক্রমে, উল্মুক থলি থেকে অর্থ বের করতে উদ্যত হন; কিলাত রমনীসুলভ কটাক্ষহানে কুমারের প্রতি। পুষ্পকেতু আচমকাই তার বামহস্তের মণিবন্ধ চেপে ধরেন, উল্মুক বিস্মিত হয়ে থমকে যান এই অদ্ভুত আচরণে; কিলাতের মুখের অভিব্যক্তিতে ফুটে ওঠে ভীতি। কুমার ধীরে ধীরে তার হাতের উপরভাগ মেলে ধরেন; নর্তকীদের মত আলংকারিক ধাতব নখর পরা তার পাঁচটি আঙ্গুলে, তার মধ্যে মধ্যমাটির অগ্রভাগ ভাঙা।

***

কিলাত কারারূদ্ধ হয়েছে রুদ্রষেণকে হত্যার অপরাধে, তার চারসঙ্গীও ধরা পড়েছে বিদেশী বণিকদের বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র ও লুঠের অভিযোগে। দণ্ডাধীশের কার্যালয়ে আধিকারিকরা সকলেই জমায়েত হয়েছেন, উপস্থিত আছেন উল্মুকও। জটিল ধাঁধার উত্তর জানতে সকলেই উদগ্রীব।

‘শুণ্ডালয়ে যেসকল বিত্তবান বিদেশী আসতেন, বিশেষত যাঁরা অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত, কিলাত তাঁদের সাথে ঘনিষ্ঠতা তৈরী করত তার রসালাপ গুণে, কখনও বা গঞ্জিকা সরবরাহ করে; সে নিজে নেশাসক্ত নয়, ফাঁদ পাততেই সংগ্রহে রাখত এইবস্তু। ক্রমে ওই চার সঙ্গীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিত, অধিক পণে খেলার প্রলোভন দেখিয়ে। বাকী কাজ তার সঙ্গীরাই করত, কিলাতের সেখানে কোনও ভূমিকা নেই।

ওই চারজন নিজস্ব কক্ষে নিয়ে যেত বণিকদের খেলার জন্য, প্রথম প্রথম হয়তো জেতার সুযোগ করে দিয়ে বিশ্বাস অর্জন করত, আর তারপরে ভঙ্গ প্রয়োগের মাধ্যমে নেশাগ্রস্ত করে, যে কোনও একজন কলহ

সৃষ্টি করত অতিথির সাথে। কলহকে দ্বন্দে পরিণত করতে সময় লাগত না, আর তারপরেই নেশাগ্রস্তকে বিশ্বাস করানো হোত যে তাঁর প্রতিপক্ষ হত হয়েছে। নেশা কেটে যেতে নিদারুণ ভয়ে বিদেশীর বুদ্ধি লোপ পেত, তখন তাঁর সংগ্রহের সমস্ত অর্থ ও গহনার বিনিময়ে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে তাঁকে রাতারাতি নগরসীমার বাইরে পলায়নে ব্যবস্থা করে দিত বাকি তিনজন। হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, ফলে বণিকেরা কেউই আর ফেরত আসেননি, বা এই নিয়ে আলোচনা করতে সাহস করেননি। এভাবে ভালোই চলছিল, কিন্তু গোল বাধালেন রুদ্রষেণ। তিনি এই অপরাধ চক্রের সাথে কিলাতের যোগসাজস আন্দজ করতে পেরেছিলেন, আর তাতেই মরতে হল তাঁকে।

কিলাত সেদিন রজ্জুগুলি এমনভাবে টাঙ্গিয়েছিল, যে একটি রজ্জু ছিল রুদ্রষেনের জন্য নির্দিষ্ট পীঠিকার ঠিক উপরভাগে। ইচ্ছা করেই সে পড়েছিল তাঁর পৃষ্ঠে; আর সেই সুযোগে বামহস্তের বিষাক্ত নখর দিয়ে সে চিঁড়ে দেয় তাঁর স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশ। যন্ত্রনায় বিচলিত হয়েই কিলাতকে প্রহার করেছিলেন রুদ্রষেণ। পরবর্তীতে তাঁর যে অস্বাভাবিক আচরণ, সে বিষক্রিয়ার ফল।'

'কিন্তু মহল্লিকা কিরূপে জানল বিষতিন্দুর কথা? সে যে নির্দোষ সে সিদ্ধান্তেই বা তুমি এলে কিরূপে?' বিশাখগুপ্ত প্রশ্ন করেন।

'সে সত্যই কখনও দেখেছিল কিলাতকে বিষ সেবন করতে, আর সেকারণেই বলেছিল ওকথা। কিলাত তার স্বীকারোক্তির সুযোগ নিয়ে আমাকে জানায় যে বিষের কৌটা অপহৃত হয়েছে; কৌটাটি সে নিজেই হত্যার পরে নদীবক্ষে বিসর্জন দিয়ে থাকবে। মহল্লিকা গৃহস্থ কন্যা, চার বর্ষের পুরাতন ঘটনার কারণে হত্যার ইচ্ছা জাগলেও সে কার্য একা সম্পন্ন করার স্নায়ু তার নেই বলে মনে হয়েছিল; জয়কেশীকে রক্ষা করতেই তার এই উদ্যোগ সে সন্দেহ প্রবল হয় শুরু থেকেই। তাছাড়া তার অঙ্গুরীয়টি পরীক্ষা করে কোনও ভাঙা অংশ চোখে পড়েনি আমার।'

'কিলাতের পরবর্তী লক্ষ্য কি ভীমদেব ছিলেন?' উল্মুক জানতে চান।

'সে তো অবশ্যই। মনে হয় শুরুতে জয়কেশীকেও কুক্ষিগত করতে চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু সাবধানী বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠীর সাথে পেরে ওঠেনি।'

এর পর সভাভঙ্গ হয়, ধীরে ধীরে প্রস্থান করেন সকলে। প্রহরী এসে জানায়, জয়কেশী দেখা করতে চান পুষ্পকেতুর সাথে।

প্রতীক্ষা কক্ষের মাঝখানে অপেক্ষায় আছেন শ্রেষ্ঠী জয়কেশী, পূর্বের হতাশাগ্রস্ত ভাব কেটে গিয়ে বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল তাঁর মুখের ভাব; লজ্জিত ভঙ্গীতে পাশে দাঁড়িয়ে মহল্লিকা।

'বিদায় নেবার পূর্বে সাক্ষাৎ করতে এলাম কুমার, আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।'

'কৃতজ্ঞতা কিসের? এ আমার কর্তব্য; মগধের ন্যায়দণ্ড সত্যের প্রতীক, আমি তার ক্ষুদ্র সেবক মাত্র।'

'আগামী পঞ্চমী তিথিতে দেশে যাত্রা করব, মহল্লিকাও সাথে যাবে আমার, বিবাহ করব তাকে।' ঈষৎ হেসে জানান জয়কেশী, মহল্লিকার মুখ রক্তিম হয় এই বাক্যে।

'মহল্লিকা ভাগ্যবতী, সে আপনার দেখা পেয়েছে; আমার অভিনন্দন রইল ভদ্র।'

***

গোধূলির রক্তরাগে শয়নকক্ষটি স্বপ্নময়, পীঠিকায় রাখা যূথীপুষ্পের গন্ধ বাতাসে নেশা ধরায়। পুষ্পকেতু কক্ষের একপাশে রাখা বীণার তার স্পর্শ করেন ধীরে ধীরে, এক কোমল সুরের মৃদু ঝঙ্কারে মেতে ওঠে পরিবেশ। রাত্রি গভীর হয়, শাপভ্রষ্ট গন্ধর্বের মত সুরসাধনায় ডুবে থাকেন কুমার গভীর আবেগে।

*** ***

দুরূহ শব্দের অর্থ :

কাম্পিল্য - পারফিউম, অক্ষক্রীড়া - পাশা খেলা, বায়বীয় কপি - আকাশে লাফিয়ে বেড়ানো বাঁদর, উৎপীঠিকা - টেবিল, পীঠিকা - কাঠের বসার টুল, এক দণ্ডকাল - ২৪ মিনিট, বিষতিন্দু - স্ট্রিকনিন বিষ, গঞ্জিকা– গাঁজা, ভঙ্গ - ভাং , কিলাত - বামন

ছায়াময়

শেষ ভাদ্রের প্রভাতকাল শীতলতার আভাসে বড় মনোরম; ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশিরবিন্দুর সিক্ত ঘ্রাণ, বাগানের এককোনে পারিজাত পুষ্পের বৃক্ষ ও তার বেদীমূল ছেয়ে থাকা ফুলের আস্তরণ কেমন যেন মায়া জাগায়; আসন্ন নবান্ন উৎসবের প্রাক্কালে এযেন প্রকৃতিদেবীর বিশেষ সজ্জা। দিবাভাগের প্রথম প্রহর, চারপাশের প্রকৃতি এখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন, যদিও বর্ধিষ্ণু গৃহটির গোশাল ইতিমধ্যেই কর্মচঞ্চল; গৃহসেবক ভূজঙ্গ সেখানে দুগ্ধ দোহনে ব্যস্ত। গৃহের পিছনভাগের যে অঙ্গন, তার এককোণে তুলসীমণ্ডপ, আর তার পাশে পাকশাল ও জলের কূপ; গৃহসংলগ্ন অলিন্দের একপাশে স্নান ও শৌচাগার। অঙ্গনের শেষে গৃহের পিছনভাগের সরু চলার পথ, সেখানে একটি বাঁশের দরজা মূলতঃ শৌচকর্মীদের যাতায়াতের জন্য নির্মিত। দ্বারের থেকে কিছুটা দূরত্বে অঙ্গনের দুইপাশে দুটি মাটির কুটির; ডানপাশের কুটিরটির পাশে গোশালা ও অশ্ব রাখার ছাউনি, এই কুটিরটি ভূজঙ্গের বাসস্থল। দ্বারের বামপাশের কুটিরটিতে থাকে চঞ্চলা, সে গৃহের একাধারে রাঁধুনি ও দাসী।

চঞ্চলা সুশ্রী ও বয়সে নবীনা, এই প্রভাতকালেও তার সাজ পোশাকে বিশেষ যত্নের ছাপ স্পষ্ট; সে নিজের কক্ষ থেকে দ্রুত মূল গৃহের দিকে যেতে যেতে, একবার কক্ষদ্বারের পানে চেয়ে দেখে, বিগত রজনীর কোনও মধুর স্মৃতিতে রক্তিমাভা দেখা দেয় তার দুই গালে। কবিরা বসন্তকে বলে থাকেন মধুমাস; কিন্তু ভাদরের নীরব আকিঞ্চন, সুন্দরী যুবতীর কাছে সেও কিছু কম মধুর নয়।

পাটলীপুত্রের এক সম্পন্ন পল্লীর নিভৃত পরিবেশে অবস্থিত গৃহটি শ্রেষ্ঠী বসুদত্তের, ফলের বাগান ঘেরা এই বসতবাটি অন্যান্য গৃহের থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। মূলভবনটি কাঠের এবং দুইতলবিশিষ্ট; নীচের তলে সমুখের প্রবেশদ্বারের সংলগ্ন একটি বহির্কক্ষ এবং তার পাশে একটি বিশ্রামকক্ষ ও অতিথিশালা। এই তিনটি কক্ষই পিছনের অলিন্দের সাথে যুক্ত। দ্বিতলে দুটি শয়নকক্ষ যার একটিকে গৃহিনী নিজস্ব বিশ্রাম কক্ষ হিসাবে ব্যবহার করেন, সাথে একটি পূজাকক্ষ, সেখানে শ্রী জনার্দন নিত্যপূজা পান; দ্বিতলের সিঁড়ি অলিন্দ সংলগ্ন। গৃহটি আয়তনে বৃহৎ নাহলেও নিঃসন্তান দম্পতির একাকী সংসারের পক্ষে যথেষ্ট। বসুদত্ত মসলা ও গন্ধদ্রব্যের কারবারি, সুদূর প্রাচ্য থেকে সংগৃহিত উত্তম এলা, লবঙ্গ, দারুচিনি, গন্ধমরিচ, তার সাথে অগুরু, ও ধুনক ভৃগুকচ্ছ হয়ে সরবরাহ করেন সুদুর রোমক সাম্রাজ্যে। জলপথ যাত্রা ও বিদেশ ভ্রমণ তাঁর ব্যবসায়ের অঙ্গ; একাজে দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি ঘটে নগরী থেকে, কখনও তিনমাসকাল, কখনও বা তারও বেশী। বসুদত্ত মধ্যবয়স্ক বিষয়ী মানুষ, তবে তাঁর স্ত্রী শ্রীজয়া যুবতী ও সুন্দরী; এটি শ্রেষ্ঠীর দ্বিতীয়পক্ষ। প্রথম স্ত্রী গত হয়েছিলেন যৌবনকালেই, আর তার কিছুদিন পরে মৃত্যু হয় তাঁর পিতারও। সেই থেকে নিজেকে ব্যবসায়ে সঁপে দিয়ে মানুষ করেছিলেন দুটি ভগ্নী ও এক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে। ভগিনীদের বিবাহ, ভ্রাতা সুদত্তকে ব্যবসায়ে সামিল করা এসবই করেছিলেন তিনি একে একে, এর মাঝে আর বিবাহের চিন্তা মাথায় আসেনি। বিবাহ না করলেও, শোনা যায় একটি উপপত্নী ছিল তাঁর গণিকা পল্লীতে, তবে সেসব বেশ কিছুকাল আগের কথা। সুদত্ত স্বাবলম্বী হতে, তার বিবাহ হয় নগরীর এক সম্ভ্রান্ত গৃহে; স্বামীর বিদেশযাত্রায় সুদত্তর স্ত্রী উপলার আপত্তি দেখা দেয়, ফলে ভ্রাতার থেকে পৃথক হয়ে নগরীতে নিজস্ব গন্ধদ্রব্যের বিপনি প্রতিষ্ঠা করেন সুদত্ত। ততদিনে, মাতারও মৃত্যু ঘটেছে। তিন বৎসর পূর্বে বসুদত্ত প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে, পুনরায় বিবাহ করেন; শোনা যায় মদন মহোৎসবে গঙ্গাতীরে উপাসনারতা শ্রীজয়াকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন। শ্রীজয়া অনাথা বিধবার একমাত্র সন্তান, অর্থকৌলিন্যের অভাব পুরন করেছিল তার আলো করা রূপ। কিন্তু এ বিবাহে,

পরিবার, বিশেষতঃ সুদত্তের শ্বশুরকুল বিশেষ অসন্তুষ্ট ছিলেন। উপলার বিরূপমনভাব লক্ষ্য করে, কিছুদিনের মধ্যে পৈতৃক গৃহের পাশের বাগানসহ জমিতে নিজস্ব গৃহ তৈরী করে পৃথক হন বসুদত্ত। এর ফলে, সম্পর্কের তিক্ততা দূর হয়ে শান্তি ফেরে, শ্রীজয়াও নিজস্ব সংসার পেয়ে সুখী হয়।

গৃহস্বামী বিগত তিনমাসকাল যাবৎ ব্যবসায় কার্যে গৃহের বাহিরে আছেন, গতকাল দুপুরে সংবাদ এসেছে, তাঁর দুখানি পণ্যতরণী বন্দরে ফিরেছে, সাথে শ্রেষ্ঠীও আছেন। বন্দরের কাজ মিটিয়ে আজ কালের মধ্যেই গৃহে ফিরবেন তিনি। আজকের দিনে সেকারণে চঞ্চলা অতিপ্রত্যুষেই কর্ত্রীকে জাগিয়ে তাঁর স্নানের ব্যবস্থা করতে মূলগৃহে চলেছে; শ্রেষ্ঠীর আবির্ভাবের আশায় বিশেষ ব্যঞ্জনের আয়োজন হবে অবশ্যই, সেবিষয়েও কর্ত্রীর নির্দেশ নেওয়া প্রয়োজন। চঞ্চলা দ্রুত পায়ে অলিন্দ পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের শয়নকক্ষে পা বাড়ায়। দ্বিতলেও নীচতলের মতই কক্ষ সংলগ্ন একটি অলিন্দ আছে, শয়নকক্ষের দ্বার আবছা ভেজানো দেখে চঞ্চলা অপ্রস্তুত বোধ করে; স্বামিনী তার আসার পূর্বেই উঠে পড়েছেন নিশ্চয়। দীর্ঘ বিরহের অন্তে তরুণী স্ত্রীর উৎকণ্ঠা মনে মনে অনুভব করে সে তার নারী হৃদয়ে।

দরজায় মৃদু করাঘাত করে নিজের উপস্থিতি জানান দেয় চঞ্চলা, কক্ষ থেকে আওয়াজ আসে না কোনও, কয়েক মূহুর্ত অপেক্ষা করে ভিতরে প্রবেশ করে সে।

দেওয়ালের পাশ ঘেঁষে রাখা সুদৃশ্য পালঙ্কটি শূন্য; কক্ষের অন্য পাশে খোলা মেঝেতে পড়ে আছে শ্রীজয়ার রক্তাক্ত দেহ, বিস্রস্ত তার কেশ বেশ, কিছু দূরে উল্টে পড়ে আছে একটি চন্দনকাষ্ঠের কারুকার্যমণ্ডিত পীঠক, ও আরো কয়েকটি ছোটখাটো আসবাব। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে হাহাকার করে ওঠে চঞ্চলা বুদ্ধিভ্রষ্টের মত, তার আর্ত চিৎকারে সচকিত হয় নিস্তব্ধ পরিবেশ। সম্বিৎ ফিরে পেতে অলিন্দে বেরিয়ে ভূজঙ্গের নাম ধরে ডাকতে থাকে সে বারম্বার। ভূজঙ্গ দৌড়ে আসে দুর্ঘটনাস্থলে, কর্ত্রীর দেহের সমুখে গিয়ে সে বুঝতে চেষ্টা করে তিনি জীবিত কিনা; আপাত নিথর দেহতে প্রাণের স্পর্শ লক্ষিত হয়না। চঞ্চলাকে নাড়িস্পন্দন অনুভব করতে অনুরোধ করে ভূজঙ্গ, একটু ইতস্তত করে এগিয়ে যায় চঞ্চলা, শ্রীজয়া একখানি হাত নিজ হাতে নিয়ে ছিটকে পিছিয়ে যায় সে। কর্ত্রীর দেহ বরফের মত শীতল, তাঁর মৃত্যু ঘটেছে বেশকিছু সময় পূর্বেই।

'আমি প্রভু সুদত্তকে ডেকে আনছি, তুমি কক্ষত্যাগ কোরনা চঞ্চলা', ভূজঙ্গ পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেয়।

চঞ্চলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নেয় তার নির্দেশ, অপঘাত হলেও গৃহস্বামিনীর মৃতদেহ পরিত্যাগ করে যাওয়া চলেনা এই অবস্থায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুদত্ত ছুটে আসেন ভূজঙ্গের সাথে, ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব দেখায় তাঁকেও। ভাতৃবধূর এই করুণ পরিণতি কল্পনারও অতীত, অসীম মমতায় তার নিথর দেহটিকে ছুঁয়ে দেখেন সুদত্ত, বুঝিবা সামান্য প্রাণস্পন্দনের আশায়; দুচোখ বেয়ে নেমে আসা নীরব অশ্রু গোপন করতে চেষ্টা করেননা তিনি। এভাবে কেটে যায় বেশ কিছুকাল, ক্রমে নিজেকে সামলে নেন সুদত্ত, একখানি বস্ত্র দিয়ে শবটি ঢেকে দেন তিনি পরম যত্নে; অস্বাভাবিক মৃত্যু, গৃহস্বামী অনুপস্থিত, এক্ষেত্রে তাঁকেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। ভূজঙ্গকে পাটলীপুত্রের মহাদণ্ডনায়কের কার্যালয়ে পাঠান তিনি, চঞ্চলার চিৎকারে ইতিমধ্যেই দুএকটি পথচারী এসে ভীড় করেছে, সুদত্তের গৃহের দাস দাসীও উপস্থিত হয় সেইসঙ্গে।

এত প্রত্যুষে কার্যালয় তখনও সচল হয়নি, কয়েকজন প্রহরী ভিন্ন কেউ নেই সেখানে, তবু ভূজঙ্গের বক্তব্য শুনে তাদেরই একজন আধিকারিক ধর্মদাসকে সংবাদ দেয়। একে হত্যা, তায় সম্পন্ন ঘরের গৃহবধূ, ধর্মদাস কয়েকজন প্রহরীসহ তৎক্ষনাৎ রওয়ানা দেন ঘটনার তদন্তে।

'কক্ষের দ্বার খোলা ছিল যখন মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়?' ধর্মদাস ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণের পশ্চাতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন সুদত্তকে।

'চঞ্চলা যখন দ্বিতলে আসে, কক্ষের দ্বার আবছা ভেজানো ছিল।'

‘আর গৃহের মূল দরজা, সেও কি খোলা ছিল সেসময়ে?’

এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। চঞ্চলা জানায়, অঙ্গন থেকে দ্বিতলে আসতে সমুখ দ্বারের প্রয়োজন হয়না, ফলে সে এ ব্যাপারে কিছু জানেনা। এরপর ভূজঙ্গকে জিজ্ঞাসা করা হলে তাকে বিভ্রান্ত দেখায়, সে বিলক্ষণ সমুখের দরজা দিয়েই সদত্তকে ডাকতে গিয়েছিল, কিন্তু গোলমালে মনে করতে পারেনা সেটি উন্মুক্ত ছিল, না সে নিজে হাতে অর্গল মুক্ত করেছে।

‘গৃহিনী কি শয়নকালে আভরণ খুলে রাখতেন, তাঁর দেহে কোনও গহনা দেখছি না?’ ধর্মদাসের এ প্রশ্নটি চঞ্চলার উদ্দেশ্যে।

চঞ্চলা জানায়, গৃহিনী গহনায় বিশেষ আসক্ত ছিলেন, কখনওই নিরাভরণ থাকতেন না।

‘মনে হচ্ছে তস্করের কাজ, গহনার লোভেই এ হত্যা, মৃতার স্বামীকে সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা করুন, আমি আধিকারিক চিত্রককে সংবাদ পাঠাচ্ছি, তিনি এসে শব পরীক্ষা করবেন’, ধর্মদাস জানান সুদত্তকে।

‘শব পরীক্ষা, সৎকার হবে না?’ হাহাকার করে ওঠেন সুদত্ত।

‘যত শীঘ্র সম্ভব পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করা হবে, নিশ্চিন্ত থাকুন ভদ্র। ততক্ষণে মৃতার স্বামীকে আনার ব্যবস্থা করুন; দাহকার্যে কোনও বাধাসৃষ্টি হবেনা।’ ধর্মদাস বিষবিজ্ঞান ও শরীরবিদ্যা বিশেষজ্ঞ প্রবীণ আধিকারিক চিত্রককে সংবাদ পাঠান প্রহরীর মাধ্যমে।

***

বন্দর এলাকায় শ্রেষ্ঠী বসুদত্তের সুবিশাল ভাণ্ডার গৃহ, আর তার সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র অতিথিশালা; মূলতঃ শ্রেষ্ঠীর নিজের রাত্রিবাসের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, তবে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবসায়ের কার্যে আগত বণিকদেরও আতিথ্যের বন্দোবস্ত হয় সেখানে। গতকাল তরণীদুটির সাথে বসুদত্তও পাটলীপুত্রে ফিরেছেন সুদূর ভৃগুকচ্ছ থেকে, শুল্ক মিটিয়ে পণ্য ভাণ্ডারভুক্তীকরণ সময়সাপেক্ষ কাজ, অথচ এ কাজে নিজের তত্ত্বাবধান জরুরী; সেকারণে গৃহে পৌঁছ সংবাদ পাঠিয়ে অতিথিশালাতেই রাত্রিবাস করেন শ্রেষ্ঠী, আজ মধ্যাহ্নের পূর্বেই গৃহে ফিরবেন এরূপ ইচ্ছা ছিল তাঁর।

তিনি প্রাতঃরাশ সমাধা করে ভাণ্ডারের হিসাব বহি পরীক্ষা করছিলেন নিজস্ব কার্যালয়ে, প্রবীন কর্মচারী বিটঙ্ক তাঁকে সহায়তা করছিলেন এ কার্যে। ভাণ্ডারের আর এক কর্মী ঋভু উত্তেজিত হয়ে ছুটে আসে এসময়, সে ভাণ্ডারের কাজ ছাড়াও, অতিথিশালা দেখা শোনা ও অতিথিসেবার দায়িত্ব পালন করে থাকে। ভূজঙ্গ অতিথিশালায় এসে প্রভুকে না পেয়ে তার কাছেই গৃহঘটিত দুঃসংবাদটি দেয়।

‘প্রভু, ভূজঙ্গ এসেছে, আপনাকে গৃহে নিয়ে যেতে চায় সে এখনি’, ঋভু জানায়।

‘এখন কিরূপে সম্ভব! ভূজঙ্গ কোথায়?’ বসুদত্ত বিস্মিত বোধ করেন। ভূজঙ্গ দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষায় ছিল, ভিতরে এসে সবিস্তারে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে সে। স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননা শ্রেষ্ঠী বেশ কিছু সময়। এ কি প্রকার পরিহাস? অবশেষে ভূজঙ্গের কান্না দেখে বুঝিবা দুঃসংবাদটির মর্ম অনুভব করেন তিনি। দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধ হয় থাকেন শ্রেষ্ঠী এরপর, কর্মচারীরা বিচলিত বোধ করেন এই মর্মান্তিক নীরবতায়।

‘প্রভু অশ্বসকটের বন্দোবস্ত করি?’ ঋভু বলে ওঠে একসময়, শ্রেষ্ঠীর গৃহে ফেরা প্রয়োজন অবিলম্বে।

‘না, অশ্বপৃষ্ঠেই যাব আমি, বড় বেশী দেরী হয়ে গেল গৃহে ফিরতে।’ বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসের সাথে গড়িয়ে পরে দুফোঁটা অশ্রু চোখের কোল বেয়ে।

বসুদত্তের গৃহ নগর তোরণ থেকে বেশীদূরে নয়, ভদ্র চিত্রক সেখানে উপস্থিত হবার অল্প পরেই গৃহস্বামীও উপস্থিত হন নিজগৃহে। চিত্রক তাঁর অপেক্ষাতেই ছিলেন, অনুমতি ভিন্ন নারীর শব পরীক্ষা অনুচিত।

‘আমার স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করার অনুমতি আমি দিতে পারিনা আপনাকে’, বসুদত্ত বিচলিত হয়ে পড়েন।

‘আপনার ও গৃহের কোনও নারী সদস্যের উপস্থিতিতেই মৃতার ক্ষত ও অন্যান্য লক্ষণ পরীক্ষা করব ভদ্র, প্রয়োজন না হলে অঙ্গস্পর্শও করব না, আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনার পত্নী আমার ভগিনীতুল্যা।’ চিত্রক শান্তভাবে ব্যাখ্যা করেন। বসুদত্ত বিরোধিতা করতে থাকেন, একে এই আকস্মাৎ শোক, তদুপোরি এই অবমাননা অসহ্য মনে হয় তাঁর। অবশেষে সুদত্তের মধ্যস্থতায় পরীক্ষাকার্য শুরু হয়, কক্ষে উপস্থিত থাকেন চিত্রক, বসুদত্ত ও চঞ্চলা।

মৃতার মাথার পিছনে একটি গভীর ক্ষত লক্ষিত হয়, রক্তপাত সেখান থেকেই ঘটেছে; আততায়ীকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিলেন শ্রীজয়া, দেহে কালশিরা ও আঁচড়ের দাগ থেকে সে বিষয় স্পষ্ট হয়। মৃতদেহ কক্ষের যে অংশে পড়েছিল, তার পিছনের দেয়ালটিতে রয়েছে হাতির দাঁতের কারুকার্যমণ্ডিত একটি হস্তিমুখ, এই মূহূর্তে সেটির শুঁড় ও তীক্ষ্ণ দাঁত দুটি রক্তাক্ত। মৃতার মস্তকের ক্ষত এই বস্তুটির আঘাতেই ঘটেছে সন্দেহ থাকেনা।

‘আপনার কাজ শেষ হয়ে থাকলে, আমরা দাহকার্যের ব্যবস্থা করি ভদ্র। এমন হতভাগ্য আমি, যে শোক করার সুযোগটুকুও পেলাম না এই গোলযোগে’, বসুদত্ত আবেদন করেন, তাঁর আর্দ্র চোখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে বিব্রত বোধ করেন চিত্রক।

‘আর একটু সময় চেয়ে নেব ভদ্র, মৃতার মস্তক ও গলা একটু বিশেষ ভাবে পরীক্ষার প্রয়োজন। আপনি অনুমতি দিলে কার্য শুরু করি।’ এরপর, চিত্রক মস্তকের ক্ষত ও শবের মুখ চোখ ও গলা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করেন। যদিও এ বিষয়ে আর কোনও মন্তব্য করেননা সেস্থানে।

‘সিন্দুকের তল্লিকা কি আপনার স্ত্রীর কাছেই থাকত?’ পরীক্ষা শেষে, পালঙ্কের অপর পার্শ্বে রাখা একটি লৌহ সিন্দুকের দিকে ইঙ্গিত করেন চিত্রক।

‘হ্যাঁ, এটিতে কিছু অর্থ ও তাঁর গহনার পেটিকা থাকত; ব্যবসায়গত মূলধন ও কাগজপত্রের জন্য ভাণ্ডারগৃহে আমার কার্যালয়ে একটি সিন্দুক আছে, সেটির তল্লিকা আমার কাছেই থাকে।’

‘সিন্দুকটি বন্ধ রয়েছে দেখছি। এটি খোলার ব্যবস্থা করা চলে কি? তস্কর সিন্দুক লুঠ করেছে কিনা জানা প্রয়োজন। অবশ্য সিন্দুক খোলা পেলে সেটি বন্ধ করে সে পালাতো না।’

চিত্রকের নির্দেশ মেনে শ্রেষ্ঠী তল্লিকার সন্ধান করেন পালঙ্কের উপাধানের নীচে, সেটি যথাস্থানেই পাওয়া যায়; সিন্দুকের খুলে চোখে পড়ে অর্থ ও গহনার পেটিকা যথারীতি অবস্থান করছে সেখানে।

‘সিন্দুকে তস্করের হাত পড়েনি, তবে আপনার স্ত্রীর গায়ের গহনা সে নিয়ে গেছে। এর একটি তালিকা আমাদের প্রয়োজন ভদ্র।’

‘কিন্তু সে তালিকা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, তিনি কাল কি গহনা পরেছিলেন আমি তো দেখিনি।’

‘আপনি দেখেননি, কিন্তু গৃহের দাসীটি দেখেছে, সে নিশ্চয় বলতে পারবে; মেয়েরা গহনার বিষয়ে ভুল করেনা।’

এরপর কক্ষটি পরবর্তীকালে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে চিত্রক স্থান ত্যাগ করেন।

***

সুপরিসর কক্ষটির উদ্যান সংলগ্ন জানালার পাশে রয়েছে একখানি সুদৃশ্য মন্দুরা; মন্দুরার একপাশে বসে এক অনিন্দ্যকান্তি তরুণ বীণাবাদনে মগ্ন। অপরাহ্নের নরম রোদের ছোঁয়ায় তাঁর কেশগুচ্ছ স্বর্ণাভ, অর্ধনীমিলিত চোখে স্বপ্নের ঘোর, ঠোঁটে লেগে আছে স্মিত হাসি। পাশে রাখা একটি থালিকায় একগুচ্ছ পারিজাতমালা, কুরুঙ্গীতে জ্বলছে চন্দনগন্ধী ধুপক। মন্দুরার অন্যপাশে উপাধানে ভর দিয়ে অর্ধশয়ান আর এক সুদর্শন নবযুবক, সুরময় এই মায়াবী পরিবেশে তিনিও আত্মমগ্ন।

কঙ্কণের মৃদু শব্দে ধ্যানভঙ্গ হয় যুবকের, নববিবাহিতা স্ত্রী চম্পাবতীর অলক্ষ্য উপস্থিতি অনুভব করে দ্বারের দিকে চেয়ে দেখেন তিনি, প্রশ্রয়ের হাসি ফুটে ওঠে তাঁর চোখে মুখে। ইতিমধ্যে বীণাবাদন বন্ধ হয়, যন্ত্রটি একপাশে রেখে কৌতুহলী হয়ে ওঠেন কুমার পুষ্পকেতু।

'দ্বারপ্রান্তে কিছু অনর্থ ঘটেছে নাকি, এমন উন্মনা হলে কিসে?' বাল্যবন্ধু উল্মুককে প্রশ্ন করেন তিনি কৌতুকছলে।

'তোমার সুরসন্ধান দীর্ঘক্ষণ চললে অনর্থ ঘটতেও পারে, সে-বিষয়েই চিন্তায় আছি', কথাটি বলতে বলতে কক্ষের বাইরে চম্পাবতীর প্রতি ইঙ্গিত করেন উল্মুক। আচমকা ধরা পড়ে, অপ্রস্তুত দেখায় চম্পাকে; তার স্নিগ্ধ সুকুমার মুখখানি লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে।

'বাইরে থেকে কেন, এখানে বসে শোন বাজনা', উল্মুক উৎসাহ দেন।

'আপনি আসন গ্রহণ করুন দেবী, এ আমার সৌভাগ্য', পুষ্পকেতু আপ্যায়ন করেন ভাতৃবধূসমা তরুণীকে।

আবার শুরু হয় বীণাবাদন, সুরের মায়াজালে ডুবে থাকেন তিনজন দীর্ঘক্ষণ। দিনের আলো কমে আসে, আর তারই সাথে একসময় বাজনা শেষ হয়, পুষ্পকেতু বিদায় নিতে চান বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর কাছে।

'কি অপূর্ব আপনার বাজনা, আবার কবে আসবেন আর্য?' চম্পার সরল উক্তি ছুঁয়ে যায় তাঁকে।

'আপনার ভালো লেগেছে?'

'অপূর্ব আপনার সুরসৃষ্টি, মনে হয় যেন আপনি শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব।'

'উঁহুঁ, গন্ধর্ব নয়, ও যে কন্দর্প; সাবধানে থেকো', উল্মুক পুষ্পকেতুর নামের প্রতি ইঙ্গিত করে স্ত্রীকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করেন, চম্পাবতী কুপিতা হয়ে কক্ষ ছেড়ে চলে যান।

'সত্যি কেতু, আজকের দিনটি বহূকাল মনে থাকবে। তুমি ছিলে, তাই পুস্তপালের দপ্তরে দিনপাত করা সহনীয় হয়েছে।'

'চাও যদি, কয়েকটা দিন পুস্তপালের হাত থেকে রেহাই পেতে পারো', পুষ্পকেতুর উত্তরে রহস্যের ইঙ্গিত পেয়ে কৌতুহলী হয়ে ওঠেন উল্মুক।

'আজ প্রত্যুষে বৈশ্যপল্লীতে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, পিতা সেবিষয়ে অনুসন্ধানের ভার আমাকে দিতে চান। কাল প্রভাতে দণ্ডনায়কের কার্যালয়ে ভদ্র চিত্রকের সাথে আলোচনা আছে, আসতে চাও কি?'

'অহোঃ! একারণেই তোমাকে এত ভালবাসি', আগ্রহের আতিশয্যে মিত্রকে আলিঙ্গন করেন উল্মুক।

***

'মস্তকের আঘাতে মৃত্যু ঘটেনি, এই আপনার মত?' মহাদণ্ডনায়ক বিশাখগুপ্তের কার্যালয়ে বসেছে আলোচনা সভা, তিনি ছাড়াও সেখানে উপস্থিত তাঁর পুত্র পুষ্পকেতু, উল্মুক, ধর্মদাস ও অবশ্যই আধিকারিক চিত্রক। প্রশ্নটি করেন পুষ্পকেতু।

'হ্যাঁ, মস্তকের আঘাতটি রক্তক্ষয়ের কারণ হলেও মৃত্যুর কারণ হয়নি, সে আঘাত তেমন গভীর ছিলনা। গলায় আঙ্গুলের ছাপ স্পষ্ট, চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত, জিহবা অল্প বেরিয়ে এসেছিল। এথেকে প্রমান হয়, আততায়ী শ্রেষ্ঠীপত্নীকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

'কিন্তু, মস্তকে আঘাত করার পর কণ্ঠরোধের অর্থ কি? দ্বিতীয়বার মস্তকেই আঘাত করা স্বাভাবিক ছিল না কি?'

'আমার ধারণা প্রথম আঘাতেই মৃত্যু ঘটেছে ভেবে আততায়ী নিশিন্ত ছিল, কিন্তু গা থেকে গহনা অপসারণ কালে প্রাণের লক্ষণ দেখা দেয়, হয়তো মৃতা প্রতিরোধ অথবা চিৎকারেরও চেষ্টা করে থাকবেন। সে অবস্থায়, ভয় পেয়ে তাঁকে শ্বাসরূদ্ধ করে হত্যাকারী।'

‘মৃত্যুকাল সম্পর্কে কিছু ধারণা করা সম্ভব হয়েছে কি ভদ্র?’

‘আমি যখন দেহ পরীক্ষা করি, তখন দিবা দ্বিতীয় প্রহর শুরু হয়েছে। দেহের তাপমান ও কাঠিন্যের মাত্রা লক্ষ্য করে মনে হয়েছে মৃত্যু ঘটেছে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের শেষভাগ অথবা তৃতীয় প্রহরের শুরুতে।’

‘তৃতীয় প্রহর, অর্থাৎ রাত গভীর, কিন্তু নিশুতি নয়। সামান্য তস্কর গৃহস্থগৃহে সিঁধ কাটে রাত্রির শেষ প্রহরে, সেসময়ই নিদ্রা গভীরতম হয়।’পুষ্পকেতুকে কিছুটা বিস্মিত দেখায়।

‘তুমি কি অন্যপ্রকার কিছু আশঙ্কা করছ কেতু?’ বিশাখগুপ্ত প্রশ্ন করেন। নিজপুত্রের বিশ্লেষণী ক্ষমতার প্রতি তাঁর গভীর আস্থা, তাই পুত্রের মন্তব্যে বিচলিত দেখায় তাঁকে। বিশাখগুপ্ত বিগত একযুগ ধরে পাটলীপুত্রের আইনরক্ষক; সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনি, ন্যায়নিষ্ঠতা ও নীতিজ্ঞানে অমিতবিক্রমী মগধেশ্বরের যোগ্য অনুজ। তাঁর দক্ষ পরিচালনায় পাটলীপুত্র শান্তিপূর্ণ নগরী, এখানে এরূপ অঘটন সচরাচর ঘটে না, এর যথাযথ প্রতিকার করতে তিনি দৃঢ়বদ্ধ।

‘হ্যাঁ, এইকাজ সামান্য তস্করের কিনা সে নিয়ে সন্দেহ জাগছে। এতবড় দুঃসাহসিক কাজ সে করবে গুটিকয় গহনার লোভে?’

‘গহনা কি সামান্য বস্তু? শ্রেষ্ঠীর তালিকা অনুযায়ী গৃহিনীর গাত্রে বেশ কিছু স্বর্ণালঙ্কার ছিল, তার মূল্য নেহাত কম হবে না।’বিশাখগুপ্ত যুক্তি দেন।

‘এতখানি ঝুঁকি নিয়ে চৌর্যবৃত্তি করতে এসে, সিন্দুক খোলার চেষ্টা করল না আততায়ী, এটা কি আশ্চর্যের বিষয় নয়?’

‘এখন আমাদের করনীয় কি বলে তোমার মনে হয়?’

‘আমি ঘটনার বিষদ তদন্ত করতে চাই পিতা, আপনি অনুমতি দিন।’ বিশাখগুপ্তকে চিন্তিত দেখায় এ প্রস্তাবে।

‘বেশ, ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আমি অনুমতি দিলাম, তবে শ্রেষ্ঠীর পরিবারের অনুভূতির কথা স্মরণে রেখে অনুসন্ধান কার্য চালনা কোর।’ তখনকার মত আলোচনা সভা ভঙ্গ হয় এই সাথে।

***

অগ্রীম সংবাদ পাঠিয়ে বসুদত্তের গৃহে উপস্থিত হন পুষ্পকেতু ও উল্মুক, সাথে থাকেন ধর্মদাস। বসুদত্ত আপাতত ভাইয়ের গৃহে রয়েছেন, শ্রাদ্ধক্রিয়ার ব্যবস্থা সেখান থেকেই সজ্জিত হবে। তাঁর নির্দেশে ভূজঙ্গ সাথে করে নিয়ে যায় আধিকারিকদের বন্ধ রাখা শয়নকক্ষটিতে। কক্ষটির বদ্ধ আবহাওয়ায় শোণিতের মৃদু গন্ধ, ছড়িয়ে থাকা আসবাব ও দেওয়ালে গাঁথা রক্তাক্ত হস্তিমুখ যেন মৃত্যুর এক বিভৎস্য রূপের প্রতিভূ, সুদৃশ্য কক্ষের কমনীয় সজ্জার সাথে বড় বেমানান। শয্যাটি দেখে বোঝা যায় মৃতা দুর্ঘটনার রাত্রে শয়ন করেছিলেন সেখানে, পালঙ্কের পাশে রাখা একটি জলের কুম্ভিকা ও তার উপরে একখানি সুদৃশ্য রূপার পানপাত্র। এগুলি, শ্রীজয়া কক্ষের যেদিকে পড়ে ছিলেন তার অপর প্রান্তে রাখা, ফলে জিনিসগুলি স্থানচ্যুত হয়নি। পালঙ্কের নীচে দৃষ্টিপাত করেন পুষ্পকেতু, সেখানে একপাশে রাখা রয়েছে একটি কাষ্ঠ পেটিকা, আর পালঙ্কের প্রান্তে মাটিতে রয়েছে একটি রূপার থালিকা ও তার উপরে একটি পানপাত্র। থালিকায় তখনও পড়ে রয়েছে দু একটি অর্ধভুক্ত মিষ্টান্ন, পানপাত্রের তলানী শুকিয়ে গেছে, তবু ঘ্রাণ থেকে বোধ হয়, কোনও কর্পূর মিশ্রিত পানীয়। পেটিকাটি পালঙ্কের তল থেকে বের করে আনে ভূজঙ্গ পুষ্পকেতুর নির্দেশে, সেটির কপাটে তালযন্ত্র নেই। কপাট উন্মোচন করে দেখা যায় ভিতরে রয়েছে একরাশ রূপার বাসন, সম্ভবত বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তুলে রাখা তৈজসপত্র সেগুলি। পালঙ্কের শিয়রে দেওয়ালের দীপদণ্ডটিতে পিতলের প্রদীপগুলি জ্বলে যাওয়া সলিতার প্রভাবে কালিমালিপ্ত। সেগুলিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন পুষ্পকেতু।

‘আততায়ী যখন কক্ষে আসে, গৃহিনী জাগ্রত ছিলেন। প্রদীপগুলিতে বিন্দুমাত্র তৈল অবশিষ্ট নেই, সলিতাও সম্পূর্নরূপে ভষ্মীভূত হয়েছে, এগুলি রাতভর জ্বলে আপনি নিভে গেছে। গৃহিনী নিদ্রিতা হলে প্রদীপে তেল থাকত।’ পুষ্পকেতু মন্তব্য করেন।

‘জাগ্রত ছিলেন, সেকারনেই প্রাণ দিতে হল বলছ?’ উল্মুক প্রশ্ন করেন। কেতু কোনও মন্তব্য করেননা এর উত্তরে।

শয়নকক্ষ পরিদর্শন শেষে সংলগ্ন কক্ষটিতে প্রবেশ করেন সকলে, এটি ছিল গৃহিনীর প্রসাধন কক্ষ। সারি সারি পেটিকা, ও প্রসাধন সামগ্রী দেখে বুঝতে অসুবিধা হয়না, শ্রীজয়া অত্যন্ত সৌখিন ও প্রসাধন বিলাসিনী ছিলেন। কক্ষটিতে সবকিছু সুচারুভাবে সাজানো, যেন এখনই গৃহিনীর পদার্পন ঘটবে সেখানে। অলিন্দের শেষপ্রান্তে পূজাকক্ষ, অশৌচকালে পূজাকর্ম বন্ধ, তাই কক্ষটিও কপাটবদ্ধ।

‘গৃহের মূল দরজা বন্ধ হোত কোন সময়ে?’ প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শেষ হতে ভূজঙ্গকে প্রশ্ন করেন পুষ্পকেতু।

‘শ্রেষ্ঠী প্রবাসে থাকলে গৃহের মুল দরজা কপাটবদ্ধই থাকত সকলসময়, অতিথি এসে করাঘাত করলে, আমি খুলে দিতাম কপাট।’

‘হত্যার দিনেও কপাট বন্ধই ছিল সন্ধ্যাকালে?’

‘তাই ছিল নিশ্চয়’, ভূজঙ্গকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত দেখায় এমূহূর্তে।

‘তুমি নিশ্চিত নও? কেন?’

‘সূর্যাস্তের পূর্বেই গৃহকর্ম শেষ করে আমি কুটিরে ফিরে যাই প্রতিদিন, সন্ধ্যাকালে চঞ্চলাই মূলগৃহে থাকত। সেসময়ে কেউ এসে থাকলে আমি বলতে পারব না।’

‘সন্ধ্যাকালেও অতিথি আসার সম্ভাবনা ছিল কি শ্রেষ্ঠীর অবর্তমানে?’

‘এবিষয়ে চঞ্চলা সঠিক বলতে পারবে প্রভু, আমি কিছু জানিনা’, ভূজঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাইছে স্পষ্ট হয় সেকথা।

অতঃপর চঞ্চলার ডাক পড়ে প্রশ্নোত্তর পর্বের উদ্দেশ্যে। চঞ্চলার সংযত শান্তশ্রী দেখে বোধ হয়, স্বামিনীর মৃত্যর আঘাত কিছুটা হলেও সে কাটিয়ে উঠেছে। কথাবার্তা শুরু হয় নীচের তলের বিশ্রাম কক্ষটিতে।

‘তোমার প্রভুপত্নীর সাথে সাক্ষাৎ করতে কারা আসত?’

‘তাঁর মাতা আসতেন প্রায়শই, তবে কয়েকমাস পূর্বে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। ভাগ্যবতী, তাই এই দুর্ঘটনা দেখতে হলনা’, নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। ‘এছাড়া, প্রভু সুদত্ত আসতেন খোঁজখবর নিতে।’

‘সুদত্ত পত্নী আসতেন না?’

‘পালা পার্বনে আসতেন কখনও সখনও।’

‘দুর্ঘটনার দিন বিকালে কেউ এসেছিল কি?’

‘ভদ্র বারুনি এসেছিলেন, সন্ধ্যাকালে।’

‘বারুণি? তিনি কে? সন্ধ্যাকালে কি কারণে এসেছিলেন?’

‘তিনি একজন তরুন মূর্তিকার, ভারি সুন্দর পাথরের মূর্তি গড়েন; প্রভু ও প্রভুপত্নীর স্নেহধন্য। প্রভু গৃহে থাকলে প্রায়ই আসেন, তাঁর অবর্তমানেও আসেন মাঝে মাঝে। সেদিন কি কারণে এসেছিলেন বলতে পারিনা।’

‘কতক্ষণ ছিলেন বারুণি এই গৃহে সেদিন?’

‘সে আমার জানা নেই, প্রভু। তিনি আসার কিছু পরে, আমি তাঁর জন্য মিষ্টান্ন ও পানীয় নিয়ে আসি। রাতের আহার আগেই সম্পন্ন হয়েছিল, সেকারণে গৃহিনী আমাকে সেদিনকার মত কর্ম থেকে অব্যহতি দেন, আমি কুটিরে ফিরে যাই।’

‘তার মানে বারুণিকে গৃহ থেকে নিষ্কাষিত হতে তুমি দেখনি?’ চঞ্চলা সম্মতি জানায়।

'শ্রেষ্ঠানী গৃহে একলা থাকতেন যখন, তুমি রাত্রিকালে তাঁর সাথে থাকতে না?'

'সবসময় থাকতাম না।'

'সে কিরকম?'

'প্রভুপত্নী কখনও অসুস্থা হলে, বা একলা বোধ করলে থাকতে বলতেন আমায়, তাঁর শয়নকক্ষের মেঝেতে শয্যা পেতে রাত্রিবাস করতাম তখন। তবে, বাকীসময় নিজ কুটিরেই থাকি আমি।'

'এখানে একাই থাক? পরিবার নেই তোমার?'

'স্বামী আছে, বন্দরসংলগ্ন একটি পান্থশালায় সেবকের কর্ম করে সে, সেখানেই থাকে। সময়ে সময়ে, তার প্রভুর কাছে ছুটি নিয়ে আমার এখানে রাত্রিযাপন করে, আবার প্রভাতে ফিরে যায় কর্মক্ষেত্রে।'

'দুর্ঘটনার রাত্রিতে এসেছিল সে তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ, এসেছিল, কিন্তু আমি মূলগৃহে আসবার পূর্বেই স্থান ত্যাগ করে সে।' চঞ্চলা জানায় তার স্বামীর নাম অশ্বিন, বন্দরে তার কর্মস্থলের ঠিকানাও জানায় সে সেইসঙ্গে। এরপর বসুদত্তের গৃহ থেকে বিদায় নিয়ে সুদত্তের গৃহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন তিনজনে।

***

সুদত্তের গৃহে শোকের আবহ, ভগ্নহৃদয় জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সযত্নে আগলে রেখেছেন সুদত্ত ও তাঁর পত্নী। এই একদিবসেই বসুদত্তের বয়স যেন বৃদ্ধি পেয়েছে একযুগ, চোখের কোলে নিদ্রাহীনতার কালিমা, চিন্তার বলিরেখা কপালে। সুদত্তের গৃহের একটি বহির্কক্ষে তাঁর সাথে বাক্যালাপ শুরু করেন পুষ্পকেতু।

'অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনাকে বিব্রত করতে হল ভদ্র, এরজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।'

'আপনাদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য; বলুন কি জানতে চান?'

'বারুণি কে? আপনাদের সাথে তার কি আত্মীয়তার সম্পর্ক?' বসুদত্তের মুখের ভাবে বিস্ময় ফুটে ওঠে, কিছুটা সময় নিয়ে উত্তর দেন তিনি।

'ছেলেটি প্রতিভাবান শিল্পী, প্রার্জুন প্রদেশের একটি গ্রাম থেকে ভাগ্যের সন্ধানে এসেছিল পাটলীপুত্রে বছর দুয়েক আগে। প্রায় বৎসর খানেক অনেক চেষ্টা করেও যোগ্য সুযোগ পায়নি সে, ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে নগরীর পণ্যবিথীর পথে পথে নিজ শিল্পকর্ম সামান্য মূল্যে ফেরি করে ফিরত তখন। এরকমই একদিন, আমি তাকে দেখি, ছিন্ন বসন, রূক্ষচুল, অর্দ্ধাহারে শীর্ণ মুখশ্রী; দয়া পরবশ হয়ে তার পণ্য দেখতে চেয়েছিলাম, আর সেখানেই চমক লেগেছিল। কি অসধারণ সে সকল ক্ষুদ্র মূর্তির গঠনশৈলী, অপূর্ব তাদের মুখশ্রীর ব্যাঞ্জনা; ছেলেটির প্রতিভা সাধারণ নয়, বুঝেছিলাম আমার অভিজ্ঞতা থেকে। পরবর্তীকালে, তার উপযুক্ত বাসস্থান ও কর্মশালার ব্যবস্থা করি আমি, পরিচয় করিয়ে দেই স্থপতি বজ্রপানির সাথে। শুধু প্রতিভার কারণে নয়, তার সুদর্শন চেহারা ও মিষ্ট স্বভাবের গুণেও, আমার বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে উঠেছে সে বিগত এক বৎসরে। দুঃখের কথা কি জানেন, ওই হস্তিমুখ, যা আমার স্ত্রীর মৃত্যর কারণ হয়েছে, সেটি বারুণিরই সৃষ্টি।' কথাকটি বলে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন শ্রেষ্ঠী।

'আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর পশ্চাতে সে দেখা করেছে আপনার সাথে?'

'এত লোকের ভীড়ে সে এসেছিল কিনা বলতে পারিনা, তবে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেনি এখনও।'

'আপাততঃ আপনার কাছে আর কিছু জানবার নেই ভদ্র, আপনি বিশ্রাম করুন', পুষ্পকেতুর সম্মতি পেয়ে স্থান ত্যাগ করেন বসুদত্ত। সুদত্তের সাথে কথোপকথন শুরু হয় এরপরে।

'ওই অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটি কি বারুণির শিল্পকর্ম?' কক্ষের এককোণে রাখা একটি প্রায় তিনহাত উঁচু প্রস্তর মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করেন পুষ্পকেতু।

'হ্যাঁ, ভ্রাতা উপহার দিয়েছিলেন গত মেষ সংক্রান্তিতে।'

'অনন্য এর গঠনশৈলী! বারুণিকে আপনার ভ্রাতা সঠিক চিনেছেন সন্দেহ নেই।'

'বারুণির প্রতিভাকে চিনেছেন সত্য', সুদত্তের মন্তব্য যেন সুক্ষ্ম ইঙ্গিতবহ।

'বারুণির সম্পর্কে আপনার কি মত ভদ্র? পুষ্পকেতু তাঁর মন্তব্যের সূত্র ধরে প্রশ্ন করেন।

'প্রতিভাশালী হলেই অচেনা পুরুষকে গৃহে এনে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত বলে আমি মনে করি। বারুণি অজ্ঞাতকুলশীল।'

'ভদ্র বসুদত্তের অনুপস্থিতিতেও তার যাতায়াত ছিল আপনার ভ্রাতৃগৃহে, জানতেন সেকথা?'

'এবিষয়ে আমি কিছু জানিনা।' সুদত্ত এই প্রসঙ্গে অধিক কিছু বলতে আগ্রহী নন বোঝা যায়।

'দুর্ঘটনার দিন আপনি গিয়েছিলেন সে-গৃহে?'

'অপরাহ্নে বিপনি যাবার কালে গিয়েছিলাম অল্পক্ষণের জন্য। জ্যেষ্ঠ্য বন্দর হতে আগমনবার্তা পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে, সেই সংবাদ দিতে গিয়েছিলাম।'

'দেখা হয়েছিল শ্রেষ্ঠানীর সাথে?'

'হয়েছিল, তাঁকেই সংবাদ জানাই। জ্যেষ্ঠ্য দুএকদিন পরে গৃহে ফিরবেন জেনে বোধকরি আশাহত হয়েছিলেন তিনি।'

'আপনার স্বর্গতা ভাতৃবধূর সাথে আপনাদের পরিবারের সম্পর্ক কিরূপ ছিল?'

'তিনিও আমাদের পরিবারেরই একজন, কাজেই এ প্রশ্ন অর্থহীন', সুদত্তের উত্তরে ঈষৎ উষ্মা প্রকাশ পায়।

'পরিবারের অংশ হলে পৃথক গৃহে বাসের প্রয়োজন হয় কি ভদ্র? তদন্তের কারণে অনেক অপ্রিয় প্রশ্ন করতে হয় আমাদের, সহজ উত্তর দিলে ভ্রান্তধারণার সম্ভাবনা থাকেনা।'

'একসাথে বাস করলে সমবয়স্কা নারীদের মধ্যে অনেক সময় ঈর্ষাজনিত জটিলতা ঘটে থাকে, সেকারণেই পৃথক ব্যবস্থা। কিন্তু আমি জ্যেষ্ঠাকে কখনও অসম্মান করিনি, ভ্রাতার প্রবাস যাপনকালে সাধ্যমত খেয়াল রাখতাম তাঁর।'

'বুঝেছি। আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন, ভদ্র বসুদত্তের কোনও শত্রু আছে কি?'

'সম্পন্ন ব্যাবসায়ী, বিদেশে বাণিজ্য করেন, ব্যাবসায়িক প্রতিদ্বন্দিতা দ্বেষ, রাগের কারণ হতে পারে, কিন্তু শত্রুতা? না আমার সেরকম কিছু বোধ হয় না।' এরপরে পুষ্পকেতু সবান্ধব বিদায় নেন সুদত্তের গৃহ থেকে।

'আপনি এখনি একবার বারুণির খোঁজে লোক পাঠান ভদ্র, আমি কার্যালয়ে অপেক্ষায় থাকব। ধর্মদাসকে নির্দেশ দিয়ে উল্মুকের সাথে কার্যালয়ে রওয়ানা দেন কুমার।

'তুমি কি বারুণিকে সন্দেহ করছ কোনওভাবে?' পথিমধ্যে প্রশ্ন করেন উল্মুক।

'এইকাজ অর্থের লোভে ঘটেনি এ আমি নিশ্চিত। পালঙ্কের নীচের তৈজসের পেটিকা সামান্য তস্কর অবহেলা করতে পারত না। তাছাড়া এতবড় দুঃসংবাদ পেয়েও বারুণি বসুদত্তের কাছে এলো না কেন?'

'কিন্তু বারুণিরই বা স্বার্থ কি? আশ্রয়দাতার স্ত্রীকে হত্যা করলে, তার নিজের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।'

'কিছু বুঝতে পারছিনা বন্ধু, আগে তার সাথে বাক্যালাপ প্রয়োজন; সেই শ্রীজয়াকে শেষবারের মত জীবিত দেখেছিল।'

কিছুপরে ধর্মদাস সংবাদ আনেন, বারুণি গৃহ বা কর্মস্থল কোথাও নেই; প্রতিবেশীরা তাকে দুর্ঘটনার পরদিন থেকে আর দেখেনি।

***

বারুণির গৃহটি নগরবীথি সংলগ্ন গৃহস্থ পল্লীতে, একটি আম্রকুঞ্জের একপাশে। গৃহটি একতলবিশিষ্ট, তার একপাশে শয়ন ও বিশ্রামকক্ষ, অন্যপাশে কর্মশালা। আম্রকুঞ্জটি বসুদত্তের সম্পত্তি, গৃহটিও তিনিই নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন সন্দেহ থাকে না। বারুণি একাই থাকত সেখানে, রন্ধন ও গৃহকর্ম নিজেই করত সে।

গৃহের কপাটের অর্গল ভাঙ্গা হয় পুষ্পকেতুর নির্দেশে, এরপর ভিতরে প্রবেশ করেন পুষ্পকেতু, উল্মুক ও ধর্মদাস। শয়নকক্ষটি দেখে মনে হয়, বারুণি বিছানায় শয়ন করেনি নিরুদ্দেশ হবার পূর্বে, গভীর রাত্রে

পলায়ন করেছে সে দ্রূত প্রস্তুতি নিয়ে। একটি ক্ষুদ্র পেটিকার ডালা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, তার তালযন্ত্রটি কিছুদূরে বিক্ষিপ্ত। সম্ভবতঃ এটি তার সঞ্চিত অর্থের কোষ, যাবার কালে তাড়াতাড়িতে ভিতরকার সম্পদ বের করতেই এরূপ ঘটেছে। দেওয়ালের একপাশে রাখা বস্ত্র রাখবার উদবন্ধকটিও শূণ্য। বিশ্রামকক্ষটিতে তিন চারখানি পিঠিকা ভিন্ন কিছু নেই, দেওয়ালের কুরুঙ্গীতে লক্ষীজনার্দনের মূর্তির সমুখে কয়েকদিনের বাসি ফুলের মালা শুকিয়ে আছে। এরপর, কর্মশালায় যান সকলে, সেখানে ঢুকতেই একখানি মাঝারি উচ্চতার পূর্নাঙ্গ যক্ষিণী মুর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূর্তির কাজ এখনও অসমাপ্ত, তবু তার দেহ বিভঙ্গ ও মুখশ্রী পূর্ণতা লাভ করেছে; মূর্তিটি একটি অনুপম ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, মুগ্ধ চোখে সেইদিকে চেয়ে থাকেন তিনজনেই।

‘এই মূর্তি পরিণতি পাবে না ভেবে ক্ষেদ হচ্ছে মনে, ‘ মন্তব্য করেন উল্মুক।

‘যক্ষিনীর মুখশ্রী কোথাও যেন দেখেছি পূর্বে, পরিচিত ঠেকছে’, পুষ্পকেতু মূর্তিটি ভালোভাবে পরীক্ষা করতে করতে কতকটা স্বগোগক্তি করেন।

‘নটী সুরসেনী; এমূর্তি তারই’, ধর্মদাস পুষ্পকেতুর উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন।

‘আপনি কি নর্তকীশ্রেষ্ঠা সুরসেনীর কথা বলছেন ভদ্র? বিগত বসন্তোৎসবে রাজসভায় দেখেছিলাম তার নৃত্য। হতে পারে এ তারই মুখচ্ছবি, দেহভঙ্গিমাটিও অবিকল নৃত্যের আঙ্গিকে গঠিত হয়েছে।’

‘অর্থের বিনিময়ে মূর্তি গড়ার কাজ করত বারুণি, নটীর মূর্তি সেকারণেই হয়তো’, উল্মুক বলে ওঠেন।

এরপর, কক্ষের বাকি বস্তু পরীক্ষা শেষে গৃহের পিছন দিকের দ্বার পরীক্ষা করেন পুষ্পকেতু। সমুখের দ্বারটি ছিল ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ, কিন্তু পিছনকার দরজাটি বাইরে থেকে শেকল দিয়ে বাঁধা; বারুণি রাতের অন্ধকারে পিছনের দ্বার দিয়ে চুপিসাড়ে নিষ্ক্রান্ত হয়েহে সন্দেহ থাকেনা এথেকে। অতঃপর ধর্মদাসকে নিখোঁজ বারুণির সংবাদ সংগ্রহের নির্দেশ দিয়ে গৃহের ফেরার উদ্যোগ করেন কুমার। রহস্যভেদে বারুণির সন্ধান পাওয়া আবশ্যক, এবিষয়ে সন্দেহ থাকেনা কারও।

‘বারুণি হত্যা করে নিরুদ্দেশ হয়েছে একথা স্পষ্ট, কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য বুঝলে কিছু?’ পথে প্রশ্ন করেন উল্মুক।

‘হত্যা পূর্বপরিকল্পিত নয়, আচমকা মূহূর্ত্তের উত্তেজনায় ঘটে গেছে; সেকারণেই এত দ্রূত রাত্রির অন্ধকারে স্থান ত্যাগ করতে হয়েছে বারুণিকে।’

‘কিন্তু এই আকস্মাৎ কলহের পিছনে একটা যুক্তি তো থাকবে?’

‘নিশ্চিত করে কিছু বলা শক্ত, তবে ঈর্ষা একটি কারণ হলেও হতে পারে। অনৈতিক প্রেমের অনিশ্চয়তায় সন্দেহের কাঁটা থাকেই, বিশেষ করে প্রেমিকটি যদি বারুণির মত একজন আকর্ষণীয় পুরুষ হয়।’

‘বুঝলাম!’

‘কি বুঝলে?’

‘বুঝলাম, কেন তুমি নৈতিক, অনৈতিক সকল প্রকার প্রেমেরই ঘোর বিরোধী।’

‘বটে!’ তারুণ্যের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় হেসে ওঠেন দুই মিত্র।

বারুণির খোঁজে বিভিন্ন দিশার রাজমার্গের জলসত্রগুলিতে সংবাদ পাঠানো হয় অশ্বারোহী দূতের সাহায্যে, বন্দর সংলগ্ন পান্থশালাগুলিতেও শুরু হয় অনুসন্ধান। ধর্মদাস ইতিমধ্যে সুরসেনীর সাথে সাক্ষাৎ করে মূর্তি বিষয়ে সংবাদ আনেন; মহামাত্য জয়দ্রথের অর্থ আনুকুল্যে বারুণি কার্যটি গ্রহণ করেছিল, জয়দ্রথ নর্তকীর পৃষ্ঠপোষক। সেই সূত্রে নটীর নিয়মিত যাতায়াত ছিল বারুণির গৃহে, পরবর্তীকালে বারুণিও যেত সুরসেনীর গৃহে। লোকমতে, নটী বিশেষ কৃপার চক্ষে দেখতে শুরু করেছিল তাকে বিগত কিছুদিন যাবৎ, সুদর্শন যুবক তায় প্রতিভাশালী, এবিষয়ে আশ্চর্যের কিছু নেই।

***

নবান্ন উৎসবের প্রথম দিন, নিকটবর্তী মন্দিরে দেবী অন্নপূর্ণার আরাধনা শেষে ঘন্টাধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে বৈশ্যপল্লী। নূতন শস্য ফলন উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী এই উদযাপনে প্রতি বৎসরের মতই মেতে উঠেছে সমগ্র মগধ, পাটলীপুত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। নূতন বস্ত্র, বিশেষ ব্যাঞ্জন, প্রীতি উপহার বিনিময়, এসবই উৎসবের অঙ্গ। অপরাহ্নের শেষ প্রহর, গোধূলির আবছায়া আলোকে সুপরিসর কক্ষটি কিছুটা নিষ্প্রভ, দ্বীপের আলো এনেও ভূজঙ্গ দ্বিধাভরে ফিরে গেছে কিছু আগে; কক্ষের একান্তে বসুদত্তের আত্মমগ্নতায় ব্যাঘাত ঘটাতে চায়নি সে। গৃহদেবতা জনার্দনের পূজা সেরে সুদত্ত ও তাঁর পত্নী উপলা প্রসাদের মিষ্টান্ন সাথে বসুদত্তের গৃহে আসেন সৌজন্য বিনিময়ের উদ্দেশ্যে, ভূজঙ্গ তাঁদের অতিথি কক্ষে নিয়ে যায়, সেস্থানেই বসবাস করছেন বসুদত্ত দুর্ঘটনার পশ্চাতে। কক্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ান সুদত্ত, হাতের ইশারায় ভূজঙ্গকে যেতে বলেন তিনি। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বসুদত্ত, অস্তগামী সূর্যের ম্লান আভায় বড় অসহায় প্রৌঢ়ের মুখখানি, জগতের সমস্ত আলোক শুষে নিয়ে বুঝি চলে গিয়েছে শ্রীজয়া, শ্রেষ্ঠীর জীবন এতদিনে সত্যিই সায়াহ্নঘন।

‘শুভদিনে অন্ধকারে কেন অগ্রজ?’ সুদত্তের কণ্ঠস্বর আবেগে আদ্র শোনায়।

‘কে? সুদত্ত? আমার জীবনে এখন শুধুই অন্ধকার, সকল দিবসই অশুভ।’

‘একথা বলবেননা দেব, দুর্দিন কেটে যাবে নিশ্চয়, যা গেছে তা ভুলে থাকাতেই মঙ্গল।’

‘জীবনের অধিকাংশ কাল একা ছিলাম, কিন্তু এত নিঃসঙ্গ বোধ করিনি কখনও। স্ত্রীর মৃত্যু হয়তো ভুলে থাকা যায়, কিন্তু এই মৃত্যুকে ঘিরে যে গুঞ্জন উঠেছে সমাজে, তাকে অগ্রাহ্য করি কেমন করে?’

সুদত্ত উত্তর দিতে পারেননা এই বাক্যের, বিব্রত দেখায় তাঁকে। কিছু সময় পরে অগ্রজকে একান্তে থাকার সুযোগ দিয়ে সস্ত্রীক প্রস্থান করেন তিনি।

***

কেটে গেছে দীর্ঘ একমাস, বারুণির সন্ধান পাওয়া যায়নি কোথাও। একদিন অপরাহ্নে, নগরীর এক মণিকার বাসুদেবের কাছে একটি দুর্মূল্য রত্নহার নিয়ে উপস্থিত হয় চঞ্চলার স্বামী অশ্বিন, হারটি বিক্রয় করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তার মত নগন্য ব্যক্তির কাছে দুষ্প্রাপ্য মারকতমণি খচিত মালা দেখে বাসুদেবের সন্দেহ জাগে; শ্রীজয়ার হত্যার পশ্চাতে নগরীর রত্নব্যবসায়ীদের গহনার তালিকা পাঠিয়ে সজাগ থাকতে বলা হয়েছিল দণ্ডনায়কের কার্যালয় থেকে। অশ্বিনের মালাটি তালিকাভুক্ত সামগ্রীর থেকে ভিন্ন, তবুও শ্রেষ্ঠী দণ্ডালয়ে খবর পাঠানো উচিৎ মনে করেন। জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে অশ্বিন জানায়, পান্থশালায় এক বিদেশী বণিক তার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে এই হারটি উপহার স্বরূপ দান করেছিলেন। বণিকের নাম চতুর্ভুজ, তিনি কলিঙ্গের অধিবাসী, পেশায় তৈজস ব্যবসায়ী; পান্থশালার অধিকর্তা্র কাছ থেকে জানা যায়, বণিক সত্যই পক্ষকাল অতিথি ছিলেন তার আলয়ে, সেসময়ে অশ্বিন তাঁর সেবার দায়িত্বে ছিল। অশ্বিন একজন দক্ষ কর্মচারী, সেকারণেই মানী অতথিদের দেখাশোনার দায়িত্ব পেয়ে থাকে সে, সেবায় তুষ্ট হয়ে উপহার ও পারিতোষিক দেওয়া স্বাভাবিক ঘটনা, তবে চতুর্ভুজ মনিহার উপহার দিয়েছিলেন কিনা, সেব্যাপারে পান্থশালাপতি কিছু জানেন না। এরপরে, কার্যালয়ে অশ্বিনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন পুষ্পকেতু।

‘শ্রেষ্ঠী চুতুর্ভুজ খুশি হয়ে ওই মূল্যবান কণ্ঠহার দিলেন?’

‘হ্যাঁ প্রভু।’

‘এর পূর্বে এ জাতীয় উপহার পেয়েছ কখনও?’

‘উপহার পেয়েছি ছোটখাটো, তবে সেগুলি এত মূল্যবান কিছু নয়।’

‘তোমার মনে বিস্ময় জাগে নি শ্রেষ্ঠীর এরূপ আচরণে?’

‘বিস্মিত হয়েছিলাম প্রভু, কিন্তু এখানে এসে অবধি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি, উদরপীড়া, দাস্ত; আমি স্বহস্তে শুশ্রুষা করেছিলাম তাঁর, হয়তো সেকারণেই এই কৃপা। তিনি ধনবান ব্যক্তি।’

‘শুধু ধনবান নয়, হৃদয়বানও বটে; শুশ্রুষায় তুষ্ট হয়ে অর্থমূল্যে কৃতজ্ঞতা জানানোই স্বাভাবিক ছিল না কি? তুমি দরিদ্র, রত্নহারের চেয়ে মুদ্রা অধিক উপযোগী হোত।’

‘শ্রেষ্ঠী কি ভেবেছিলেন, আমি তা কিরূপে বলি প্রভু?’

‘তোমার একবারও মনে হয়নি, মালাটি বিক্রয় করতে গেলে বিপদে পড়তে পারো?’

‘না, আমার মনে পাপ নেই , সেকারণেই হয়নি।’

‘শ্রেষ্ঠী পাটলীপুত্র ত্যাগ করেছেন দশদিন পূর্বে, এতদিন বাদে হার বিক্রয়ে উদ্যোগী হলে কেন?’ এর উত্তরে চুপ করে থাকে অশ্বিন।

‘আমি যদি বলি, তুমি অপেক্ষায় ছিলে, শ্রেষ্ঠী দূরান্তে পাড়ি দিলে তোমার বাক্যের সত্যতা পরীক্ষার অবকাশ থাকবে না।’এতক্ষণে কুমারের স্বরে কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

‘এ আপনি কি বলছেন প্রভু!’

‘বিস্মিত হবার ভান কোরনা অশ্বিন! মনিহারটির মারকত মণিগুলি মিশরীয় ছাঁদে কাটা, গহনাটি সেদেশে তৈয়ার হয়েছে নিঃসন্দেহে। এত মূল্যবান কণ্ঠহার, অনেক ধনবানের সংগ্রহেও থাকেনা, আর চতুর্ভুজ এরূপ দুর্লভ বস্তু তোমাকে পারিতোষিক দিলেন, আমাকে বিশ্বাস করতে বল সেকথা?’ গর্জে ওঠেন পুষ্পকেতু।

এর উত্তরে হাহাকারে ভেঙ্গে পড়ে আশ্বিন, কিন্তু নিজ বক্তব্যে অটল থাকে সে। আপাততঃ তাকে কারারূদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে পিতার সাথে আলোচনায় বসেন কুমার।

‘গহনার লোভে খুন করেছে অশ্বিন তুমি কি সেরকমই সন্দেহ করছ? সেক্ষেত্রে বারুণি পলায়ন করল কেন?’ বিশাখগুপ্তকে বিহবল দেখায়।

‘হতে পারে, বারুণির আগমনের পূর্বেই অশ্বিন হত্যা করেছিল শ্রীজয়াকে; বারুণি মৃতদেহ আবিষ্কার করে শঙ্কিত হয়ে পলায়ন করে। অভুক্ত মিষ্টান্নের থালিকা হয়তো চঞ্চলাই রেখেছিল শয়নকক্ষে, বারুণিকে দোষী সাব্যস্ত করতে।’

‘এক সামান্যা দাসীর এত বুদ্ধি হবে?’

‘দাসীর না হোক, পান্থশালার অভিজ্ঞ সেবকের সে বুদ্ধি থাকাই স্বাভাবিক। হারটি কখনও অশ্বিন সহজপথে লাভ করেনি, এব্যাপারে আমি নিশ্চিত।’

‘কিন্তু এই হারটি যে শ্রীজয়ার, সেপ্রমাণও তো মেলেনি। চঞ্চলা, ভূজঙ্গ, সুদত্ত এবং বসুদত্ত, সকলেই এই হার পূর্বে দেখেনি বলে জানিয়েছে।’

‘এবিষয়ে বেশ কয়েকটি সম্ভাবনার কথা ভেবেছি আমি। বসুদত্তের অবর্তমানে কোনও গোপন প্রণয়ী হারটি উপহার দিয়ে থাকলে, বসুদত্ত সেকথা জানবেননা। সে গোপন প্রণয়ী বারুণি হতেই পারে, নটী সুরসেনীর আনুকুল্যে এই রত্নহার তার কাছে সুলভ হয়ে থাকবে। তবে, বারুণি ছাড়া অন্য কেউও দিয়ে থাকতে পারে এই হার। সুদত্ত বয়সে যুবক, সুদর্শন, অর্থবান, শ্রীজয়ার প্রতি তাঁরও আসক্তি থাকা সম্ভব, মনিহার সংগ্রহের সুযোগ ও সামর্থ দুইই তাঁর ছিল। সুদত্ত পত্নী যে শ্রীজয়ার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেননা, এথেকেই প্রমান হয়, দেবর-ভাতৃজায়ার সম্পর্ক নিয়ে তাঁর মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল।

হত্যাটি যদি অশ্বিনই ঘটিয়ে থাকে, তবে খুব সম্ভব হারটি ওইদিনই শ্রীজয়াকে কেউ উপহার দিয়েছিল। মণিহারের অনুপম সৌন্দর্যের ব্যাখ্যান চঞ্চলাই করে থাকবে তার স্বামীর কাছে সেদিন সায়াহ্নে। আর তারপরেই, লোভের বশবর্তী হয়ে এই হত্যা। হয়তো বারুণির আচমকা আগমনে তার উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করে চঞ্চলা অশ্বিনের পরামর্শে।’

‘কিন্তু এ সকলি তো তোমার অনুমান কেতু, প্রমাণ করবে কিরূপে?’ বিশাখগুপ্তকে চিন্তিত দেখায়।

'আমাকে কয়েকদিন সময় দিন পিতা, আমার মন বলছে, সত্যের সন্ধান মিলবেই।'

***

পরদিন কণ্ঠহারটি ধর্মদাস সুরসেনীর কাছে নিয়ে যান, সুরসেনী সেটিকে কখনও দেখেনি বলে জানায়। সে সত্যই হার বিষয়ে কিছু জানে না অথবা হত্যার সাথে দূরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে অস্বীকার করছে, এব্যাপারে সংশয় থেকেই যায়।

'জ্যেষ্ঠানীর সাথে আপনার সম্পর্ক কিরূপ ছিল?' উপলাকে তাঁর গৃহের একান্তে প্রশ্ন করেন পুষ্পকেতু।

'তেমন বিশেষ সখিত্ব কিছু ছিল না।'

'কিন্তু কেন? আপনারা তো সমবয়সী, নিকট আত্মীয়া, অন্তরঙ্গতা থাকাই স্বাভাবিক ছিল না কি?'

'তিনি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, অপর নারীর বন্ধুতায় আগ্রহী ছিলেননা।'

'আর অপর পুরুষের?' কুমারের এই প্রশ্নে চমকে ওঠেন উপলা, ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর মুখ।

'এপ্রশ্নের উত্তরে আমি কি বলব, আপনারাই অনুসন্ধান করে জেনেছেন সকল কথা।'

'হ্যাঁ বারুণির কথা জেনেছি সত্য, কিন্তু আরও বেশী কিছু জানবার আশায় এসেছি আপনার কাছে। ভালো কথা, রত্নহারটি একবার পরীক্ষা করে দেখুন তো, পূর্বে দেখেছেন কি এটি? আমার সন্দেহ শ্রীজয়াকে উপহার দিয়েছিল কেউ এ হার, তবে সে বারুণি নয়', হারটি উপলার সমুখে তুলে ধরে অর্থপূর্ণ ভাবে তাকান পুষ্পকেতু। দীর্ঘক্ষণ গহনাটির দিকে চেয়ে থাকেন উপলা, তাঁর মুখের ভাব কঠিন হয়ে ওঠে ক্রমে।

'যে নারী গহনা ও স্বাচ্ছন্দের লোভে পিতৃতুল্য পুরুষকে প্রলুব্ধ করে বিবাহ করে, তার কাছে কোনও পুরুষই নিরাপদ নয়। এর বেশী আমার আর কিছু বলার নেই; এখন আমাকে একটু একলা থাকতে দিন আর্য।' কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসে উপলার, পুষ্পকেতু নীরবে বিদায় নেন সেখান থেকে।

'এই ভাণ্ডার গৃহে আপনি কতদিন কর্ম করছেন?' বসুদত্তের অধীনস্থ কর্মী প্রবীণ বিটঙ্ককে প্রশ্ন করছেন পুষ্পকেতু, সাথে আছেন মিত্র উল্মুক। কথাবার্তা চলছে ভাণ্ডার গৃহের কার্যালয়ে, শ্রেষ্ঠী বসুদত্তের অনুপস্থিতিতে বিটঙ্কই কার্য নির্বাহ করছেন সেখানে।

'কয়েকযুগ ধরেই আমি প্রভু বসুদত্তের অন্নদাস, তাঁর পিতা আমাকে কর্ম দিয়েছিলেন সেই তরুণ বয়সে।'

'সেক্ষেত্রে, ব্যবসায় বিষয়ে আপনিই শ্রেষ্ঠীর ঘনিষ্ঠতম সহায়ক, তাঁর কোনও শত্রু আছে কিনা বলতে পারেন?'

'ব্যবসায়িক শত্রুতা থাকলেও ব্যক্তিগত অনিষ্ট করার মত কাউকে মনে পড়ছে না। প্রভু অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি, জ্ঞানে- অজ্ঞানে কারোকে আঘাত করার মানুষ নন তিনি। চিরকাল নিজ সুখের চিন্তা বর্জন করে পরিবার পালন করেছেন, প্রৌঢ় বয়সে এসে সংসারী হয়েছিলেন অবশেষে; সে সুখও কপালে সইল না।' কথাকটি বলে চোখ মোছেন প্রভুভক্ত কর্মচারী।

'বসুদত্তের ব্যবসায়িক অবস্থা কিরূপ?'

'প্রভু, লক্ষীর বরপুত্র, অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী। বিশেষতঃ এবারের বাণিজ্যে প্রভূত ধনলাভ ঘটেছে, অথচ, দেখুন গৃহলক্ষীই গত হলেন।'

বিটঙ্কের কাছে বিদায় নিয়ে ঋভুকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অতিথিশালায় যান পুষ্পকেতু, ঋভু সেসময় সেখানেই ব্যস্ত ছিল। অতিথিশালার বহির্কক্ষটিতে বার্তালাপ শুরু হয়।

'কতদিন কর্ম করছ এখানে?'

'ছোটকাল থেকেই আছি, পিতাও এখানেই কর্ম করতেন।'

'অতিথিশালায় কি প্রায়ই অতিথির আগমন ঘটে?'

'হ্যাঁ, প্রভুর পাটলীপুত্রে অবস্থানকালে প্রায়ই অতিথি সমাগম হয়; বেশিরভাগই তাঁর বন্ধু স্থানীয় শ্রেষ্ঠী।'

'সম্মানিত অতিথিদের গৃহে আতিথ্য না দিয়ে এখানে রাখেন কেন বসুদত্ত?'

'সে বিষয়ে তো কিছু জানিনা দেব; তবে সচরাচর গৃহে কাউকে নিয়ে যেতে পছন্দ করেননা তিনি।'

'এই ভাদ্রে যেদিন তিনি ফিরলেন, তাঁর আগমনবার্তা কে নিয়ে গিয়েছিল গৃহে?'

'সংবাদ আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম দেব, তবে প্রভু সুদত্তের সাথে সাক্ষাৎ হয় গৃহের সমুখে, তখন তাঁকেই বার্তা দেই, আর ভূজঙ্গের সাহায্যে অশ্বশাল থেকে প্রভুর অশ্বটিকে তৈয়ার করে বন্দরে নিয়ে আসি।'

'সুদত্ত সংবাদ পাবার পূর্বেই ভ্রাতার গৃহে চলেছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমাকে দেখে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হন তিনি, পরে সকল কথা শুনে, অশ্ব নিয়ে বন্দরে ফিরতে নির্দেশ দেন; গৃহস্বামিনীকে বার্তা তিনিই দিয়ে দেবেন বলে জানান।'

'সে রাত্রে গৃহে ফেরার কোনও উদ্যোগ নেননি শ্রেষ্ঠী?'

'হয়তো, সম্ভব হলে গৃহে ফেরার ইচ্ছে ছিল, সেকারণেই অশ্বটিকে আনিয়ে রেখেছিলেন পূর্বাহ্ণেই। কিন্তু আগত পণ্যের বন্দোবস্ত করতেই দিন গত হল, সূর্যাস্তের পশ্চাতে তোরণদ্বার বন্ধ হয়ে যায়, তখন কিরূপে গৃহে যাবেন? আমাকে বললেন অশ্বটিকে অতিথিশালের আস্তাবলে বেঁধে রাখতে, পরদিন মধ্যাহ্নে, সব কাজ সাঙ্গ করে গৃহে ফিরবেন তিনি।'

'সবই নিয়তি হে, বসুদত্ত যদি সময়মত গৃহে ফিরতে পারতেন সেদিন সন্ধ্যায়, হয়তো শ্রীজয়া রক্ষা পেতো' নগরীতে ফেরার কালে উল্মুক মন্তব্য করেন।

'তা ঠিক, কিন্তু একটা কথা জানা গেলো, সেদিন সুদত্ত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যেই শ্রীজয়ার কাছে গিয়েছিলেন, জ্যেষ্ঠের আগমনবার্তা দিতে নয়।'

'তুমি কি মনে কর, মনিহার দিতেই গিয়েছিল সে?'

'অসম্ভব নয়!' পুষ্পকেতু অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেন।

'বসুদত্ত ব্যক্তিটি সন্দেহপ্রবণ, তরুণী ভার্যাকে পরিচিত মহল থেকে দূরে রাখতে চাইতেন। অথচ, যুবক বারুণিকে গৃহে প্রবাশাধিকার দিতে বাধেনি; এটা আশ্চর্যের নয়?'

'মনুষ্য চরিত্র বোঝা কঠিন বন্ধু; আমার ধারণা বারুণির প্রতি তিনি অপত্যস্নেহ পোষন করতেন, সঠিক সময়ে সংসারী হলে তার বয়সী পুত্র থাকা অসম্ভব ছিল না প্রৌঢ়ের। সেকারণেই তার দিক থেকে কোনও আশঙ্কার চিন্তা মনে আসেনি তাঁর।'

'একটা কথা ভাবছি কেতু, বারুণি রাতের আঁধারে নগরী ত্যাগ করল কি উপায়ে? রাত্রে তোরণ দ্বার বন্ধ থাকে।'

'একটি সম্ভাবনা হল, সে তোরণের কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষায় ছিল, ভোর হতে দ্বার খোলা পেয়ে নগরী ত্যাগ করেছে। নতুবা, তার কাছে বিশেষ ছাড়পত্র আছে, সেটির বলে রাত্রেই পদব্রজে তোরণ পার হয়েছে সে। স্থপতি বজ্রপাণির অধীনস্থ কারুশিল্পী, উপরন্তু সুরসেনীর প্রেমিক; এদের দুজনের কেউই ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করিয়ে থাকতে পারে তার জন্য। একবার তোরণ প্রহরীদের সাথে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন এব্যাপারে।' চিন্তিত মুখে কথাগুলি বলেন পুষ্পকেতু, এরপর আর কথা এগোয় না, নীরবে অশ্বপৃষ্ঠে বাকি পথ সাঙ্গ করেন দুই বন্ধু।

***

সেদিন অপরাহ্ণে তোরণ প্রতিহারির কার্যালয়ে গিয়ে দেখা করেন কুমার একাকী, প্রতিহারির সাহায্যে সেখানকার ভাদ্রমাসের দিনপুস্তটি পরীক্ষা করেন তিনি। রাত্রে ছাড়পত্রের সাহায্যে তোরণের ক্ষুদ্রদ্বার অতিক্রম করতে হলে, ওই দিনপুস্তে প্রহরী যাত্রীর নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করে। পরীক্ষা শেষে নীরবে স্থান ত্যাগ করেন পুষ্পকেতু, রহস্য ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে সন্দেহ থাকেনা।

দুই দিন পরে বারুণির সংবাদ নিয়ে আসেন ধর্মদাস; নিজ পরিচয় গোপন রাখতে রাজপথ এড়িয়ে বনবীথি ও গ্রাম্য পথ বেয়ে পদব্রজে যাত্রা করেছিল সে উজ্জয়িনীর পথে। কিন্তু পথে অনাহার ও অনিদ্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ায়, বোধ করি প্রাণের মায়ায় রাজপথের একটি জলসত্রের কাছাকাছি গিয়ে সংজ্ঞা হারায় সে। এক বণিক দয়া পরবশ হয়ে তাকে জলসত্রের ভিতরে নিয়ে যান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সেখান থেকেই তার পরিচয় প্রকাশ পায় ও নিকটবর্তী দণ্ডাধিকারিক সংবাদ পাঠান পাটলীপুত্রে।

***

বারুণিকে আনা হয়েছে পাটলীপুত্রে, মহাদণ্ডনায়কের কার্যালয়ে; তার শীর্ণ রোগক্লিষ্ট চেহারা দেখে পূর্বের সুদর্শন যুবককে কল্পনা করতে কষ্ট হয়। স্বাস্থের সাথে তার মনবলও ভেঙ্গে পড়েছে সম্পূর্ণ ভাবে, আধিকারিকদের যে কোনো প্রশ্নের উত্তরেই কেবল ক্রন্দন করে চলেছে সে। পুষ্পকেতুর অনুরোধে তার জন্য উত্তম খাদ্য ও বিশ্রামের সুযোগ করে দেন বিশাখগুপ্ত; কয়েকদিন বিশ্রামের পশ্চাতে বিচারসভা বসে কার্যালয়ে।

বিচারসভার মধ্যমণি দণ্ডনায়ক বিশাখগুপ্ত, যদিও দোষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন কুমার পুষ্পকেতু। সভাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন ধর্মদাস, চিত্রক সহ কয়েকজন বিশিষ্ট আধিকারিক; উল্মুকও দর্শকাসনে রয়েছেন একপাশে। এছাড়া রয়েছেন বসুদত্ত, সুদত্ত; সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্যে ডাকা হয়েছে ভূজঙ্গ ও চঞ্চলাকে। চঞ্চলার পূর্বের শ্রী আর নেই, তার চোখে মুখে নিদারুন আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। অভিযুক্ত দুইজন, বারুণি ও অশ্বিন, কারাগার থেকে একসাথেই আনা হয় তাদের সভাস্থলে।

'অশ্বিন, শেষবারের মত জিজ্ঞাসা করছি, মনিহারটি কোথায় পেলে তুমি? সত্য গোপন করায় অশেষ দুর্ভোগ, এখনও সেকথা বুঝে না থাকলে পরিণাম কঠিন হবে তোমার।' গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন শুরু করেন পুষ্পকেতু। অশ্বিন চুপ করে থাকে উত্তরে, তবে তার চোখে মুখে দ্বিধা ফুটে ওঠে।

'বারুণির আগমনের পূর্বেই হত্যা করেছিলে গৃহস্বামিনীকে? চঞ্চলা সাথে ছিল, না একা কার্যসিদ্ধ করেছিলে?' এবারের প্রশ্ন শুনে দুই বন্দীই চমকে ওঠে নিদারুণ ভাবে। অভিযোগ অস্বীকার করে হাহাকারে ভেঙ্গে পড়ে অশ্বিন, আর বারুণি বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে।

'বেশ, মেনে নিলাম হত্যা তুমি করোনি, হত্যা করেছে বারুণি, কিন্তু মনিহার কি হত্যার পশ্চাতে নিয়েছিলে না পূর্বেই?'

কিছুটা সময় নিয়ে মনস্থির করে অশ্বিন ও তারপরে সে যা জানায় তা এই প্রকার।

দুর্ঘটনার পরদিন যথারীতি ভোর হতে কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছিল সে, কিন্তু বেলা বাড়তে হত্যার সংবাদ কানে আসে; চঞ্চলা বিপদে আছে অনুমান করে পরদিন রাত্রেও সে ফিরে আসে আবার। সেসময় চঞ্চলা তাকে মনিহারটি দেখায়, সেটি সে মৃতদেহ থেকে কিছু দূরে দ্বারের পিছনে একটি রেশম থলিকায় কুড়িয়ে পেয়েছিল, যখন ভূজঙ্গ সুদত্তকে ডাকতে যায়। এই অসামান্য গহনাটি যে শ্রীজয়ার সম্ভারের নবতম সংযোজন, গোপন উপহার, সেকথা বুঝতে পেরে লোভ মাথা চাড়া দেয়, চঞ্চলা হস্তগত করে সেটি। অশ্বিন প্রথমে ভীত হয়ে গহনাটি পরিত্যাগ করতে বলে চঞ্চলাকে, কিন্তু অবশেষে লোভের কাছে পরাজিত হয় এবং কিছুকাল অপেক্ষা করে সেটি বিক্রয়ের চেষ্টা করে। মনিহার যে বিদেশ থেকে লব্ধ এবং অতি দুর্মূল্য, সেকথা বুঝতে পারেনি অশ্বিন, আর তাতেই এই বিপত্তি।

'এবার তুমি বল, শ্রেষ্ঠাণীকে হত্যা করলে কিভাবে?' বারুণির দিকে প্রশ্নবান ছুঁড়ে দেন পুষ্পকেতু। বারুণি অস্বীকার করেনা এই অভিযোগ, বরং নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে ধীরস্বরে বর্ণনা করে সেদিনকার ঘটনা।

'শ্রেষ্ঠীর অনুপস্থিতিতে তাঁর গৃহে যাতায়াত ছিল আমার, প্রথম প্রথম আমি আগ্রহী ছিলাম না, প্রভু অনেক করেছেন আমার জন্য, তাঁর সাথে তঞ্চকতা করতে ইচ্ছা হয়নি। কিন্তু শ্রীজয়া সর্বশক্তি দিয়ে আকর্ষণ

করেছিল আমায়, ক্রমশঃ নির্বল হয়ে আত্মসমর্পন করি আমি তার আবেগের কাছে। দুর্ঘটনার দিন শ্রেষ্ঠীগৃহে যাব পূর্ব থেকে স্থির ছিল, সেইমত সায়াহ্নকালে উপস্থিত হই আমি যথারীতি; গিয়ে শুনি শ্রেষ্ঠী বন্দরে প্রত্যাবর্তন করেছেন, গৃহে ফিরবেন পরদিন। শুরু থেকেই সেদিন শ্রীজয়ার মনভাব ছিল অভিমানপূর্ণ, একেলা জীবন, বৃদ্ধ স্বামী, এসকল কিছু নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিল সে। বেশ কিছুদিন থেকেই আমাকে উদ্বুদ্ধ করছিল সে, তাকে সঙ্গী করে দূরদেশে পলায়নের জন্য; আমি রাজী হতে চাইনি। ওইদিনও সেই প্রসঙ্গে আবার আলোচনা শুরু করে শ্রীজয়া, আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি, সে মানতে চায়না। অবশেষে, সে অনুযোগ করে সুরসেনীর কারণেই আমি তার প্রস্তাবে রাজী নই; এ অভিযোগ আমি অস্বীকার করি। এ নিয়ে তর্ক চলতে থাকে এবং ক্রমে তা কলহের রূপ নেয়। শ্রীজয়ার অবিশ্রান্ত অনুযোগে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ি আমি, ততক্ষণে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর গতপ্রায়, আমি বিদায় নিতে চাই। শ্রীজয়া ক্রুদ্ধ হয়ে আমার পথ আটকাতে চায়, নানা কটুবাক্যে জর্জরিত করে সে আমাকে, আমিও ধৈর্য হারিয়ে তাকে সবলে পরিসারিত করি। আঘাত সামলাতে না পেরে দেওয়ালে আছড়ে পড়ে সে, আর সেইসঙ্গে দেওয়ালে সংযুক্ত হস্তিমুখে সজোরে বিদ্ধ হয় তার মস্তক। রক্তাক্ত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে শ্রীজয়া নিষ্প্রাণ মূর্তির মত, আমি তাকে উজ্জিবীত করার চেষ্টা করি কয়েকবার, কিন্তু ফল হয়না কোনও। তখন প্রবল ভয় ও আশঙ্কায় বিভ্রান্ত হয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করি; সেসময় পলায়ন ছাড়া আর কোনও উপায়ের কথা ভাবতে পারিনি। অন্ধকারে তস্করের মত নিজগৃহে ফিরে যা কিছু সম্বল একত্র করে পিছন দ্বার দিয়ে প্রস্থান করি; নগর তোরণ থেকে কিছু দূরে একটি বটবৃক্ষের আড়ালে রাত্রিযাপন করে ভোর হতে নগরী পরিত্যাগ করি এরপর। বাকি ইতিহাস সবই আপনারা জানেন।' কথাগুলি বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বারুণি, যেন তার শেষ শক্তিটুকুও নিঃশেষিত হয়েছে এই স্বীকারোক্তি কালে। বক্তব্য শুনতে শুনতে বসুদত্তের চক্ষু শ্বাপদের মত জ্বলে ওঠে পত্নীর অপমানে, সুদত্তের মুখও অসম্মান ও ক্রোধে জলদগম্ভীর।

'আশঙ্কা যতই তীব্র হোক, শ্রেষ্ঠাণীর মূল্যবান গহনা অপসারণ করতে ভুল হয়নি, কি বল?' পুষ্পকেতু বারুণির প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করে ওঠেন।

'গহনা? কই নাতো? বিশ্বাস করুন আর্য, আমি কোনও গহনা চুরি করিনি। আমি কৃতঘ্ন, পাপী, কিন্তু তস্কর নই।'

'তাহলে তোমার মতে, মস্তকে আঘাত নিয়ে ভূপতিত হন শ্রীজয়া, তাঁর মৃত্যু হয়েছে ধরে নিয়ে তুমি স্থান ত্যাগ কর এই তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। কারণ এ যে নিছক দুর্ঘটনা, সেকথা কেউ মানবে না আমি জানতাম। আপনিও মানতে পারছেন না আর্য।' প্রত্যুত্তোরের সময় করুণ হাসি দেখা দেয় বারুণির মুখে, চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দুফোঁটা অশ্রু।

'আমি জানি তুমি সত্যকথন করেছ বারুণি', পুষ্পকেতুর এই মন্তব্যে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয় সমগ্র সভাস্থল।

'এ তুমি কি বলছ কেতু?' বিশাখগুপ্ত বিরোধিতা করেন।

'শ্রীজয়ার হত্যা মস্তকের আঘাত থেকে হয়নি দেব, তার হত্যাকারী বারুণি নয়। যে মারকত হার উপহার এনেছিল, প্রকৃত হত্যাকারী সে।'

'কিন্তু, অমূল্য গহনা উপহার এনে, শ্রেষ্ঠাণীর গায়ের গহনা চুরি করে, এ কিরূপ হত্যাকারী?' বিশাখগুপ্ত বিভ্রান্ত বোধ করেন, পুত্রের এই হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্যালাপে অস্বচ্ছন্দ দেখায় তাঁকে।

'শ্রীজয়াকে হত্যা করেছেন তার স্বামী বসুদত্ত, গহনা চুরি দণ্ডাধিকারিকের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা মাত্র। মারকত হারটি তিনি সম্ভবত কোনও রোমক বণিকের থেকে সংগ্রহ করেছিলেন ভৃগুকচ্ছে বসবাসকালে। কথাটা ঠিক বলেছি তো ভদ্র?' এবার বসুদত্তের পানে চেয়ে ব্যাখ্যা করেন কুমার।

'রসনা সংযত করুন আর্য, জ্যেষ্ঠ একজন বিশিষ্ট বণিক, পাটলীপুত্রের বৈশ্য সমিতির অন্যতম প্রধান! তাছাড়া, তিনি সেরাত্রে বন্দরে ছিলেন, আমরা সকলেই জানি সেকথা।' গর্জে ওঠেন সুদত্ত।

'না তিনি সেরাত্রে পদব্রজে গৃহে এসেছিলেন, তোরণ প্রতিহারির দিনপুস্ত সাক্ষ্য দেবে এ ঘটনার। বারুণিকে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখেন শ্রেষ্ঠী, কিন্তু অন্ধকারে চিনতে পারেননি। দরজা খোলা থাকায়, নিঃশব্দেই প্রবেশ করতে পেরেছিলেন তিনি। প্রথমে স্ত্রীকে ভূপতিত দেখে তস্করের কাজ মনে করে ব্যস্ত হয়ে পড়েন শ্রেষ্ঠী, কিন্তু ততক্ষণে শ্রীজয়ার সংজ্ঞা ফিরতে শুরু করেছে, সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠীকে বারুণি জ্ঞান করে তিনি কিছু বলে থাকবেন। তাতেই জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয় তাঁর; ঈর্ষা ও ভীষণ ক্রোধে মত্ত হয়ে শ্বাসরূদ্ধ করে হত্যা করেন নিজ গৃহিণীকে। এই গোলমালে, কোমরবন্ধে রাখা থলিকাবদ্ধ হারটি ছিটকে পড়ে যায় তাঁর অজান্তে। গায়ের গহনাগুলি খুলে নিয়ে গিয়ে সম্ভবত গঙ্গা বক্ষে বিসর্জন দিয়েছিলেন, অবশ্য সঠিক রূপে সবকথা ভদ্রই বলতে পারবেন।'

পুষ্পকেতুর বক্তব্যের পশ্চাতে সুদত্ত প্রতিবাদ করতে উঠে দাঁড়ান, কিন্তু বসুদত্ত নিরস্ত করেন তাঁকে, এরপর ধীর পায়ে এগিয়ে আসেন তিনি বিচার পতির সমুখে।

'সেদিন দীর্ঘ তিনমাস প্রবাসে যাপনের পশ্চাতে দেশে ফিরেছিলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গৃহে ফিরতে উদগ্রীব ছিল মন; শ্রীজয়া......, আমার হৃদয় জুড়ে বিরাজ করত সে সর্বক্ষণ। লোকে বলবে বৃদ্ধ বয়সের মতিভ্রম, কিন্তু জীবনে প্রথমবার সত্যকার প্রেমের আস্বাদ পেয়েছিলাম তার কাছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুটা সময় নেন শ্রেষ্ঠী, তারপর পুনরায় শুরু করেন নিজের বক্তব্য।

'ভৃগুকচ্ছে, একখানি দুর্লভ রত্নহার খরিদ করেছিলাম তার জন্যে, সেটি পেয়ে তার মুখে যে অনাবল হাসি ফুটে উঠবে, আর দীর্ঘ অদর্শনের অভিমান ঘুচে মধুর হবে মিলনক্ষণ, কতভাবে কল্পনা করেছি সেদৃশ্য। সেকারণেই, রাত্রির আহার সমাধা হতে নিজেকে স্থির রাখতে পারিনি, সায়াহ্নের অন্ধকারেই পদব্রজে রওয়ানা দিয়েছিলাম গৃহের পথে। ছাড়পত্র থাকায় অসুবিধা তো কিছু ছিল না, চন্দ্রমার আলোক, ভাদ্রের মৃদু মলয়, পরিবেশ পথ চলার অনুকুল ছিল। গৃহের সমুখে পৌঁছিয়েছি তখন রাত্রি গভীর, হঠাতই কে যেন ছিটকে বেরিয়ে এলো দ্বার খুলে, আর নিমেষেই মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে; দেখে বলিষ্ঠ যুবা বলে বোধ হয়েছিল, তস্কর নয়তো বুকে কেঁপে উঠল আমার, গৃহিনী একা রয়েছেন কক্ষে। আমি দ্রুত উপরে ছুটে যাই তার সন্ধানে, গিয়ে দেখি রক্তাক্ত শরীরে মাটিতে লুটিয়ে আছে সে, সংজ্ঞাহীনা। দিশেহারা হয়ে তার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করি, ধীরে ধীরে চোখ খুলে চায় সে; আর তারপর আমার মুখের পানে চেয়ে আকুতি করে ওঠে 'বারুণি যেয়োনা, ছেড়ে যেয়োনা আমায়!' আকুল হয়ে আমার উত্তরীয় চেপে ধরতে চায় সে, তার চোখের দৃষ্টি তখনো ঘোলাটে। মূহূর্তে এক প্রলয় ঘটে গেলো আমার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে; কক্ষের জ্বলন্ত প্রদীপ, অবিন্যস্ত শয্যা, শ্রীজয়ার অবিন্যস্ত বেশবাস, আমার ভিতরকার পশুকে জাগিয়ে দিল পলকে নির্মম ঈর্ষায়। যেহাতে কণ্ঠহার পরাতে চেয়েছিলাম পরম স্নেহে, সেই হাত দিয়েই পিষে ধরেছিলাম তার কোমল গ্রীবা অন্ধ আবেগে, খানিক ছটফট করে নেতিয়ে পড়েছিল সে আমারই কোলে। সেসময়, বাস্তববুদ্ধি ফিরে আসে আমার, নিজেকে বাঁচাতে তার গায়ের গহনা খুলে সঙ্গে নিই, যাতে হত্যাটি তস্করের কার্য বলে প্রমাণ হয়; সর্বনাশী কুলটার জন্য নিজ জীবন বিপন্ন করার ইচ্ছা আমার ছিল না। কুমার ঠিকই বলেছেন, সে গহনা আমি গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দিয়েছিলাম বন্দরে ফেরার কালে। তবে রত্নহারটির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম গোলমালে, সেটি যে অদৃশ্য হয়েছে আমার কোমরবন্ধ থেকে, সেরাত্রে তা বুঝিনি।

হত্যার অপরাধ আজ নিজমুখে স্বীকার করছি আমি, শুধু একখানি আবেদন মহাদণ্ডনায়কের কাছে, বারুণিকে আপনি মুক্তি দিন, সে তার অপরাধের শাস্তি পেয়েছে।' বসুদত্তের কণ্ঠস্বর হতাশায় ভঙ্গুর শোনায়; সমগ্র সভাস্থল স্তব্ধ হয়ে থাকে অবরূদ্ধ আবেগে।

বসুদত্তের আত্মসমর্পন ও বারুণির মুক্তির সাথে সভাভঙ্গ হয় সেদিনকার মত।

***

বিচারে বসুদত্তের প্রাণদণ্ড ও অশ্বিনের দুইবৎসর কারাদণ্ড ঘটেছে; চঞ্চলা নারী, সেকারণে কারাবাস হয়নি তার, কিন্তু পাটলীপুত্র ত্যাগ করতে হয়েছে তাকে, নগরে দাসীকর্ম জুটবে না তার আর।

'শ্রেষ্ঠী যে স্ত্রীর হত্যাকারী এ ভাবনা মনে এলো কিভাবে?' পুষ্পকেতুর সাথে গৃহের নিভৃত আলাপে প্রশ্ন করেন উল্মুক এক শীতের সকালে।

'সে তো তুমি সাহায্য করলে তাই।'

'আমি!' উল্মুককে রীতিমত বিহ্বল দেখায়।

'অবশ্য! তোমার কথাতেই তোরণদ্বারের দিনপুস্ত পরীক্ষার চিন্তা মাথায় আসে, আর সে থেকেই সমাধান ঘটল।'

'বল কি হে! আমি যে এরূপ প্রতিভার খনি এতদিন জানতেই পারিনি!' উল্মুকের পরিহাসে প্রাণখুলে হেসে ওঠেন দুজনেই। বাইরে অঘ্রানের নরম রোদে ঝলমল করে ওঠে প্রকৃতি।

*** ***

টিকা: দিনরাত মিলিয়ে আটটি প্রহর, রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের শেষভাগ আনুমানিক রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার সময়।

প্রার্জুন প্রদেশ গুপ্তযুগে মগধ সাম্রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র অঙ্গরাজ্য যা বর্তমানের মধ্যপ্রদেশের কোনও একটি অঞ্চল।

পুষ্পকেতু কামদেবের এক নাম।

তল্লিকা – চাবি, মন্দুরা – নীচু ডিভান, উদবন্ধক – আলনা জাতীয় আসবাব, পরিসারিত করা – জোর করে সরিয়ে দেওয়া

ধূম্রজটিল

অধ্যায় ১

কান্যকুব্জ বর্ধিষ্ণু নগরী, সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। রাজগৃহ থেকে বারাণসীর বাণিজ্যপথে এই নগরীর গুরুত্ব অসীম; গঙ্গা ও ঈষান নদীর তীরে গড়ে ওঠা জনপদটি স্থল ও জল দুই পথেই সুসংযুক্ত। আর সে কারণে, বৃহত্তর কান্যকুব্জ ভুক্তি গুপ্তসাম্রাজ্যের একটি সামরিক কেন্দ্রও বটে। দক্ষিণ পশ্চিমের স্বাধীন ক্ষত্রপ রাজ্যের শ্যেণদৃষ্টি থেকে সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে এখানেই গড়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও আধিকারিক কার্যালয়। সদ্য অধিকারে আসা মথুরা ও এরাকন্যা অঞ্চল কান্যকুব্জ ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। কান্যকুব্জের উপারিক উগ্রসেন একজন প্রতিভাবান সেনানায়ক, সেইসাথে বিচক্ষণ আধিকারিক; তিনি নিজগুণে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র।

নগরীর মাঝখানে, উপারিকের প্রাসাদ ও আধিকারিক কার্যালয়ের থেকে কিছুটা দূরত্বে গড়ে উঠেছে সুরম্য বৈশ্যপল্লী; সেখানে কিংশুক ও মন্দার গাছের ছায়া ঘেরা পাথরে বাঁধানো পথ, আর তার দুইপাশে সারি দিয়ে প্রাচীর ঘেরা সব বাগানবাড়ি। বাড়ীগুলির মতই, এখানকার অধিবাসীরাও ধনে ও মানে বিশিষ্ট। বৈশ্যপল্লীর পূর্ব সীমায় একটি বড় আমের বাগান, আর তার ধার ঘেঁসে একটি সুন্দর দোতলা গৃহ; এটি শ্রেষ্ঠী চারুদত্তের বাসস্থান। শ্রেষ্ঠী মধ্যবয়সী, তবে সুদর্শন ও সুস্বাস্থের অধিকারী; এই গৃহে তিনি একাই থাকেন, ব্যক্তিগত সেবক, পাচক ও দুটি সহায়ক নিয়েই তাঁর গৃহস্থালী। ব্যবসায়ের কারনে আগে যাতায়াত থাকলেও, কান্যকুব্জে বছর খানেক হল পাকাপাকি ভাবে স্থিতু হন তিনি, বাড়ীটি সেইসময়েই তৈরী হয়েছে। শোনা যায়, তাঁর আদি বাড়ী ছিল রাজগৃহে, কিন্তু কয়েক বছর আগে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে স্ত্রীপুত্র হারিয়ে শোকতাড়িত ভবঘুরে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন শ্রেষ্ঠী। পরিবার বিয়োগের বেদনা কাটিয়ে তিনি আবার গৃহী হয়েছেন, তবে গৃহিনীর অধিষ্ঠান ঘটেনি এখনও। গৃহিণী না থাকলেও সঙ্গিনীসুখ থেকে বঞ্চিত নন চারুদত্ত, পরিচিতদের ধারনা, গণিকাপল্লীতে যাতায়াত আছে তাঁর।

গৃহের একতলায় অতিথি আপ্যায়নের জন্য রয়েছে বিশ্রামকক্ষ, শ্রেষ্ঠী সেই ঘরের জানালার পাশে একটি সুখাসনে বসে মনযোগ সহকারে কিছু নথি পরীক্ষা করছেন; তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী ও পেশীবদ্ধ শরীর দেখে বৈশ্য নয় বরং তাঁকে জাতিতে ক্ষত্রীয় বলে ভুল হয়। কিছু আগে নগরীর বিপনন কেন্দ্র থেকে ফিরেছেন দিনের কাজ সেরে, নির্জন সন্ধ্যা বেশীরভাগ দিনই ব্যবসায়িক হিসাব নিকাশ বা পুথি পাঠ করেই কাটে তাঁর, আজও তার ব্যতিক্রম নয়। বাইরের আলো কমে এসেছে, ব্যক্তিগত সেবক জম্বুক একহাতে জ্বলন্ত দীপদানি ও অন্যহাতে একটি লিপি নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। দীপদানিটি সমুখের পিঠিকায় রেখে, লিপিখানি প্রভুর দিকে বাড়িয়ে দেয় সে নিঃশব্দে, চারুদত্ত আনমনে সেটি হাতে নিয়ে, নথিতে মনযোগী হন। তবে জম্বুক বিদায় হবার সাথে সাথে লিপিখানি খুলে দেখেন তিনি, সুগন্ধি রেশমী বস্ত্রে লেখা সংক্ষিপ্ত বার্তা; পড়তে পড়তে মুখে স্মিত হাসি ফুটে ওঠে শ্রেষ্ঠীর। হয়তো, আজকের সন্ধ্যা নির্জনে কাটবেনা তাঁর।

***

নগরীর মাঝখানে অনেকখানি অংশ জুড়ে পণ্যবীথি, কর্মব্যস্ততা ও দেশী বিদেশী বণিকদের উপস্থিতিতে জায়গাটি কান্যকুব্জের অন্যতম আকর্ষন। পাথরে বাঁধানো মূল রাজপথের দুইপাশে বড় বড় বিপনি, তাদের ভিন্ন ভিন্ন পসরা, তবে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধির ভাণ্ডার। রাজপথ থেকে যে সকল

শাখাপথ ছড়িয়ে পড়েছে মূল বিপনিগুলিকে সামনে রেখে, সেখানে চোখে পড়ে সারিসারি কর্মশালা; অগরু, চন্দন ও জাতিপুষ্পের মিলিত সৌরভে ভারাক্রান্ত সেই অঞ্চলের বাতাস; কর্মশালাগুলিতে সুগন্ধি তৈরী হচ্ছে বুঝতে পারা যায় সহজেই। কান্যকুব্জ উৎকৃষ্ট সুগন্ধি উৎপাদনের কারনে সমস্ত আর্যাবর্তে বিখ্যাত, এখানকার তৈরী অগরু ও চন্দনের তেল এবং পুষ্পসুবাস সরবরাহ হয় দূর দূরান্তরে। শ্রেষ্ঠী চারুদত্তের গন্ধদ্রব্যের বিপণিটি মূল রাজপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে, তবে নিজস্ব কর্মশালা নেই তাঁর বাকি গন্ধবণিকদের মত। সুগন্ধি ছাড়াও অগরু, ধুনক, গুগগুল ও ধুপক জাতীয় গন্ধদ্রব্যও পাওয়া যায় তাঁর পণ্যসম্ভারে। শ্রেষ্ঠী সুদুর সুবর্ণভূমি থেকে গন্ধদ্রব্য আমদানী করে সরবরাহ করেন কান্যকুব্জের কর্মশালাগুলিতে, পরিবর্তে সুগন্ধি সংগ্রহ করে সেগুলি সরবরাহ করেন বারানসী ও ভৃগুকচ্ছের বৃহত্তর বাণিজ্যকেন্দ্রে।

পণ্যবীথীর শাখাপথে ছোট একটি বিপনি, তার বাইরের অংশে পরিবস্ত্র ঘেরা অতিথিকক্ষ ও ভিতরভাগে একটি কর্মশালা। ছোট হলেও এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পদধূলি পরে, বহির্কক্ষের সাজসজ্জা থেকেই তা স্পষ্ট হয়। এটি ভদ্র ধনঞ্জয়ের কর্মশালা, তিনি জাতিতে স্বর্ণকার; তাঁর শিল্পকর্মের গুণগ্রাহী নগরীর প্রায় সকল ধনাঢ্য মানুষ। শোনা যায়, স্বয়ং উপারিক উগ্রসেনের অন্দরেও ধনঞ্জয়ের তৈরী গহনার বিশেষ সমাদর।

অঘ্রানের সকাল, বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, অতিথিকক্ষের জানালার পরিবস্ত্রের ফাঁক দিয়ে নরম রোদ এসে পড়েছে কক্ষের মাঝখানে; ধনঞ্জয় ভূমিসংলগ্ন মন্দুরায় বসে নিবিষ্ট মনে কয়েকটি রত্ন পরীক্ষা করছেন, পশমের নকশাদার উত্তরীয়টি আলগোছে ছড়িয়ে আছে কাঁধে, তাঁর সৌম্যকান্তি মুখশ্রীতে যৌবনের লাবন্যের চেয়ে বুদ্ধির দীপ্তি ও বিচক্ষণতা অধিক স্পষ্ট।

দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দে সচকিত হন স্বর্ণকার, আলগোছে ভেজানো দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন শ্রেষ্ঠী চারুদত্ত। তাঁকে দেখে ধনঞ্জয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়, নীরব হাসি বিনিময়ে প্রীতির সম্পর্ক প্রকাশ পায় দুজনের মধ্যে। চারুদত্ত প্রায়ই ধনঞ্জয়ের জন্য রোমক রত্ন সংগ্রহ করেন ভৃগুকচ্ছের বণিকদের কাছ থেকে, এছাড়াও কোনও দ্যুপ্রাপ্য রত্নের সন্ধান থাকলে ধনঞ্জয়কে সংবাদ দেন; সে থেকেই এই বিপণিতে তাঁর যাতায়াত। দুজনের মধ্যে ব্যবসায়িক বিশ্বস্ততার কারণে একপ্রকার বন্ধুত্ব তৈরী হয়েছে যা ঠিক ব্যক্তিগত না হলেও সম্পূর্ণ ভাবে পেশাগত ও নয়।

'স্বাগতম ভদ্র, আজ সকাল থেকে আপনাকেই স্মরণ করছিলাম', ধনঞ্জয় অভ্যর্থনা করেন অতিথিকে।

'কোনও বিশেষ প্রয়োজনে কি?'

'হ্যাঁ, কয়েকটি উৎকৃষ্ট গুরুরত্ন অঙ্গুরীয়ের অনুরোধ এসেছে, আমার সংগ্রহে যা আছে যথেষ্ট নয়, ভেবেছিলাম আপনি যদি আনিয়ে দিতে পারেন।'

'হঠাৎ কান্যক্যব্জে অর্থাভাব ঘটেছে নাকি, সকলেই গুরুরত্ন ধারণে ব্যস্ত?' চারুদত্ত রসিকতা করেন।

'কয়েকদিন হল ত্রিকালজ্ঞ শঙ্কুদেব আবার এসেছেন নগরীতে', ধনঞ্জয়ের অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যায় হেসে ওঠেন দুজনেই।

'আজ আমিও নিজের প্রয়োজনে এসেছি ভদ্র; এই মরকতটি দিয়ে একটি গহনা বানিয়ে দিতে হবে আপনাকে', চারুদত্ত একটি রেশমীবস্ত্রের থলিকা থেকে একখানি অতি উচ্চমানের মণি বের করে ধনঞ্জয়কে দেন।

'অপূর্ব! কিরকম গহনা চান আপনি? অঙ্গুরীয়ের পক্ষে কিছু বৃহৎ এই রত্ন; কণ্ঠে পরবেন কি?'

'কণ্ঠহার হলে ভালো হয়, তবে নারীকণ্ঠের উপযুক্ত করে তৈরী করুন।' শ্রেষ্ঠীর কথা শুনে কিছুটা অবাক হলেও মুখের ভাবে তা প্রকাশ করেন না ধনঞ্জয়। চারুদত্ত সম্ভবতঃ এরকম অনুরোধ আগে কখনও করেননি তাঁর কাছে।

***

উপারিক উগ্রসেনের কার্যালয় বাগান ঘেরা একখানি দোতলা প্রাসাদ, প্রাসাদের চারপাশে কঠিন সুরক্ষাব্যবস্থা; একতলার কক্ষগুলিতে বিভিন্ন আধিকারিকদের কাজের স্থান ও উপর তলাটি সম্পূর্ণভাবে উপারিকের ব্যক্তিগত কার্যালয়। দোতলার সামনের দিকে একটি সভাগৃহ, সেটি একাধারে দর্শন কক্ষ ও মন্ত্রণালয়, আর পিছন দিকে উপারিকের কর্মকক্ষ ও বিশ্রামকক্ষ। দোতলায় ওঠার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবেশপথ আছে প্রাসাদের পিছনদিক থেকে, সেটির দরজা রক্ষার দায়িত্বে থাকে দুইজন করে উর্ধতন দ্বারী। নীম্নতল থেকে উপরে ওঠার সিঁড়িতেও লোহার দরজা, দ্বারীর অনুমতি ছাড়া সেখানেও প্রবেশ করা চলে না।

কর্মকক্ষে লেখন পীঠিকার উপর রাখা কিছু প্রশাসনিক সনদ, সেগুলি একে একে পরীক্ষা করে নিজস্ব শীলমোহরে নামাঙ্কিত করছেন উগ্রসেন, পাশে অপেক্ষায় রয়েছেন সহকারী শ্রীদাম; সনদ সংক্রান্ত উপারিকের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছেন তিনি, প্রয়োজনে দেওয়ালের নিধানিকা থেকে নিয়ে আসছেন বিভিন্ন নথী। উগ্রসেন বয়সে যুবক, কিন্তু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সাবধানী ও বিচক্ষণ; কোনও কাজে নিশ্চিত না হয়ে সিদ্ধান্ত নেননা। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরেদের একজন ভদ্র শ্রীদাম, মূলতঃ কার্যালয়ের নথিবিষয়ক কাজের দায়িত্বে থাকলেও, সামরিক গূঢ় মন্ত্রনাতেও উপারিকের সঙ্গী থাকেন এই অভিজ্ঞ আধিকারিক।

'কেতু ও শঙ্খচূড় এসেছেন কিনা একবার খোঁজ নিন ভদ্র', সনদগুলিতে স্বাক্ষরপর্ব শেষ করে মন্তব্য করেন উগ্রসেন।

'ওঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন সভাগৃহে, পূর্বেই সংবাদ পাঠিয়েছেন।' শ্রীদামের উত্তর শুনে সভাগৃহের দিকে রওয়ানা হন উপারিক, শ্রীদাম তাঁকে অনুসরণ করেন।

***

সভাগৃহে অপেক্ষায় রয়েছেন দুই রাজপুরুষ, দুজনেই প্রায় সমবয়স্ক, যুবাপুরুষ এবং দুজনেরই একেবারে বিশেষত্বহীন চেহারা, ভীড়ের মাঝে দেখে চিনে রাখা শক্ত। আর তার চেয়েও বড় কথা, সাজপোশাকের পরিবর্তন ঘটিয়ে এঁদের যেকোনও পেশার মানুষ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়। এঁরা উগ্রসেনের গুপ্তচর বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক, কেতুবর্মা ভৃগুকচ্ছের বাণিজ্যকেন্দ্রে ও শঙ্খচূড় কান্যকুব্জ ভুক্তির অন্তর্গত সীমান্তবর্তী নগরী ও গঞ্জগুলিতে কার্য পরিচালনা করেন। অভিবাদন পর্ব শেষ হতে আলোচনা শুরু হয় রূদ্ধ সভাকক্ষে, এখানে যেসকল ব্যক্তি যাতায়াত করেন, নীচের কার্যালয়ে তার সংবাদ পৌঁছোয় না। চরবাহিনীর সাফল্য নির্ভর করে মন্ত্রগুপ্তিতে, একথা মনে প্রানে বিশ্বাস করেন উপারিক।

'কোনও নতুন সংবাদ আছে কি ভদ্র কেতু? পশ্চিমা ক্ষত্রপদের উপর বিশ্বাস রাখা কঠিন। তার উপর এতবড় বাণিজ্যকেন্দ্র ওদের করায়ত্ত।'

'নতুন সংবাদ সেভাবে কিছু নেই, তবে মাগধী বণিকদের উপর নজরদারী বজায় আছে, সময়ে সময়ে পণ্যপরীক্ষার ছুতায় নিগ্রহও ঘটে থাকে রাজকর্মচারীদের হাতে। বিগত আশ্বিনে এক মাগধী লবণ ব্যবসায়ীকে ধরে নিয়ে যায় দণ্ডাধিকারিকের প্রহরী, অভিযোগ গুপ্তচরবৃত্তি। পরে অবশ্য প্রমানাভাবে ছেড়ে দেয়।'

'শ্রেষ্ঠী কি আপনার অনুগ্রহভোগী?' উগ্রসেনকে চিন্তিত দেখায়।

'আজ্ঞে না, অন্য এক ব্যক্তি একই নামে বাস করেছিল সেখানে কয়েকমাস, তবে গোলমালের আভাস পেয়ে আগেই স্থান ত্যাগ করেছিল সে।' কেতুবর্মার ইঙ্গিতপূর্ণ উত্তরে হাসি খেলে যায় উপারিকের ঠোঁটে।

'ভদ্র শঙ্খচূড় কিছু বলতে চান মনে হচ্ছে?' শঙ্খচূড়ের চেহারায় চঞ্চলতা লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন উপারিক। বক্তব্য শুরু করার আগে কিছুটা সময় নেন আধিকারিক।

'ঘটনা সামান্যই, তবু ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছিনা, আপনাকে জানাতে চাই সেকারণে। বেশ কিছুদিন যাবৎ এক মূক ও বধির যুবা এরাকন্যার পথেঘাটে, পণ্যবীথীতে ঘোরাঘুরি করছিল। যুবক ঈষৎ পাগলাটে, তবে শান্তিপ্রিয়, স্থানীয় দোকানীরা দয়াপরবশ হয়ে খাবার দাবার দিত তাকে। কিন্তু সপ্তাহ খানেক আগে, একটি

ঘটনা ঘটে। রাজপথে এক ক্ষ্যাপা ষাঁড় তেড়ে আসে বেলা দ্বিপ্রহর নাগাদ; ব্যস্ত পথ, সকলে প্রাণভয়ে সরে যেতে থাকে তার দৃষ্টিপথের বাইরে। গোলমালে একটি শিশু সামনে পড়ে যায়, তার সঙ্গী গৃহসেবকটি চিৎকার করলেও উদ্ধারের চেষ্টা করে না। ঠিক সেই মূহূর্তে এই মুক-বধির যুবক ছুটে এসে প্রচণ্ড শক্তিতে ষাঁড়ের গতিরোধ করে, শিশুটি রক্ষা পায়, জনতার সমবেত চেষ্টায় ষাঁড়ও বশীভূত হয়। কিন্তু ততক্ষণে এই যুবক গুরুতর আহত হয়েছে, বৈদ্যগৃহে নিয়ে যেতে যেতেই তার প্রাণনাশ হয়।'

'কিন্তু এতে সংশয়ের কারণ কি?'

'সংশয়ের কারণ দুটি। প্রথমতঃ মৃতব্যক্তির বাহুতে একটি নাগচিহ্নযুক্ত কবজ পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় কারণ হল, এক বধির তার ঘোলাটে বুদ্ধি নিয়ে চিৎকারই বা শুনল কি করে, আর উদ্ধার কাজে তৎপরতাই বা দেখাল কি ভাবে।'

'আপনি কি মথুরার পরাজিত নাগরাজ পরিবারের গুপ্তচর সন্দেহ করছেন লোকটিকে? কিন্তু তাদের এখন আর অস্তিত্ব কোথায়? রাজা গণপতি নাগের মৃত্যু ঘটেছে, তিনি অপুত্রক ছিলেন। গুপ্তচর বাহিনী নিযুক্ত করার মত বাহুবল, অর্থবল অথবা উচ্চাশা কিছুই সে পরিবারের আর অবশিষ্ট নেই। তাছাড়া নাগ বংশজ বহু নাগরিক বাস করে মথুরা ও তার আশেপাশে, এও সেরকম কেউ হতে পারে। আর লোকটি হয়ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতেই ছুটে গিয়েছিল উদ্ধারকাজে। তবে আপনি সতর্কতা বাড়ান, এরাকন্যায় নতুন আগন্তুকদের উপর গোপনে দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করুন।'

আলোচনা সভা ভঙ্গ হয়, শীতের অপরাহ্নের মন কেমন করা ছায়াচ্ছন্নতায় ঘরে ফেরার আবহ। উগ্রসেন কিছু পরে কার্যালয় ত্যাগ করেন সেদিনকার মত।

***

নগরীর মূল জনবসতির থেকে কিছুটা দূরত্বে ঈষাণ নদীর তীরে বনানীর ছায়াঘেরা একটি নিভৃত পল্লী, এটি কান্যকুব্জের গণিকাদের আলয়। এখানে রয়েছে বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য বাগানবাড়ী, উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা গৃহগুলি রাস্তা থেকে চোখে পড়েনা, প্রবেশ পথেও কড়া পাহারার ব্যবস্থা। এই স্বতন্ত্র পল্লীটিতে শুধুমাত্র গণিকাশ্রেষ্ঠাদেরই বাস; বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও রাজপুরুষদের নিয়মিত যাতায়াত এই সব গৃহে।

পড়ন্ত বিকেলের ম্লান রৌদ্র ছুঁয়ে আছে দোতলার দীর্ঘ অলিন্দটিকে, সমুখে বয়ে চলেছে ঈষান নদী, জলস্রোতের মৃদু কলধ্বনিতে সুললিত মুখরতা। অলিন্দের সাথে যুক্ত সভাকক্ষটির একপাশে ভূমিতে পাতা মন্দুরায় এক বিশিষ্ট অতিথি আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম করছেন; অন্যপাশে মৃদঙ্গ ও মঞ্জিরা হাতে সঙ্গীত পরিবেশনে প্রস্তুত দুই সুন্দরী তালবাদিকা; জানালা ও ঘরের থামে ফুলেরসাজ, কুরঙ্গীতে জ্বলছে সুগন্ধি ধুপক, গোধূলির অস্তরাগে মোহময় পরিবেশ। ধীরে, অন্দরের দরজা থেকে কক্ষে প্রবেশ করে এক দিব্যাঙ্গনা, নূপরের মৃদু নিক্কন তুলে কক্ষের মাঝখানে আলপনা চিত্রিত বেদিকায় গিয়ে দাঁড়ায় নারী, পরনে তার অগ্নিবর্ণ অন্তরীয় ও স্বর্ণজরীর মেখলা, কুঙ্কুম চিত্রিত অপূর্ব মুখশ্রী, সিঁথিতে পদ্মরাগ মণি; যৌবনের উদযাপন দেহের প্রতিটি বিভঙ্গে, চেহারার প্রতিফলন তার নামেও, সে বসন্তমল্লিকা। অতিথিকে করজোরে অভিবাদন করে নটী, স্মিত হাসি ও কোমল কটাক্ষে অভিষিক্ত হন সম্মানিত রাজপুরুষ। বাদ্য শুরু হয়, আর তারই সাথে স্বর্গীয় নৃত্যশৈলী জেগে ওঠে মায়াবী দেহভঙ্গীমায়।

বসন্তমল্লিকা এই গণিকাপল্লীর রত্নশ্রেষ্ঠা, তার নৃত্যসভায় নিমন্ত্রন পেতে বহু মান্যগন্য ব্যক্তিই ব্যাকুল; কিন্তু সীমিত কিছু মানুষেরই সে সৌভাগ্য ঘটে থাকে। আর নটীর একান্ত সান্নিধ্যলাভের অধিকার সমগ্র কান্যকুব্জে কেবল একজনেরই আছে, তিনি আজকের সভার মহামান্য অতিথি, উপারিক উগ্রসেন।

নৃত্যসভা শেষ হয়, উগ্রসেনকে পাশের বিশ্রামকক্ষে নিয়ে যায় বসন্তমল্লিকা। সেখানে নিজের হাতে আহার্য পরিবেশন করে সে পরম যত্নে।

‘তুমি আগে গ্রহন কর প্রিয়ে’, উগ্রসেন স্মিত হেসে নটীর মুখে তুলে দেন প্রতিটি আহার্য, প্রণয়ালাপের আড়ালে প্রতিদিনকার এই ছলনাটুকু বুঝতে পারলেও বসন্তমল্লিকা উপভোগ করে এই অন্তরঙ্গতা। উগ্রসেন সাবধানী রাজপুরুষ, ব্যক্তিগত মূহূর্তেও সতর্কতা ত্যাগ করেননা।

***

বসন্তমল্লিকা নটী গুণধরীর শিষ্যা ও কন্যাসমা, তার গৃহেই বাস। গুণধরী এককালের সুন্দরী ও বিদূষী গণিকা, এখন বয়স বেড়েছে। দীর্ঘকাল অবসর যাপনের পরে সম্প্রতি নিজের একমাত্র কন্যা তনুশ্রী ও পালিতা কন্যা বসন্তমল্লিকাকে নিয়ে নতুন করে উন্মুক্ত করেছে সে গৃহদ্বার অতিথিদের জন্যে।

তনুশ্রী বসন্তমল্লিকারই সমবয়স্কা, কিন্তু চেহারা ও ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ন বিপরীত। তার চেহারার স্নিগ্ধ যৌবনশ্রী সুশীতল বনছায়ার মত, সম্মোহনী নয়, বরং শান্তির আশ্বাস সেখানে। তনুশ্রীর চলনে বলনে সহজ সাবলীলতা, অতিথিকে তুষ্ট করার অতিরিক্ত প্রয়াস নেই ব্যবহারে। বেশীরভাগ গণিকার মত নৃত্যে পারদর্শী নয় সে, মায়ের বহূ অনুযোগ উপেক্ষা করে বীণাবাদন শিক্ষা করেছে সেই কিশোরী বয়স থেকে, তার সুরঝঙ্কারে লাস্য নেই, আছে আত্মমগ্নতা। বসন্তমল্লিকার তুলনায়, তনুশ্রীর অনুরাগী সংখ্যা কম, তার অতিথিদের বেশীরভাগই বয়স্ক শ্রেষ্ঠী, যাঁরা মূলতঃ কিছুটা শান্তিপূর্ণ একান্ত সময় কাটাতে আসেন গণিকাগৃহে। তবে বৈপরীত্য যতই থাক সৌহার্দ্রের অভাব নেই এই দুই তরুনীর মধ্যে, এরা একে অন্যের প্রিয়সখী ব্যক্তিগত জীবনে।

অপরাহ্নের স্বপ্নমদির আলোয়, মরকত মণির হরিৎ আভা প্রতিফলিত হয় তনুশ্রীর লজ্জানত মুখশ্রীতে, কণ্ঠহারটি স্বহস্তে তাকে পরিয়ে দিয়ে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকেন শ্রেষ্ঠী চারুদত্ত।

‘কেমন হয়েছে বললে না তো প্রিয়ে, পছন্দ হয়নি কি?’ চারুদত্তের প্রশ্নে নীরব থাকে তনুশ্রী।

‘পরিবার পরিজনহীন ছন্নছাড়া জীবন, তোমার মত তরুণীর হৃদয় পাওয়া যায় কিসে, জানা নেই। হয়তো এ উপহার অকিঞ্চিৎকর।’ চারুদত্তের বক্তব্যে সঙ্কোচ প্রকাশ পায়। তনুশ্রীর ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠে, দুফোঁটা অশ্রু ঝরে পরে চোখের কোল বেয়ে।

‘একি তুমি কাঁদছ! কেন?’ বিস্মিত চারুদত্ত তার মুখখানি তুলে ধরেন পরম আদরে।

‘এ আনন্দের অশ্রু দেব; উপহার অতি মূল্যবান, কিন্তু তার সাথে রয়েছে যে প্রীতি, আমার কাছে তা অমূল্য। এই আনুকুল্যের প্রতিদান দিতে পারি সে ক্ষমতা আমার কোথায়!’ তনুশ্রীর কণ্ঠস্বর বীণার তানের মতই সুমধুর, তার শান্ত বাচনভঙ্গীতে এমন কিছু আছে, যা হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

‘এক নিঃসঙ্গ বিগতযৌবন পুরুষের জীবনে নতুন আশার আলো দেখিয়েছ তুমি, এর চেয়ে বড় আর কি উপহার হতে পারে প্রিয়ে? আমার এই অনিশ্চিত জীবনে স্থিরতা এনেছ তুমি, ভয় হয় বুঝি বাঁধা পড়ে যাব তোমার অঞ্চল ছায়ায় চিরকালের তরে।’

‘সে সৌভাগ্য কি গণিকার কপালে থাকে প্রভু? আপনি অকারনে ভীত হবেন না।’ স্মিত হেসে উত্তর দেয় তনুশ্রী, তার চোখের গভীর দৃষ্টিতে বিষণ্ণতার আভাস দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়।

‘যদি বাঁধা না পড়ি, জানবে তার কারন ভিন্ন, তোমার সামাজিক অবস্থান নয়।’ তনুশ্রীর হাত দুটি নিজহস্তে নিয়ে কথাগুলি উচ্চারণ করেন শ্রেষ্ঠী; নীরবে চেয়ে থাকেন দুজনে দুজনার দিকে, গোধূলির রাঙা আলোয় অভিষিক্ত হয় মিলন মুহূর্ত।

*** ***

অধ্যায় ২

কান্যকুব্জ ভুক্তির দক্ষিনে বিদিশা ও সাঁচী অঞ্চল জুড়ে ক্ষত্রপ রাজ শ্রীধরবর্মনের রাজত্ব, বছর দুয়েক হল মুখোমুখি যুদ্ধে রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুর্গনগরী এরাকন্যা গুপ্তসাম্রাজ্যের দখলে চলে গেছে। বৃহত্তর

সামরিক শক্তির কাছে পরাজিত ক্ষত্রপরাজ মিত্রতার শর্ত মেনে নিয়ে বর্তমানে তাঁর সঙ্কুচিত রাজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট আছেন। বেত্রবতী নদীর তীরে তাঁর রাজধানী প্রাচীন বিদিশা নগরী।

রাজসভা সংলগ্ন মন্ত্রণা কক্ষটিতে মহারাজ ও তাঁর অতিবিশ্বস্ত চারজন অমাত্য জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত। পরিণত বয়স্ক সৌম্যদর্শন মহারাজ আপাততঃ অন্যদের বক্তব্য শুনতে মনযোগী, তাঁর মুখের ভাবে কিছু প্রকাশ না পেলেও কপালে চিন্তার রেখা গভীর হয়ে উঠেছে। মন্ত্রণাসভার মধ্যমণি শ্রীধরবর্মন হলেও প্রকৃত সভাপতি সেনানায়ক সত্যনাগ, এই আলোচনা সভার আয়োজন তাঁরই উদ্যোগে। সভার অন্য অমাত্যরা যথাক্রমে সুরসেন, রুদ্রবাহূ ও পঞ্চানন। সুরসেন সাঁচীর সীমান্তবর্তী দুর্গের অধিপতি, রুদ্রবাহূ মহাদণ্ডাধিকারিক ও পঞ্চানন সত্যনাগের সহকারী ও গুপ্তচর বাহিনীর অধিকর্তা।

‘ধর্মনাগের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর এরাকন্যার প্রশাসন সতর্কতা বাড়িয়েছে, এ অবস্থায় নতুন করে চর নিয়োগ প্রায় অসম্ভব।’ এরাকন্যার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে মন্তব্য করেন পঞ্চানন।

‘নিজের কর্তব্য ভুলে ওইরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত কাজ করবে তার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি, এ তো কল্পনারও অতীত। সকল অবস্থায় নিজেকে নির্বেদ, অনাসক্ত রাখা গুপ্তচরবৃত্তিতে আত্যাবশ্যক, তবু কিভাবে যে এরকমটা ঘটল! বিগত ছয়মাসের পরিশ্রম সকলই বিফলে গেলো!’ রুদ্রবাহূর গলায় হতাশার সুর স্পষ্ট হয়।

‘এ সবই ভাগ্যের ফের, ধর্মনাগকে দোষ দিয়ে লাভ নেই ভদ্র। বর্তমান পরিস্থিতিতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হওয়াই উচিৎ হবে বলে আমি মনে করি। গুপ্তসম্রাট শক্তিমান, তবে সত্যভঙ্গ করেননা; আমরা শত্রুতা না করলে, তাঁর দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা দেখি না।’ মহারাজ ধীরে ধীরে নিজের বক্তব্য রাখেন।

‘ক্ষমা করবেন রাজন, এবিষয়ে আমার মত কিছু ভিন্ন।’ সেনানায়ক মন্তব্য করেন এতক্ষণে; তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে অসম্ভব দৃঢ়তা। সত্যনাগ যুবাপুরুষ; দীর্ঘদেহী, বৃষস্কন্ধ, দেখেই যোদ্ধা বলে চেনা যায়। তীক্ষ্ণনাসা বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী, দুচোখের প্রখর দৃষ্টি দিয়ে যেন প্রতিপক্ষের অন্তঃস্থল দেখে নিতে জানেন। সব মিলিয়ে তিনি প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

‘এরাকন্যার বর্তমান পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হবে সেনাধিপতি?’ মহারাজকে উদ্বিগ্ন দেখায়।’

‘না, এরাকন্যায় এখন উদ্যোগী হওয়া চলে না; তবে কান্যকুব্জের সেনাশিবিরে আঘাত হানার পরিকল্পনা করা যেতে পারে অবশ্যই। এতে, গুপ্ত সাম্রাজ্যে ধাক্কা লাগবে, সীমান্তে বিশৃংখলার সুযোগ নিয়ে এরানকন্যা ছিনিয়ে নেওয়া সহজ হবে আমাদের পক্ষে।’

‘কান্যকুব্জ! কিভাবে?’ মহারাজের সাথে বাকি সকলেও বিস্ময় প্রকাশ করেন, উপারিক উগ্রসেনের নিরাপত্তার বেড়াজাল ভেঙে সেখানে আক্রমণ করা আত্মহত্যার সামিল, একথা অনুভব করেন সকলেই।

‘কম্বল যতই মূল্যবান হোক, তাতে ছিদ্র থাকলে শীত আটকাবে না; ধরে নিন সেই ছিদ্রের ব্যবস্থা করতে পারলে উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব।’

‘একটু বিশদে বলুন ভদ্র, আমরা বিহ্বল বোধ করছি।’ সুরসেন মন্তব্য করেন।

‘কান্যকুব্জের প্রশাসনে ছিদ্র সৃষ্টি করতে পারলে, আচমকা আক্রমনে জয়ের সম্ভাবনা।’

‘কিন্তু ছিদ্র সৃষ্টি করতে চর নিয়োগ করা প্রয়োজন, এরাকন্যার ঘটনার পরে এইকাজ খুব সহজ হবে কি?’ মহারাজ প্রশ্ন করেন।

‘এখন চর নিয়োগ করা বিপজ্জনক, তবে যদি বলি ছিদ্র তৈরীর জন্যে মুষিকের ব্যবস্থা আগেই হয়েছে, আস্বস্ত হবেন কি রাজন?'

'ওঃ! আমার অগোচরেই এই ব্যবস্থা নিয়েছেন তাহলে?’ মহারাজ যেন কিছুটা ক্ষুন্ন।

‘ক্ষমা করবেন মহারাজ, এবিষয়ে কতখানি সফলতা আসবে, নিজের কাছে অস্পষ্ট ছিল এতদিন, সেকারণেই মৌন ছিলাম। যে মুষিকের কথা বলছি সে স্বাধীনচেতা, প্রভাবশালী ব্যক্তি, বিদিশার প্রজা নয়।’

‘তবে কিসের স্বার্থ তার এই বিপদের ঝুঁকি নেবার?’

'আমার মত তিনিও নাগ বংশীয়, পরাজিত মথুরা রাজপরিবারের কুলজ্যোতিষী ছিলেন শঙ্কুদেব; গণপতি নাগের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়বদ্ধ ব্রাহ্মণ।'

'একা শঙ্কুদেব কি বা করতে পারবেন?'

'তাঁর পক্ষে সঙ্গী সংগ্রহ করা কঠিন হবেনা রাজন; তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি সব দিক বিচার করেই কর্তব্য স্থির করবেন। তাছাড়া, পাণ্ডিত্যের কারণে লোকপ্রিয় এবং সর্বস্থানে অবাধ যাতায়াত। শুনেছি স্বয়ং উগ্রসেনের পরিবারও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

'বেশ, যা ঠিক মনে করবেন, তবে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আপনাকে, অতি উচ্চাশার বশে ভুল পদক্ষেপ নিলে ধ্বংস হবে রাজ্য; নষ্ট হবে বহু নিরীহ প্রাণ।' মহারাজের সাবধান বাণী শুনে সত্যনাগের মুখের পেশী দৃঢ় হয়ে ওঠে, তিনি নীরব থাকেন কিছুক্ষণ।

***

রাত্রি গভীর, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী, চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, নিঝুম সুপ্তিতে ডুবে আছে দ্বিতল প্রাসাদটি; শুধু ঘুম নেই সত্যনাগের চোখে। একান্ত কর্মকক্ষে দীপের আলোয় পদচারণা করছেন তিনি, চোখ দুটি গভীর চিন্তায় একাগ্র, কপালে ভ্রুকুটি। প্রতিশোধ! ভগিনীপতি রাজা গণপতির মৃত্যুর প্রতিশোধ, অসহায়া ভগিনী ও ভাগিনেয়ীদের দুর্দশার প্রতিশোধ! এরজন্যে বিদিশার ভবিষ্যৎ পণ রাখতেও তিনি মরীয়া।

কোথাও একটি পেচক ডেকে ওঠে নির্জনতা ভঙ্গ করে; এ কিসের সঙ্কেত? ধ্বংস না সৌভাগ্যলক্ষীর? শঙ্কুদেব গণনা করে দেখেছেন, উগ্রসেন স্বল্পায়ু, রাজা গণপতির বিষয়েও যুদ্ধের পূর্বে সেইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তিনি সত্যনাগের কাছে; তাঁর বিচার অভ্রান্ত। এই সুযোগ! বলে নয়, ছলে পরাস্ত করতে হবে শত্রুকে।

পূবের আকাশে ফিকে হয়ে আসে অন্ধকার, সেনাপতি ধীর পায়ে বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করেন, এখন শয়ন করবেন তিনি, বুঝিবা নতুন দিনের স্বপ্ন চোখে নিয়ে।

*** ***

অধ্যায় ৩

কান্যকুব্জ নগরীর একপ্রান্তে নিরিবিলি একটি দোতলা কাঠের গৃহ, তার চারপাশ ঘিরে সাজানো বাগান ও একপাশে একটি পুষ্করিণী। গৃহ সংলগ্ন উঠান ছাড়িয়ে পিছন ভাগের একপাশে অশ্বশালা ও খিড়কির দরজা, সামনের সিংহ দুয়ারে দ্বারী রয়েছে ও সমুখের পথের একধারে একটি আম্রকুঞ্জের ছায়ায় অতিথিদের শিবিকা ও অশ্ব রাখার ব্যবস্থা। গৃহটি শ্রেষ্ঠী হরনাথের বাগান বাড়ী, তবে আপাততঃ সেখানে শঙ্কুদেব বসবাস করছেন। প্রিয় শিষ্যের একান্ত অনুরোধেই এই ব্যবস্থা, আচার্যের ভ্রাম্যমান জীবনে, বিভিন্ন নগরীতে শিষ্যগৃহেই আতিথেয়তা নিয়ে থাকেন তিনি, এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়।

গৃহের নিচতলায় একখানি প্রশস্ত বসবার ঘর, সেখানে দেওয়াল সংলগ্ন একটি কাঠের বেদীতে বসে আছেন শঙ্কুদেব। নিয়মনিষ্ঠ কৃশ দেহ, বসার ভঙ্গী ঋজু, গোঁফ-দাড়িহীন মুখশ্রীতে দৃঢ় চোয়াল, তীক্ষ্ণ নাক আর উজ্জ্বল দুটি চোখ; সবমিলিয়ে শঙ্কুদেবের সঠিক বয়স আন্দাজ করা শক্ত, তবে পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে অবশ্যই। তাঁর সমুখে বেশ কয়েকটি সুখাসন রাখা রয়েছে, সেগুলির প্রায় সবকটিতেই বসে রয়েছেন দর্শনপ্রার্থী অতিথিরা; তাঁদের পোশাক ও চেহারায় বিশিষ্টতা স্পষ্ট। এঁরা যে শুধু ভাগ্যগণনার উদ্দেশ্যেই এখানে আসেন তা নয়, শঙ্কুদেবের মনগ্রাহী বেদান্ত আলোচনাও সভার অন্যতম আকর্ষণ।

'প্রণাম আচার্য, আপনার আগমনের সংবাদ পেয়েছিলাম আগেই, কিন্তু আসতে দেরী হল', এক সুবেশ যুবক কক্ষে প্রবেশ করে শঙ্কুদেবকে সম্ভাষণ করেন।

'ভদ্র সুশান্ত যে, স্বাগতম, সকল সংবাদ শুভ তো?'

'কিছুদিন যাবৎ একটি বিষয়ে কিছু বিব্রত আছি, অবসর মত একবার আপনার পরামর্শ নিতে চাই।'

'বেশ, আজকের সভার শেষে বসব আপনার সাথে; জন্ম পত্রিকাটি সাথে এনেছেন তো?' আচার্যের কথায় সম্মতি জানিয়ে গন্ধব্যবসায়ী সুশান্ত একপাশে আসন গ্রহণ করেন।

এরপরে আলোচনা এগিয়ে চলে। সাম্প্রতিককালের তাঁর ভৃগুকচ্ছ ভ্রমণকালীন এক চৈনিক দার্শনিকের সাথে আলাপের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন শঙ্কুদেব আজকের সভায়; তাঁর গল্প বলার ভঙ্গীটি এতই আকর্ষনীয় যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকেন সকলে।

***

সভাভঙ্গ হয়েছে কিছু আগে, অতিথিরাও বিদায় নিয়েছেন একে একে, অপরাহ্নের আলো ছায়াময় হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। গৃহ সেবক দীপাধার রেখে গেছে কক্ষ মাঝে, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে মুখোমুখি গম্ভীর আলোচনায় ব্যস্ত সুশান্ত ও শঙ্কুদেব। ভাগ্যবিচার ব্যক্তিগত বিষয়, সেকারনে গোপনীয়তা রক্ষা করা পছন্দ করেন আচার্য; তবে এই মূহূর্তে তিনি গণনায় আগ্রহী নন মোটেই, সুশান্তের সাথে তাঁর প্রয়োজন একেবারে ভিন্ন।

'কান্যকুব্জ ভুক্তির সামরিক শিবিরের সেনাধ্যক্ষ বজ্রবাহু, তবে উগ্রসেনের অনুমতি ছাড়া কোনও সিদ্ধান্তই নেননা তিনি। এছাড়া, উগ্রসেন নিজে শিবির পরিদর্শনে যান সপ্তাহে অন্তত একবার' ; সুশান্ত জানান।

'হ্যাঁ, উগ্রসেন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরনে বিশ্বাসী, নিজের হাতে সকল ক্ষমতা রাখতে চান। তাঁর বিচক্ষণতা ও সামরিক দক্ষতাও সন্দেহাতীত। এতে অবশ্য আমাদের সুবিধাই হবে।'

'সে কি প্রভু, উগ্রসেনের সাথে পাল্লা দেওয়া সবচেয়ে কঠিন, যে কোনও সময় পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। সে তুলনায় তাঁর অধস্তন যে কোনও অধ্যক্ষ প্রতিপক্ষ হিসাবে অনেক নিরাপদ।'

'উগ্রসেনের বিষয়ে ভাবনা আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন। এখন বলুন, শিবিরের সামরিক শক্তি কি প্রকার?'

'দুই সহস্র অশ্বসেনা, পাঁচসহস্র পদাতিক, এছাড়া, ধনুর্বিদ একশত। তবে এই বাহিনী অত্যন্ত সুশিক্ষিত ও দ্রুত চলাচলে সক্ষম।'

'হুমম... শিবিরের একটি মানচিত্রের প্রয়োজন, বহির্বৃত্ত থেকে নাভিকেন্দ্র, এর পূর্ণ অঙ্কন চাই, জোগাড় করতে পারবেন?' শঙ্কুদেবের কথায় কিছুটা বিচলিত দেখায় সুশান্তকে।

'কাজটা সহজ নয়, আশাকরি বুঝতে পারছেন আচার্য?'

'সহজ হলে তো আমি নিজেই করতাম, আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হোতনা ভদ্র। সহজ নয়, তাই তো এত প্রস্তুতি। আপনি অর্থের জন্য চিন্তা করবেন না, ছলে, বলে, উৎকোচ দিয়ে, যে ভাবে হোক ব্যবস্থা করুন।' কথা বলতে বলতে শঙ্কুদেবের চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে উত্তেজনায়।

***

শ্রেষ্ঠী হরনাথের বাসগৃহে আজ উৎসবের পরিবেশ, গুরুদেবের সেবার ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে; শ্রেষ্ঠীপত্নী নিজহাতে পাক করেছেন অন্ন ব্যাঞ্জন। অতি ঘনিষ্ঠ কিছু অতিথির আগমন ঘটেছে সেই উপলক্ষে, যাঁরা একান্তে শঙ্কুদেবের সান্নিধ্য পেতে চান। উগ্রসেনের স্ত্রী রাজশ্রী হরনাথ পত্নীর বাল্যসখী, তিনিও এসেছেন। রাজশ্রী সুন্দরী ও যুবতী, ধনীগৃহের কন্যা হিসাবে এক সহজ আভিজাত্যের অধিকারিনী; তবে পরিস্থিতির কারণে কিছুটা অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছেন। শঙ্কুদেব নগরীতে এলে তিনি সখীগৃহে এসে তাঁর দর্শন করে যান, নিজের জীবনের জটিলতা কাটাতে স্নেহশীল আচার্য তাঁর বড় আশ্রয়। ইচ্ছা থাকলেও নিজগৃহে ব্রাহ্মণকে

আমন্ত্রন জানানোর ক্ষমতা তাঁর নেই, উগ্রসেন জ্যোতিষবিদ্যায় বিশ্বাসী নন, জগতের সব গণকদের প্রতিই তিনি ঘোরতর বিরূপ।

'মুখখানি এমন আঁধার কেনো মাতা, গৃহে কোনও সমস্যা ঘটেছে কি?' একান্ত সাক্ষাতে শঙ্কুদেব প্রশ্ন করেন রাজশ্রীকে, তাঁর কণ্ঠস্বর স্নেহে আর্দ্র।

'নতুন করে আর কি ঘটবে প্রভু, পুরাতন সমস্যাই তো মিটল না আজও। আপনি স্বামীর কোষ্ঠী বিচার করে আমাকে কমলহীরা ধারণ করতে বললেন, পার্বতী ব্রত করতে বললেন, সবই তো করেছি, তবু স্বামীর মনযোগ পেলাম কই? দুটি কন্যার জন্ম দিয়েছি, পুত্র দিতে পারিনি, আজ তাই আমি মূল্যহীন ওঁর কাছে'; রাজশ্রীর দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

'সে অর্বাচীন, তোমার মূল্য বোঝেনি তাই। স্ত্রীর পূণ্যে স্বামীর মঙ্গল, পত্নীকে যাতনা দিয়ে নিজের অকল্যান ডেকে আনছে সে।'

'না না ওকথা বলবেন না ভগবন, তাকে আপনি আশীর্বাদ করুন।'

'দেবী, আমি সামান্য ব্যক্তি, আমার অভিশাপ বা আশীর্বাদের মূল্য কতটুকু? মানুষের নিয়তি তার কর্মফলের সাথে একসূত্রে গাঁথা, ভবিতব্য খণ্ডাতে পারে কে?'

'আপনি একথা বলছেন কেন? আশঙ্কায় বুক কাঁপছে আমার।'

'চিন্তা কোরনা পুত্রী, তোমার সংসার, সন্তান সবই সুরক্ষিত থাকবে আজীবন।'

'আর স্বামীভাগ্য?'

'গৃহলক্ষীকে অবহেলা করে যে গণিকাগৃহে যায়, তাকে ফেরায় কার সাধ্য!'

'তবু আপনি কিছু উপায় করুন প্রভু', রাজশ্রীর কণ্ঠস্বরের আকুতি স্পর্শ করে শঙ্কুদেবকে।

'তুমি পারলে কিছুকাল পিতৃগৃহে বাস করো পুত্রী, হয়তো তাহলে সে তোমার অভাব বোধ করবে।' তাঁর কথা শুনে দু-ফোঁটা অশ্রু নেমে আসে বিরহিনী বধূর চোখ বেয়ে।

***

দিবা দ্বিপ্রহর, ভোজনকক্ষের মাঝখানটিতে সুদৃশ্য আসনে আহারে বসেছেন উগ্রসেন, দাসীরা একে একে সমুখে সাজিয়ে দিয়ে যায় নানাবিধ অন্নব্যাঞ্জন রাজশ্রীর তত্ত্বাবধানে; স্বামীর পাশটিতে এসে হাসিমুখে বসেন তিনি অবশেষে।

'আহার শুরু করুন আর্য, আজ আমি পাক করেছি আপনার জন্য।'

'জটাধর কোথায়?' স্বামীর প্রশ্নে চমকে ওঠেন রাজশ্রী।

'আমি রান্না করেছি, তারপরেও আহার্য পরীক্ষার প্রয়োজন?' আহত শোনায় তাঁর কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ প্রয়োজন; অযথা ঝুঁকি নেওয়া অবিবেচকের কাজ। জটাধর, জটাধর!'

'তাকে আমি আসতে মানা করেছিলাম, ভুল হয়ে গেছে প্রভু। আপনার আহার্য না হয় আমিই চেখে দেখছি।' কথাকটি বলে একে একে প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন অল্প অল্প গ্রহণ করেন রাজশ্রী, তাঁর মুখখানি বেদনায়, অপমানে লাল হয়ে ওঠে ক্রমশঃ। উগ্রসেন লক্ষ্য করেননা কিছু, বরং আস্বাদন কার্য শেষ হতে আহার শুরু করেন রোজকার মতই।

'আপনি তো কিছুই খেলেননা তেমন, ব্যঞ্জন স্বাদু হয়নি কি?'

'এখনি জরুরী কাজে বেরোতে হবে, ব্যঞ্জনের রসাস্বাদনের সময় কোথায়?' উগ্রসেনের বাক্য শেষ হতে না হতে দাসী এসে সংবাদ দেয় যে, শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয় এসেছেন। উপারিক খাওয়া শেষ করে বহির্কক্ষের দিকে রওয়ানা দেন।

'উপারিক কাজের চাপে বিমনা থাকেন, তা বলে তোমার প্রতি স্নেহের অভাব নেই তাঁর।' প্রবীণা দাসী জটিলা রাজশ্রীর বাপেরবাড়ী থেকেই তাঁর সঙ্গে এসেছে, কন্যাসমা গৃহস্বামিনীকে আশ্বাস দেয় সে।
'এসব কথা এখন থাক।'
'থাকবে কেন? দেখলে না স্বর্ণকার এসেছে, সে কি এমনি এমনি? তুমি যে ধনঞ্জয় ছাড়া কারও হাতের কাজ পছন্দ করনা, তিনি জানেন যে!'

***

'কোনও নতুন সংবাদ আছে কি ভদ্র ধনঞ্জয়?' উগ্রসেন রূদ্ধদ্বারে স্বর্ণকারের সাথে আলোচনায় বসেন।
'সেরকম কিছু নয়, তবে এক ক্ষত্রপ শ্রেষ্ঠী বিগত কয়েকমাসে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করেছেন আমার সাথে। ব্যবসায়িক কারণে তাঁর নিজের এত ঘন ঘন কান্যকুব্জে আসার কারণ ছিল না।'
'নগরীতে তাঁর গতিবিধির ব্যাপারে সন্ধান করেছিলেন কি?'
'আপাত ভাবে সেরকম সন্দেহজনক কিছু দেখিনি, তবে......'
'তবে কি? সঙ্কোচ না করে বলুন।'
'আপনার সহকারী শ্রীদামের সাথে সাক্ষাৎ করেছে সে প্রতিবারই। অবশ্য আপনি হয়তো এ বিষয়ে জ্ঞাত আছেন।'
'শ্রেষ্ঠীর নাম কি?' উগ্রসেনের মুখভাব জটিল হয়ে ওঠে।
'পশুপতি।'
'বটে...। আপনি আপাততঃ এবিষয়ে নীরব থাকুন, শ্রেষ্ঠী এরপর নগরীতে এলে আমাকে সংবাদ দেবেন।'
'বেশ, আমি আসি তবে।'
'আপনার সাথে আর একটি ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছিল।'
'গহনা গড়াবেন তো?' হেসে প্রশ্ন করেন ধনঞ্জয়।
'হ্যাঁ, একখানি ইন্দুচন্দ হার গড়াতে চাই, শ্রেষ্ঠ রত্নের সমাহারে বানাবেন গহনাটি, মূল্যের জন্য ভাববেন না।'
'আচ্ছা বেশ, দেবী রাজশ্রীর সাথে এবিষয়ে আলোচনা করে নেব আমি', হেসে উত্তর দেন ধনঞ্জয়।
'গৃহিনীকে জানানোর প্রয়োজন নেই, আপনি নিজরুচি অনুযায়ী তৈরী করুন। আর গহনা প্রস্তুত হলে সেটি আমার কার্যালয়ে পৌঁছে দেবেন।' উগ্রসেনের বক্তব্যে কিছুটা রুক্ষতা প্রকাশ পায়, ধনঞ্জয় আর কথা না বাড়িয়ে বিদায় নেন।

***

কার্যালয়ে অপরাহ্নপ্রায়, উগ্রসেনের কর্মকক্ষ দীপের আলোয় আলোকিত। উগ্রসেন ও বজ্রবাহু সেখানে সামরিক বিষয়ে আলোচনায় ব্যস্ত, যথারীতি শ্রীদামও রয়েছেন সাথে। বজ্রবাহূ মনে করেন কিছু গজসেনা শিবিরে যুক্ত হলে ভাল হয়, এতে শক্তি বাড়বে, তিনি উগ্রসেনের আনুমতি চান এ বিষয়ে।
'আমার মতে গজসেনা শক্তি নয় বাধাসৃষ্টি করবে অযথা', শ্রীদাম নিজের মতামত জানান। উগ্রসেনের একান্ত কাছের মানুষ হওয়ার সুবাদে এসকল আলোচনায় তিনি অবাধে নিজের বক্তব্য রাখেন, উপারিক তাঁর চিন্তা ভাবনাকে গুরুত্ব দেন।
'একথা কেন বলছেন ভদ্র?' উগ্রসেন আপত্তির কারণ জানতে চান।

‘আমাদের সামরিক শিবিরের প্রধান কাজ সীমা সুরক্ষায় সহায়তা, সেক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতা অতি জরুরি। গজসেনা শক্তিশালী কিন্তু গতিমান নয়, যদি সত্বর কোথাও যেতে হয়, এদের কারণে পুরো শিবিরের গতি হ্রাস পাবে।’

‘সামরিক বিষয়ক সিদ্ধান্তে প্রশাসনিক আধিকারিকের মতামত নিতে গেলে তো কাজ করাই অসম্ভব! যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা নেই যার, তাকে গজসেনার সুফল বোঝাই কি করে?’ বজ্রবাহু রীতিমত বিরক্ত হন শ্রীদামের মন্তব্যে।

‘আপনি উত্তেজিত হবেন না সেনাধিপতি, ভদ্র শ্রীদামের ভাবনায় যুক্তি আছে। গতি হ্রাস পাবে সেনার এবিষয়ে সন্দেহ নেই আমারও, তবে আপনার যুক্তিও শুনতে আগ্রহী আমি।’

‘গজসেনা শিবিরের প্রতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী হবে, শিবিরের বহির্বৃত্তে যদি এদের ব্যবহার করা হয়, তাহলে অল্প সংক্ষক সেনা নিয়েও শিবির প্রতিরোধ করা সম্ভব।’

‘কিন্তু, আমাদের সামরিক শক্তি যথেষ্ট, গজসেনা না থাকলেও শিবির অতি সুরক্ষিত। তাছাড়া, সেনা শিবির আক্রমণ করতে গেলে শত্রুকে সীমা পেরিয়ে কান্যকুব্জে আসতে হবে, সে অসম্ভব!’ শ্রীদামের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে গজসেনার প্রস্তাব বাতিল করে দেন উগ্রসেন। বজ্রবাহূর মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে ওঠে অপমানে।

‘আপনি এই বিষয়টিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেবেন না আর্য, শ্রীদামের যুক্তি সঠিক মনে হয়েছে আমার এক্ষেত্রে।’ সেনাপতিকে একান্তে শান্ত করার চেষ্টা করেন উগ্রসেন।

‘আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনাকে পরামর্শ দিতে যাওয়া আমার পক্ষে বাতুলতা, তবু বলব, বিশ্বাসযোগ্যতা সকলক্ষেত্রে চিরস্থায়ী হয়না। ‘কথাটি বলে বিদায় নেন বজ্রবাহূ। উগ্রসেনের কপালে চিন্তার রেখা প্রকট হয়, সেদিনকার মত কার্যালয় ত্যাগ করেন তিনি আনমনে।

***

একপক্ষকাল কেটে গেছে, রাজশ্রী কন্যাদের নিয়ে পিত্রালয়ে বাস করছেন কিছুদিন হল; উগ্রসেন আপত্তি করেননি, শুধু জানিয়েছেন, ফেরার আগে সংবাদ দিতে, তিনি চতুর্দোলা ও রক্ষীদল পাঠাবেন। রাজশ্রীর মনে ক্ষীণ আশা, হয়তো তার প্রয়োজন হবে না, স্বামী নিজেই আসবেন তাঁদের নিতে, ধনঞ্জয়কে গহনার বরাত দিতেই ডেকেছিলেন তিনি, সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই।

এক অপরাহ্নের মায়াবী আলোয় মুখোমুখি বসে উগ্রসেন ও বসন্তমল্লিকা; সুরার প্রভাবে অল্প ঘোর লেগেছে উপারিকের চোখে, আজ আর গৃহে ফেরার তারা নেই তাঁর, গৃহিনীহীন গৃহে চক্ষুলজ্জা অপ্রয়োজনীয়। কক্ষের বাইরে পাহারায় আছে তাঁর দেহরক্ষীর দল, সাবধানতার অভাব নেই বিলাসগৃহেও।

‘আপনি এই স্থান রাত্রিবাসের যোগ্য মনে করেছেন, আমি ধন্য প্রভু; কিভাবে আপনার সেবা করব জানিনা।’

‘সেবা তো দাসীরা করে, তুমি বিলাসিনী নারী, মনরঞ্জন করবে।’

‘আপনি যথার্থ বলেছেন আর্য, গণিকার কাজ অতিথির ক্লান্তি দূর করে আনন্দ দেওয়া, সেবায় তার কী বা অধিকার’; উগ্রসেনের কথায় আহত হলেও নিজেকে সামলে উত্তর দেয় নর্তকী।

‘সেবা একঘেয়ে, ক্লান্তিকর, না চাইতেও মেলে; কিন্তু তোমার শ্রম মূল্য দিয়ে কিনতে হয়, তাইতো আকর্ষনীয়। নিজেকে সুলভ কোরনা সেবা দিতে চেয়ে।’ উগ্রসেনের ঠোঁটের কোনে স্মিত হাসি দেখা দেয়।

‘আমার সমগ্র রাত্রি কিনতে কি মুল্য ধার্য করেছেন দেব? জেনে রাখি নিজের সঠিক দাম।’

‘এটি দেখ তো যথেষ্ট হবে কিনা?’ উগ্রসেন মখমলের পেটিকা থেকে বের করেন সদ্য তৈরি করা ইন্দুচন্দ হার, প্রায় চার হাত দীর্ঘ এই হারে একশত মাণিক্য ঝলসে ওঠে দীপের আলোয়। চমকে ওঠে বসন্তমল্লিকা, এরূপ উপহার তারও কল্পনার অতীত ছিল, এ যে রাজ অন্তঃপুরের উপযুক্ত আভরণ, রাজলক্ষীর শোভা!

তবে উগ্রসেন বেহিসেবী নন, উপহারের প্রতিদান নিতে জানেন তিনি ভালোভাবেই, সে কথা বুঝতে বেশী সময় লাগেনা বসন্তমল্লিকার।

***

সম্প্রতি মাসাধিককাল ভৃগুকচ্ছে কাটিয়ে নগরে ফিরেছেন চারুদত্ত, তনুশ্রীর কাছে তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রন সেকারণে। সে নিজের হাতে নানান পদ রেঁধেছে সকাল থেকে, গণিকা হলেও রান্নায় পারদর্শী তনুশ্রী। সদ্য আহার শেষ হয়েছে, প্রেয়সীর হাতে সাজা তাম্বুল মুখে দিয়ে বিশ্রামের উদ্যোগ করছেন শ্রেষ্ঠী, এরকম সময়ে বসন্তমল্লিকা দেখা দেয় তনুশ্রীর মহলে।

'এতকাল ডুমুরের ফুল হয়েছিলেন, এখন দেখা দিয়েই দিবানিদ্রার মতলব?' বিশ্রামকক্ষে ঢুকে শ্রেষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে বলে সে। চারুদত্ত তনুশ্রীকে যেমন স্নেহ করেন, মর্যাদা দেন, তার সখীটিকেও রসিকা শ্যালিকার মত মনে করেন। মাঝে মাঝেই তিনজনের হাসি তামাশার আসর বসে তাই।

কিছু সময় পরে শ্রেষ্ঠীকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে দুই সখীতে অন্য ঘরে যায় নিভৃত আলাপের জন্যে। বসন্তমল্লিকা গণিকাশ্রেষ্ঠা, তবু সে তার নবীন হৃদয়খানি নিয়ে হয়তো বা বড় একা, তনুশ্রীই তার সুখদুঃখের সাথী। ঝলমলে রাত্রির শেষে দিনের আলোয় সেও আর পাঁচটি মেয়ের মতই স্বাভাবিক হতে চায়।

'শ্রেষ্ঠী কি আনলেন তোমার জন্য, দেখালে না তো?' তনুশ্রীর কাছে জানতে চায় সে।

'ভিতরের অলিন্দের দাঁড়ে রয়েছে, দেখে এসো, একজোড়া শুক-শারী, কথা বলে' ; লাজুক হেসে জানায় তনুশ্রী।

'ওমা, নিজের অবর্তমানে তোমার মনরঞ্জনের ব্যবস্থা বুঝি?'

'উপহার সামান্যই, তোমার ইন্দুচন্দ হারের কাছে অতিতুচ্ছ', তনুশ্রীর মুখখানি পরিপূর্নতার আনন্দে ঝলমল করে ওঠে।

'তুমি ভুল করছ সখী, চারুদত্ত তোমার হৃদয়ের মূল্য দিয়েছেন, আর উগ্রসেন আমার রূপযৌবনের। এবার তুমিই বল কার দাম বেশী, হৃদয় না যৌবনের?' পরম স্নেহে তনুশ্রীর চিবুকখানি ছুঁয়ে উত্তর দেয় বসন্তমল্লিকা।

***

'ভদ্র ধনঞ্জয়কে কিছু অর্থ দেবার ব্যবস্থা করুন' একদিন কর্মকক্ষে দৈনিক কাজ সারতে সারতে শ্রীদামকে নির্দেশ দেন উগ্রসেন।

'তার গহনা বাবদ পাওনা তো আপনার ব্যক্তিগত খাতা থেকে মিটিয়ে দিয়েছি প্রভু, আরও কিছু বাকি আছে কি?'

'না এই অর্থ সরকারি খাতে দেবেন, এ তার অন্য কাজের পারিশ্রমিক।'

'কিন্তু গত ছয় মাসে সে তো কোনও তথ্য দিতে পারেনি আমাদের?'

'এখন পারেনি, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে পারবে। আপনি কি ভুলে গেছেন, তার দেওয়া সংবাদের উপর ভিত্তি করে গত বছর এক যবন চর ধরা পরেছিল? প্রশাসনিক কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ন নথি পাওয়া গিয়েছিল তার গৃহে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু চর দেশান্তরী হয়েছিল রক্ষীরা তার গৃহে পৌঁছাবার আগেই।' শ্রীদামের স্বর কিছুটা ক্ষুণ্ণ শোনায়।

'কিন্তু সে জন্যে তো ধনঞ্জয় দায়ী নয়, তার দেওয়া সংবাদ তো খাঁটি ছিল।'

'সে কি আবার কোনও তথ্য এনেছে আপনার কাছে?' শ্রীদামের স্বরে সন্দেহের সুর স্পষ্ট হয়।

'আপনি কি কৈফিয়ৎ চাইছেন আমার কাছে? সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনধিকারচর্চা, একথা স্মরনে রাখলে আপনারই মঙ্গল', উগ্রসেন রুক্ষস্বরে ধমকে ওঠেন।

'মার্জনা করবেন প্রভু, আমি কি কোনও অসঙ্গত কাজ করেছি?'

'আপনি সেদিন বজ্রবাহুর বিরূদ্ধাচারন করেছিলেন কেন? সে কি শুধুই সামরিক নীতির কারনে, নাকি কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ?'

'এ আপনি কি বলছেন দেব? আমি আপনার আজ্ঞাবহ আধিকারিক। বিগত কয়েক মাস ধরে, সামরিক শিবিরের পশুখাদ্য বাবদ যে হিসাব জমা পড়েছে কার্যালয়ে, তা অত্যাধিক ও অন্যায্য। এর উপর আবার গজসেনার প্রস্তাব কেন যেন ঠিক স্বার্থহীন মনে হয়নি আমার।'

'আপনি কি বজ্রবাহু কে চোর সন্দেহ করেন? আর সেক্ষেত্রে কথাটা আমাকে জানাননি কেন?'

'আপনাকে জানাতে গেলে উপযুক্ত প্রমাণ চাই, শুধুমাত্র সন্দেহের বশে নালিশ করা চলেনা। আগামী সপ্তাহে একজন হিসাব পরীক্ষক পাঠাবো শিবিরে, সেরকমই ইচ্ছা ছিল।'

'আপনি এখন আসতে পারেন, আর ধনঞ্জয়কে অর্থ পাঠাতে ভুলবেননা', শ্রীদামকে বিদায় দিয়ে চিন্তায় ডুবে যান উগ্রসেন। উপারিকের জীবন সন্দেহকুটিল, কে যে কখন বিশ্বাসঘাতকতা করে! অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি।

*** ***

অধ্যায় ৪

মথুরা এক প্রাচীন ও উন্নত নগরী, যবন ও কুষাণ রাজবংশের রাজত্বকালে এখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অনুপম স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। কুষান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছে বৌদ্ধ চৈত্য ও স্তূপ; কুষাণ পরবর্তী নাগবংশ ও বর্তমানের গুপ্ত শাসনেও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি এই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সকল ধর্মের প্রতি উদার মনভাব পোষন করেন, সম্প্রতি সিংহলরাজ মেঘবর্নকে তিনি অনুমতি দিয়েছেন উরুবেলা গ্রামের সামবোধি মন্দিরের চত্বরে একখানি বৌদ্ধ মন্দির নির্মানের। তাঁর ছত্রছায়ায় মথুরার গরিমাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর্যাবর্ত তথা বিদেশের বহু বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের পদার্পনে বহুজাতিক হয়ে উঠেছে এই মথুরা অঞ্চলের সংস্কৃতি।

মথুরা নগরীর নাগ বংশীয় রাজপ্রাসাদটি এখন মহাদণ্ডাধিকারিকের কার্যালয় ও বাসস্থান, এছাড়াও সেখানে গড়ে উঠেছে রাজকীয় অতিথিশালা, মাগধী আধিকারিক ও সম্মানীয় অতিথিরা নগরীতে থাকাকালীন সেখানেই বসবাস করেন। কয়েকদিন হল কুমার পুষ্পকেতু এসেছেন মথুরায়, সাথে আছেন প্রিয়বন্ধু উল্মুক, তাঁরাও উঠেছেন সেখানেই।

গুপ্ত রাজবংশের সন্তান পুষ্পকেতু, মগধ দণ্ডাধিকারিকের কনিষ্ঠ পুত্র, কিন্তু জন্ম পরিচয় অতিক্রম করে নিজগুণে আত্মপরিচয় তৈরি করতে পেরেছেন তিনি এই তরুণ বয়সেই। কয়েকমাস হল তিনি সুদূর সুবর্ণভুমি থেকে ফিরেছেন; মগধ সম্রাটের প্রতিভূ হয়ে গিয়েছিলেন শৈলদেশে, চাঞ্চল্যকর অভিযান, ষড়যন্ত্র, সব মিলিয়ে ঘটনাবহুল ছিল এই যাত্রা। তবে তাঁর পরিব্রাজক মন শুধু এতেই তুষ্ট নয়, দেশ ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, কুমারের কাছে এতেই জীবনের সার্থকতা। মহামন্ত্রী হরিষেণের তিনি প্রিয়পাত্র, নিজের বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে ক্রমশঃ তাঁর চক্ষু-কর্ণ হয়ে উঠেছেন কুমার। সম্প্রতি, পুষ্পকেতু দেশভ্রমণের উদ্যোগ নিচ্ছেন জেনে হরিষেণই তাঁকে মথুরা যাত্রার প্রস্তাব দেন। ভ্রমণের সাথে সাথে সীমান্তবর্তী সদ্য অধিকার করা অঞ্চলটির পরিস্থিতিও বুঝে নেবেন কুমার, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। উল্মুক কুমারের ছায়াসঙ্গী, শিক্ষিত অভিজাত বংশীয় মানুষটির মধ্যে একটি রসিক মন আছে, পুষ্পকেতু বন্ধুর সান্নিধ্য উপভোগ করেন সেই কারনে।

‘বলি আর তো পারা যাচ্ছে না হে!’ অতিথিশালার উদ্যানে প্রাতঃভ্রমণ করছেন দুই বন্ধু, হঠাতই দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন উল্মুক।

‘তোমার আবার কি হল? বেশ তো খাচ্ছ দাচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছ, মথুরার হাওয়ায় গাল দুটিও দ্রাড়িম্ব হয়ে উঠেছে কয়েকদিনেই।’

‘আরে সমস্যা তো সেখানেই, এ অঞ্চলের দুগ্ধ, ঘৃতের প্রভাবে খুব শীঘ্রই যে একটি নধর হস্তিশাবকে পরিণত হব সে দুশ্চিন্তায় অনিদ্রার উপক্রম হয়েছে।’

‘অনিদ্রার লক্ষণ তো গত রাতে কিছু দেখলাম না, আমার কক্ষ থেকে তোমার নাসিকা গর্জন শুনতে পেয়েছি বেশ।’

‘আহা, সে তো আমার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ; তুমি বড় বেরসিক।’

‘শীঘ্র তোমার কষ্ট লাঘবের বন্দোবস্ত করতে হয় তাহলে, চল কাল উত্তরের দুর্গ পরিদর্শনে যাই, সেখানেই থাকা যাবে কয়েকদিন, দুর্গাধিশ বলভদ্রকে সংবাদ পাঠিয়েছেন দণ্ডাধিকারিক। সেখানে শুকনো যবের রোটিকা আর মসুরিকা খেয়ে মনের অশান্তি দূর কোরো।’

‘অহোঃ! তোমার বন্ধু-বাৎসল্য ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে।’ উল্মুকের কথায় হেসে ওঠেন দুজনেই।

***

উত্তর সীমান্তে একটি টিলার উপর একখানি ছোট দুর্গ, সেখানে একশত পদাতিক ও দশজন ধনুর্ধর নিয়ে বাস করেন সেনাপতি বলভদ্র। সামরিক শক্তি বেশী না হলেও উচ্চতার কারনে দূর্গটির বিশেষ সুবিধা আছে; বলভদ্র নিয়মিত ছোট ছোট সেনাদল পাঠান আশে পাশের অঞ্চলে। মথুরা কান্যকুব্জ ভুক্তির অন্তর্গত, বলভদ্র উপারিক উগ্রসেনের অধস্তন সেনানায়ক, দূতের মাধ্যমে এই অঞ্চলের সংবাদ পাঠান উপারিকের কার্যালয়ে প্রতি একপক্ষকাল অন্তর।

পুষ্পকেতু ও উল্মুক এসেছেন দুর্গে, বলভদ্র সাথে নিয়ে ঘুরে দেখিয়েছেন সবকিছু। এখানে কিছুদিন থাকার প্রস্তাব করায় সানন্দে মেনে নিয়েছেন দুর্গপতি; পাটলীপুত্রের রাজপুরুষ তাঁর দুর্গে মনযোগী হয়েছেন, এ শুধু সম্মানের নয়, বলভদ্রের ভবিষ্যৎ পদোন্নতির পক্ষেও আশাব্যঞ্জক।

শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া, প্রায় চন্দ্রহীন রাত্রি, বিশ্রামকক্ষের জানালার ধারে বসে গল্প করছেন দুই বন্ধু। রাতের আহার কিছু আগেই শেষ হয়েছে, বলভদ্র আতিথেয়তা সেরে বিদায় নিয়েছেন সেই সাথে।

‘যাই বল তুমি কেতু, মথুরার লোক বড় অতিথিবৎসল; দুর্গ বলে শুকনো রোটিকার ব্যবস্থা করেনি মোটেই। আহা, নিরামিষ আহারেও কত স্বাদ! আচ্ছা, এখানে বেশীরভাগ মানুষ নিরামিষাশী, সে কি বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে?’

‘হ্যাঁ মূলতঃ তাই, সাথে বিষয়টি স্থানীয় সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে কালের প্রবাহে।’

‘কুষানেরা তো অগ্নির উপাসক, তাহলে এত বৌদ্ধ মন্দির, স্থাপত্য, এসবের কারণ কি?’

‘দেখো, কুষানরা মূলতঃ বহিরাগত, কিন্তু ক্রমে তারা স্থানীয় সংস্কৃতি, লোকাচার, ভাষা সবই আয়ত্ত্ব করে, তখন থেকেই এখানে ধর্মীয় কেন্দ্রীকরন ঘটেছে, কুষানেরা নিজস্ব ধর্মের সাথে বৌদ্ধধর্মকেও গ্রহন করেছে; সম্রাট কনিষ্ক স্বয়ং বৌদ্ধ মনভাবাপন্ন ছিলেন। যেখানে রাজপরিবার এক বিশেষ ধর্মের সহায়ক, সাধারণ প্রজার মধ্যে তার প্রভাব তো পড়বেই।’

‘তা বটে, ঠিক যেভাবে সুবর্নভূমিতে হিন্দুত্বের প্রভাব প্রকট হয়েছে রাজ আনুকুল্যে।’

‘ঠিক তাই। সে দেশ সত্যি সোনার দেশ, সুজলা, সুফলা, শান্তিময়।’ স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আবেগে নরম হয়ে আসে পুষ্পকেতুর কণ্ঠস্বর।

‘ভুলতে পারছ না, তাই না?’

‘ভুলতে চাইছি না।’

‘এখনও সময় যায় নি কেতু, হয়তো চেষ্টা করলে...’

‘থাক না বন্ধু সেসব কথা, কিছু ঘটনা স্মৃতিতেই বেশী মধুর।’ দুই বন্ধুর আলাপন অন্ধকার রাত্রির মতই বিষাদগম্ভীর হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হয়, নিদ্রার বক্ষে তলিয়ে যায় চারিধার, রুদ্ধ আবেগ নিয়ে শয়ন করেন দুই তরুণ।

***

চন্দ্রমাহীন নিশুতি রাত সকলের জন্যে নিদ্রালু নয়, তস্কর ত্রিদিব ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় এক নিশাচর সরীসৃপের মত, ঝোপ ঝাড় পেরিয়ে, অতি সন্তর্পনে; তার গন্তব্যস্থল কান্যকুব্জ সামরিক শিবির। রাতের অতিথি সে, গৃহস্থ গৃহে এমনি নিঃশব্দেই সিঁধ কাটে সকলের অজান্তে। কিন্তু তার আজকের অভিযান ধন নয় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। কিছুকাল আগে এক শ্রেষ্ঠীর গুদামে সিঁধ কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছিল রক্ষীদের হাতে, সাধারণত তাকে ধরা রক্ষীদের কর্ম নয়, কিন্তু সেদিন দীর্ঘ রোগভোগের পরে কাজে বেরিয়েছিল সে অশক্ত শরীরে, ফলে অসাবধান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, যে কোনও কারনেই হোক শ্রেষ্ঠী তাকে কারাগারে পাঠাননি, বলেছিলেন প্রতিদান নেবেন পরিবর্তে। দুইদিন আগে তিনি যখন এই কাজের কথা জানান, কিছুটা কৃতজ্ঞতা, কিছুটা শঙ্কা নিয়ে রাজী হয়েছিল সে। এই কাজে বিফল হলে ধরা দেওয়া চলবেনা, কোমরের কষিতে আছে ধুতুরার বিষ, প্রয়োজনে মুখে পুরে দিতে হবে, তাতেই সব শেষ। শ্রেষ্ঠী অর্থ দিয়েছেন যথেষ্ট, কার্যসিদ্ধি হলে দেবেন আরও; তবে ধরা পরলে, পরিবারের সর্বনাশ ঘটবে জানিয়েছেন সেকথাও। হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে পেঁচা ডেকে ওঠে কোথাও, মনে মনে বৃদ্ধা মাতা ও ছোট দুটি ভাইবোনের মুখ স্মরণ করে, আবার মনঃসংযোগ করে সে।

***

দুইদিন কেটে গেছে, সুশান্ত আবার গিয়েছেন শঙ্কুদেবের বাসস্থানে, হাতে পত্নীর জন্মপত্রিকা।
‘এটি আজ রেখে যান ভদ্র, ভাল করে বিচার করা প্রয়োজন, গণনা শেষ হলে সংবাদ দেব আপনাকে’; পত্রিকাটি হাতে নিয়ে জানান আচার্য।
সেদিন সভাশেষে দ্বাররুদ্ধ কক্ষে দীপের আলোয় শঙ্কুদেব মেলে ধরেন লিপিখানি, সেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সামরিক শিবিরের মানচিত্র। তাঁর মুখভাবে ফুটে ওঠে উল্লাস ও জিঘাংসার এক অদ্ভূত মিশ্রণ।

অধ্যায় ৫

‘শ্রেষ্ঠী পশুপতি নগরে এসেছেন গতকাল, আমার সাথে ব্যবসায়িক সাক্ষাৎ করবেন আজ অপরাহ্নে, বার্তা এনেছিল তাঁর অনুচর।’ দিবা প্রথম প্রহর তখনও শেষ হয়নি, ভোরের নরম আলোয় উগ্রসেনের গৃহের বসবার ঘরটি ছায়ামাখা। ধনঞ্জয় উপস্থিত হয়েছেন জরুরী সংবাদ দেবার উদ্দেশ্যে।
‘শ্রেষ্ঠী উঠেছেন কোথায় জানা গেছে?’
‘হ্যাঁ, বজ্রপাণির ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছেন তিনি, অনুচরটিকে প্রশ্ন করে জেনেছি, পরে আমার কর্মশালার এক সহকারীকে পাঠিয়েছিলাম লোকটিকে অনুসরণ করতে, সে এখনও ধর্মশালার সমুখে অপেক্ষায় আছে আশা রাখি।’
‘ভালো করেছেন, আমার কার্যালয় থেকে দুজন চর পাঠাচ্ছি সেখানে পাহারার জন্যে, আপনার লোকটি পশুপতিকে চেনে কি? তাহলে সে চিহ্নিত করে দেবে তাকে চরেদের কাছে।’
‘হ্যাঁ, সে চেনে শ্রেষ্ঠীকে, আমি এখন ফেরার কালে তাকে উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে যাব, আপনি কার্যালয় কর্মীদের আমার সাথে দিয়ে দিন।’

‘তারা সামান্য পোশাকে যাবে, আপনার অশ্বকে অনুসরণ করে। সহকারীটির সাথে ধর্মশালার কাছাকাছি তাম্বুল বিপণির সামনে গিয়ে কথা বলবেন, আপনি বিদায় নিলে, আমার কর্মীরা সেখানেই যোগাযোগ করে নেবে লোকটির সাথে।’ উগ্রসেনের নির্দেশ বুঝে নিয়ে বেরিয়ে যান ধনঞ্জয়, এই কাজে কোনও ভুল হলে উপারিকের রোষে পড়তে হবে, সেকথা জানেন তিনি ভালভাবেই।

***

‘গতবার বেশ কিছু পদ্মরাগ নিয়েছিলেন আপনি, এখন সংগ্রহে আছে সিংহলী পদ্মরাগ, নেবেন কি কয়েকটি?’ শ্রেষ্ঠী পশুপতি এসেছেন ধনঞ্জয়ের বিপণিতে, সেখানেই কথবার্তা চলছে। পশুপতি রত্ন কারবারী, নগরীতে এলে বিশিষ্ট কিছু রত্নকারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পূর্বে লোক মারফৎ সরবরাহ করতেন পণ্য, তবে কিছুকাল হল নিজেই যাতায়াত করছেন।

‘না, এই তো দুইমাস হল নিয়েছিলাম পদ্মরাগ, এখনই প্রয়োজন নেই আর।’

‘সে কি? আপনি নিশিষ্ট মণিকার, উত্তম মণি মাণিক্যের প্রয়োজন তো আপনারই সর্বাধিক।’

‘না না, নগরীর অনেক স্বর্ণকার আমার থেকে বেশী ব্যস্ত। আমার কর্মশালা তেমন বড় নয়।’

‘এ আপনার বিনয়, উপারিকের পরিবারের মণিকার আপনি, সম্প্রতি ইন্দুচন্দ হার গড়িয়েছেন তাঁর নির্দেশে, আপনি সামান্য নন।’ পশুপতির মন্তব্য শুনে চমকে ওঠেন ধনঞ্জয়।

‘আপনি জানলেন কি করে সেকথা? এ অতি ব্যক্তিগত বিষয়।’

‘না, না, লোকমুখে কানে এলো তাই।’ ধনঞ্জয়ের স্বরে মৃদু ভর্ৎসনা শুনে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করেন পশুপতি।

‘কার কাছে শুনলেন এরূপ গূঢ় সংবাদ?’

‘কি জানি বলতে পারিনা, হয় তো বা অন্য কোনও স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছে। আপনি বিব্রত হবেননা, আমি এ বিষয়ে আলোচনা করিনি কারো সাথে।’ পশুপতি অবস্থা সামাল দেবার চেষ্টা করেন, যদিও ধনঞ্জয়ের মুখ আঁধার হয়ে ওঠে। এর পরে আর আলোচনা এগোয় না বেশীদূর, কয়েকটি মুক্তা ও দুটি কমলহীরা নিয়ে শ্রেষ্ঠীকে বিদায় দেন ধনঞ্জয়।

***

‘সংবাদ গুরুতর, আপনার সাহায্য ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়।’ আধো অন্ধকারে ঢাকা একখানি কক্ষ, সেখানে নিভৃত আলোচনা চলছে। কক্ষটি শ্রীদামের গৃহের পিছন দিকে খিড়কির পুকুর সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত গুদাম ঘর, অতীতে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ব্যবহার করত এটি, সে ছিল পাকা মৎস্যশিকারী। কিন্তু কয়েক বছর হল সে নিরুদ্দেশ, সেই থেকে ঘরটি বন্ধই থাকে। একখানি মাত্র তেলের পিদিম জ্বলছে কুরুঙ্গীতে, সে আলোয় বক্তা পশুপতির মুখভাব বোঝা যায় না কিছু, তবে তাঁর কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

‘সাহায্য তো করেছি আপনাকে যথাসাধ্য, অসৎ হয়েছি আপনার প্ররোচনায়, বজ্রবাহুকে দোষারোপ করেছি অযথা। কিন্তু সামান্য রাজ কর্মচারী আমি, এর বেশী আমার নাগাল কোথায়!’

‘কান্যকুব্জের উপারিকের নিকটজন আপনি একথা জানেন দণ্ডাধিকারিক, এত অল্পে সন্তুষ্ট নন তিনি। যা করবেন শীঘ্র করুন ভদ্র, সময় খুবই অল্প।’

‘আপনি যা চাইছেন তা করতে গেলে বিশ্বাসঘাতী হতে হয়, দীর্ঘ বিশ বছর দায়িত্বে আছি কার্যালয়ের, এর আগে কখনও এমন কাজ করিনি।’

‘এর আগে এরূপ পরিস্থিতি হয়েছিল কি?’

‘আমাকে কয়েকদিন সময় দিন ভদ্র, উপারিক এখন কান্যকুব্জেই স্থিতু আছেন, তাঁর উপস্থিতিতে এ কাজ অসম্ভব।’

‘তাহলে আমাকেও থেকে যেতে হবে, শূন্যহাতে ফেরা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।’

‘চিন্তা নেই ভদ্র, আমাদের ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন থাকতে পারবেন আপনি!’ আচমকা দ্বারের অর্গল ভেঙে কক্ষে প্রবেশ করেন কার্যালয়ের সুরক্ষা প্রধান, তাঁর সাথে জনা ছয়েক সশস্ত্র প্রহরী।

আচমকা এই আক্রমণে হতচকিত হয়ে পড়েন দুজনেই, তাঁদের হাতে বেড়ি পরিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় কারাঘরে; অন্ধকার রাত্রিতে ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায় শ্রীদামের সকলের অগোচরে।

***

‘পশুপতি মুখ খুলেছে?’ দণ্ডাধিকারিক ও কারাধ্যক্ষের সাথে জরুরী আলোচনায় বসেছেন উগ্রসেন গ্রেপ্তারের পরের দিন অপরাহ্নে।

‘না, কিছুই বলতে চায় না সে, শুধু কপালে করাঘাত করছে আর বলছে সে সামান্য রত্ন ব্যবসায়ী, ভৃগুকচ্ছে বাস’; কারারক্ষকের কণ্ঠস্বর হতাশা ব্যঞ্জক।

‘কথা তাকে বলতেই হবে, সহজে না হলে, কঠিন উপায় অবলম্বন করুন। কারাগারের নিষ্ঠুরতম জল্লাদকে বলুন পশুপতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে, তাকে বলবেন, যে করে হোক সব তথ্য আমাদের চাই!’ গর্জে ওঠেন উগ্রসেন।

‘আমি বলি কি, তার আগে একবার শ্রীদামের সাথে কথা বলা যাক, সে যদি মুখ খোলে, তাহলে আর সমস্যা থাকে না’; দণ্ডাধিকারিক চন্দ্রবর্মা মতামত দেন।

‘শ্রীদামকে আপনার থেকে অনেক বেশী চিনি আমি, সে কথা বলবে না কিছুতেই; তার ব্যবস্থা আমি নিজে করব ভিতরের ষড়যন্ত্র ফাঁস হবার পর’; উগ্রসেনের চক্ষু দুটি জ্বলে ওঠে জিঘাংসায়।

***

‘উজ্জয়িনীর কোন স্থানে বাস তোমার?’ কারাধ্যক্ষ প্রশ্ন করেন, তাঁর পাশে অপেক্ষমান জল্লাদের মুখ কারাগৃহের মশালের আলোয় নির্মম, তার হাতে একখানি চামড়ার কশা।

‘আমি ভৃগুকচ্ছের ব্যবসায়ী, সেখানেই বাস করি।’ পশুপতির কথা শেষ হবার পূর্বেই কশাঘাত এসে পড়ে তার পিঠে ও কাঁধে, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায় প্রৌঢ়।

‘ভৃগুকচ্ছে তোমার প্রভু কে? কার নির্দেশে কান্যকুব্জে যাতায়াত করছ?’ এ কথার কোনও উত্তর আসে না, আবারও কশাঘাত, এবার উপর্যুপরি বুকে, পিঠে এমনকি মুখেও। নিজেকে বাঁচানোর অক্ষম চেষ্টা ছেড়ে পশুপতি আত্মসমর্পন করেন জল্লাদের হাতে।

‘শ্রীদামের সাথে তোমার সম্পর্ক কি?’

‘তার সাথে আত্মীয়তার সম্বন্ধ, যা নিতান্তই ব্যক্তিগত।’

‘রাষ্ট্রনীতিতে কিছুই ব্যক্তিগত নয়; বল তার কাছে কিসের সাহায্য চেয়েছিলে?’

‘কিছুদিন যাবৎ অর্থকষ্টে আছি, তাই অর্থসাহায্য চেয়েছিলাম, এর বেশী কিছু নয়।’

‘রত্নব্যবসায়ী অর্থভিক্ষা করে সরকারী আধিকারিকের কাছে, এই কথা বিশ্বাস করতে বল আমাদের? তোমার তোরঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে বেশ কিছু মূল্যবান রত্ন, এই কি অর্থকষ্টের নমুনা?’ এরপর চলতে থাকে নিরন্তর কশাঘাত, রক্তাক্ত শরীরে লুটিয়ে পড়ে বন্দী প্রৌঢ়। জল্লাদের শরীর স্বেদময়, সেও ক্লান্তি দূর করতে বিরতি নেয় কিছুক্ষণের জন্য। চরম হতাশায় ক্রমে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কারাধ্যক্ষের মুখ।

***

‘একটি দুঃসংবাদ আছে প্রভু’ ; পরের দিন উগ্রসেনের কার্যালয়ে কারাধ্যক্ষকে সাথে নিয়ে ছুটে আসেন দণ্ডাধিকারিক।

‘কি হয়েছে? পশুপতি কিছু বলছে না?’

‘পশুপতি আর কোনওদিনই কিছু বলবে না।’

‘স্পষ্ট করে বলুন কি ঘটেছে!’

‘কাল সমস্ত দিন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ভোরে তাকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করে কারারক্ষী’, দণ্ডাধিকারিকের স্বরে অনুশোচনা।

‘অর্বাচীনের মত কাজ করেছেন আপনারা, এখন উপায় কি হবে বলুন?’

‘প্রভু, শ্রীদামকে নিয়ে চেষ্টা করে দেখি, আমাকে আর একটি দিন সময় দিন। পশুপতির মৃত্যু হয়েছে জল্লাদের হাতে, একথা শুনলে সে নিশ্চুপ থাকতে সাহস করবে না।’, কাকুতি জানান কারাধ্যক্ষ।

‘থাক, আপনি অনেক দক্ষতা দেখিয়েছেন, এবার শেষ যোগসূত্রটিও নষ্ট হবে আপনার নির্বুদ্ধিতায়’ ; ভর্ৎসনা করে ওঠেন উগ্রসেন।

‘প্রভু, আমি কিছু অন্যরকম চিন্তা করেছি, অভয় দেন তো বলি’, দণ্ডাধিকারিক মন্তব্য করেন।

‘আপনার কি বলার আছে শুনি ; এখন তো উপায়ও কিছু দেখছি না আর।’

‘আমি বলি কি, পশুপতির মৃত্যুসংবাদ আপাততঃ গোপন থাক। শ্রীদামের সাথে আমি নিজে বার্তালাপ করব। তাকে জানাব যে, পশুপতি সকল কথা বলে দিয়েছে, এখন আত্মসমর্থনে তার কি বলার আছে জানতে আমরা আগ্রহী।’ দণ্ডাধিকারিকের বক্তব্য শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করেন উগ্রসেন, তারপর অনুমতি দেন এ বিষয়ে।

‘কিন্তু স্মরনে রাখবেন, শ্রীদামের কোনোরূপ শারিরিক ক্ষতি হলে দায়ী থাকবেন আপনারা দুজন!’ সাবধান করে দেন উপারিক।

***

‘আপনি আমার বহুদিনের সহকর্মী, ব্যক্তিগতভাবে কোনও বৈরী নেই আপনার সাথে। সেকারণে, চাইনা কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক।’ শ্রীদামের কারাকক্ষে মুখোমুখি দুটি সুখাসনে বসে দণ্ডাধিকারিক ও শ্রীদাম। শ্রীদামের হাতে বন্ধন নেই, শুধু কক্ষের দরজার বাইরে প্রহরায় আছে দুইজন রক্ষী।

‘আমি অপেক্ষা করছি ভদ্র, আপনি নিজ বক্তব্য জানান।’ শ্রীদাম চুপ করে আছেন দেখে দণ্ডাধিকারিক আবার বলে ওঠেন।

‘আমার কিছু বলার নেই, একথা জানিয়েছি আগেই।’

‘কিছুই বলার নেই, আত্মপক্ষ সমর্থনেও না?’

‘না।’

‘কিন্তু আপনার সহকারী তো সবকিছু স্বীকার করেছেন আমাদের কাছে’ ; নাটকীয় ভাবে কথাটি বলে ওঠেন দণ্ডাধিকারিক, শ্রীদাম চমকে ওঠেন এই কথায়।

‘শ্রেষ্ঠী যদি বলে থাকেন সব কিছু, আমাকে আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন? প্রাপ্য শাস্তি নিতে প্রস্তুত আছি আমি’ ; শ্রীদামের কণ্ঠস্বর ভিজে আসে আবেগে।

‘তবু দণ্ড দেবার পূর্বে আপনার স্বীকারোক্তি নিতে হবে, এটাই মাগধী বিচারবিধি।

‘পশুপতি যা কিছু বলেছেন, আমি নিঃশর্তে মেনে নিচ্ছি, এর অধিক কিছু বলার নেই আমার।’

‘আপনার অপরাধের বিস্তারিত বিবরন দিন।’

‘বিশদে বলার মত নেই কিছু, এতকালের কর্মজীবনে পদস্খলন ঘটেছে এই প্রথমবার। এখন আপনারা যা সঠিক মনে করবেন।’

‘এত সহজে এর নিষ্পত্তি হবে না ভদ্র, কিভাবে সংস্পর্শে এলেন পশুপতির, এযাবৎ কি কি সরবরাহ করেছেন তাকে, এসবই জানতে চাই আমরা।’

‘পশুপতি তো বলেছেন সব কথা, আমি আর নতুন কি বলতে পারি।’

‘পশুপতি কি বলেছে সে কথা থাক, আমি আপনার কাছে জানতে চাই বিশদে!’ হতাশায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন দণ্ডাধিকারিক। তাঁর প্রতিক্রিয়া মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন শ্রীদাম, চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে তাঁর কপালে।

‘পশুপতি কিছু জানায়নি তাই না? তাকে যতদুর চিনি আমি, সে কিছু জানাবে না’ ; প্রত্যয়ের সাথে মন্তব্য করেন শ্রীদাম, ক্ষীণ হাসি ফুটে ওঠে তাঁর ঠোঁটের কোণে।

‘আপনার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী, আর এর জন্যে দায়ী হবেন আপনি নিজে!’ কথাগুলি বলে কারাকক্ষ ত্যাগ করেন দণ্ডাধিকারিক।

***

‘শ্রীদাম এখনও কারাগৃহে, তবে মনে হয় উগ্রসেন তাকে সময় দেবেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি, পশুপতির মৃত্যু হয়েছে’ ; বিদিশায় সত্যনাগের প্রাসাদে একান্তে আলোচনা চলছে আচার্য শঙ্কুদেব ও সেনাপতির মধ্যে।

‘সব কিছুর মধ্যে এই মৃত্যুই বড় বেদনার; উদ্দেশ্যে সিদ্ধির পথে আরও কত প্রান বলি হতে চলেছে কে জানে!’ দীর্ঘশ্বাস ফেলেন সেনানায়ক।

‘কূটনীতিতে ব্যক্তিগত আবেগের কোনও মূল্য নেই, নিজেকে নির্বেদ করতে শেখো পুত্র’ ; শঙ্কুদেবের মন্তব্যে মৃদু তিরস্কারের সুর স্পষ্ট হয়।

‘কান্যকুব্জে আমাদের প্রস্তুতি কতদূর, সময় হয়েছে কি প্রহারের?’ নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করেন সত্যনাগ।

‘ক্ষেত্র তৈরী আছে, এখন উপযুক্ত ক্ষণের অপেক্ষা। তুমি সৈন্য প্রস্তুত রাখো, আমার কাছ থেকে সংবাদ পেলেই আক্রমণ করবে।’

‘সংকেতের আশায় রইলাম ভগবন, আপনার যাত্রা শুভ হোক।’

*** ***

অধ্যায় ৬

দিন দুয়েক হল পুষ্পকেতু ও উল্মুক মথুরা নগরীতে ফিরেছেন, নগরীর স্থাপত্য ও মন্দির গাত্রের অনুপম ভাস্কর্য্য দেখে সময় কাটছে। স্থাপত্যে ভারতীয় ও যবন শিল্পের অপূর্ব মেলবন্ধন দেখে মুগ্ধ হন দুজনেই।

‘কালজয়ী হবে এই শিল্প, দেখে নিও বন্ধু’, পুষ্পকেতু একটি তথাগত মূর্তি পর্যবেক্ষণ করতে করতে মন্তব্য করেন।’

‘আর্যাবর্ত অদ্ভূত দেশ, যে আসে সেই বাঁধা পড়ে যায় এখানকার মায়ায়।’

‘তা বটে, আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যরাও তো এসেছিলেন সুদূর উত্তর-পশ্চিম থেকে।’

এভাবেই আলোচনা এগিয়ে চলে মন্দির দেখার সাথে সাথে; মধ্যাহ্ন আহারের সময় হতে অতিথিশালায় ফিরে আসেন তাঁরা। রাজপ্রাসাদের মূল দ্বারের কাছে বেশ একটি জটলা চোখে পরে, অতিথিশালার ভিতরেও চাঞ্চল্যকর পরিবেশ, এসব দেখে কৌতুহল বোধ করেন দুই বন্ধু। ভোজনের পরে অতিথিশালার অধিকর্তাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করবেন স্থির করেন পুষ্পকেতু। নিজ নিজ কক্ষে গিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে তাড়াতাড়ি ভোজনকক্ষে পৌঁছন দুজনে, ঘোরাঘুরির ফলে ক্ষিদে পেয়েছে যথেষ্ট। সবে ঘৃত তণ্ডুল ও পর্পট দিয়ে আহার শুরু করেছেন, একজন প্রবীন আধিকারিক হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হন সেখানে।

'আপনাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম দেব, ফিরেছেন শুনে ছুটে এলাম তাই।'

'কি ব্যাপার, কিছু ঘটেছে নাকি?'

'ঘটেছে মানে? একেবারে মহাদুর্ঘটনা! উপারিক উগ্রসেন হত হয়েছেন বিগত চতুর্থী তিথিতে।'

'আজ নবমী, তার মানে পাঁচ দিন কেটে গেছে! এতদিনে সংবাদ পেলেন আপনারা?'

'ঘটনা ঘটে সেদিন সন্ধ্যায়, পরিস্থিতি বিশৃংখল হয়ে ওঠে কান্যকুব্জে। উগ্রসেন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরনে বিশ্বাসী ছিলেন, ফলে সেখানে সিদ্ধান্ত নেবার লোকের অভাব, তার উপরে শুনতে পেলাম ভদ্র শ্রীদামও কারারূদ্ধ হয়েছেন। গোলমাল কাটিয়ে দণ্ডাধিকারিক মথুরায় সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন, এরমধ্যে প্রায় তিন দিন কেটে গেছে। দিবারাত্রি অশ্বচালনা করে দুইদিনের মধ্যে সংবাদ এনেছে দূত।'

'মৃত্যুর কারণ কিছু জানা গেছে? তিনি তো যুবাপুরুষ, রোগজনিত নয় নিশ্চয়ই?'

'বিষপ্রয়োগে মৃত্যু হয়েছে তাঁর', কথাটি জানাতে গিয়ে কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে ওঠে আধিকারিকের।

'তাহলে তো বিষয় গুরুতর; উল্মুক আমাদের বোধহয় যাওয়া উচিৎ অকুস্থলে। সবকিছু জেনে এখানে নিশ্চুপে বসে থাকা যায় না। ভদ্র, আপনি দণ্ডাধিকারিক মহাশয়কে বলে সত্বর আমাদের যাবার ব্যবস্থা করুন।'

'কতশীঘ্র যেতে চান আপনারা?'

'সম্ভব হলে আজই।'

'আজ তো হবে না, তবে কাল প্রাতে যাত্রা করতে পারেন যেন, সে ব্যবস্থা আমরা করব।' এরপর বিদায় নেন আধিকারিক, ভোজনে আর রুচি হয় না কারোরই। অর্ধভুক্ত থালি ছেড়ে উঠে পড়েন দুজনে।

***

পরের দিন প্রথম প্রহরেই যাত্রা শুরু হয়, পুষ্পকেতু ও উল্মুক চলেছেন অশ্ব শকটে, আর একটি রথে আছেন দণ্ডাধিকারিকের অধিনস্ত এক প্রবীন কর্মচারী, তাঁর সাথে রয়েছে পথে প্রয়োজনীয় কিছু শুকনো খাদ্য ও পানীয় জলের কুম্ভিকা। সুরক্ষার জন্য সঙ্গী হয়েছে দশ জন অশ্বারোহী সেনা। অশ্বযানে দিন চারেক লাগবে কান্যকুব্জ যেতে, মহাসড়ক ধরে এগোতে কষ্ট নেই, পথে ধর্মশালা, কিছু দূরে দূরে জলসত্র এ সব কিছুরই ব্যবস্থা রয়েছে মগধ সাম্রাজ্যে।

মধ্যাহ্নভোজন সারতে একখানি পান্থশালায় ক্ষণিকের বিশ্রাম, বেশ মনোরম পরিবেশ; অনেকখানি জায়গা জুড়ে তৈরী এই অতিথি নিবাসটি। এর কাছাকাছির মধ্যেই রয়েছে গ্রামাঞ্চল, আর কিছুদূরে বয়ে চলেছে ছোট একটি শাখানদী। সম্মানীয় অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে অধিপতি নিজেই এগিয়ে আসেন, ভিতরে নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম ও শীতল পানীয়ের বন্দোবস্ত করেন তৎক্ষণাৎ। বাকি কর্মচারী ও সৈন্যদের ব্যবস্থা হয় লাগোয়া একটি অশ্বত্থ বনের ছায়ায়।

'আপনাদের আহারের ব্যবস্থা তেমন উপযুক্ত হল না, আসলে ভাঁড়ারের সঞ্চয় বাড়ন্ত, আজ লোক পাঠিয়েছি গঞ্জ থেকে চাল, ডাল, তরি সংগ্রহ করতে।' পান্থস্বামী দুঃখপ্রকাশ করেন ভোজনের সময়।

'আমরা দিব্য আহার করছি, আপনি ক্ষেদ রাখবেন না মনে, আপনার পাচকটির হাতযশ আছে। অলাবুর ঘন্টটি আর একটু দিতে বলুন দেখি!' উল্মুক বলে ওঠেন, যতটা খাদ্যগুনে, তার চেয়ে বেশী গৃহস্বামীর গ্লানি দূর করতে। আহারে প্রকৃতই তেমন বিশদ ব্যবস্থা কিছু ছিল না।

'আজ বোধহয় আপনার সাপ্তাহিক গঞ্জের দিন?' পুষ্পকেতু প্রশ্ন করেন।

'ঠিক তা নয়, পান্থশালার খরিদারি ভাণ্ডার শূণ্য হবার আগেই করতে হয়, নাহলে অতিথি সেবায় ব্যাঘাত ঘটবে যে। আসলে, কাল সন্ধ্যায় মাগধী সেনার একটি বড় দল হঠাতই এসে পড়েছিল। সেনানায়কদের খাদ্যের বন্দোবস্ত এখানেই হয়েছিল, সৈনিকদের জন্য রসদ জোগাড় হয়েছিল কিছুটা পাশের গ্রাম থেকে, বাকিটা আমার ভাঁড়ার থেকে। তাতেই এই বিপত্তি।'

'মাগধী সৈনিক? কোথা থেকে এসেছিল তারা? গন্তব্যই বা কোথায়, কিছু জানেন এ বিষয়ে?'

'আমি সামান্য মানুষ, প্রশ্ন করিনি কিছু, তবে কথায় মনে হল কান্যকুব্জ থেকে এসেছেন, গন্তব্যস্থল জানা নেই, তবে উত্তর দিশায় গেছেন বলেই মনে হল।'

'উল্মুক, শীঘ্র আহার শেষ কর, বিশ্রামের সময় নেই, এখনই কান্যকুব্জে রওয়ানা দেওয়া প্রয়োজন।'

***

'ভদ্র অভিলাষ, রথে নয়, বাকি পথ আমরা দুজন অশ্বেই যাব, আপনি সাথে শুধু চারজন সেনা দিন'; আহারান্তে পুষ্পকেতু মথুরার আধিকারিককে জানান।

'কিন্তু কুমার, আপনাদের এভাবে যেতে দিতে পারিনা আমি, আপনাদের সুরক্ষা আমার দায়িত্ব!'

'আপাততঃ মগধের সুরক্ষা নিয়ে ভাবুন ভদ্র, আমরা আত্মরক্ষায় সমর্থ। আমি আপনার হাতে দণ্ডাধিকারিকের উদ্দেশ্যে পত্র লিখে দিচ্ছি অবস্থা বুঝিয়ে, আপনি দায়ী হবেননা আমাদের কিছু হলে।' পুষ্পকেতুর দৃঢ় উত্তর শুনে অভিলাষ আর আপত্তি করতে সাহস করেননা, অতএব যাত্রার ব্যবস্থা হয় অবিলম্বে।

'পথে যতটা সম্ভব অলক্ষিত থাকার প্রয়োজন, আভুষন খুলে থলিকায় রাখো', উল্মুককে যাত্রায় আগে নির্দেশ দেন পুষ্পকেতু। বিস্মিত হলেও প্রশ্ন করেননা উল্মুক, বাল্যবন্ধুর চরিত্র জানেন তিনি, অকারণে কিছু বলার মানুষ তিনি নন।

এরপর কান্যকুব্জ যাবার বাকী পথ নির্বিঘ্নেই কাটে, আড়াই দিন পরে কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথির সন্ধ্যায় দণ্ডাধিকারিকের কার্যালয়ে গিয়ে পৌঁছান কুমার তাঁর ছোট দলটি নিয়ে। ধুলি ধুসরিত বসন, আচমকা আবির্ভাব, এসব মিলিয়ে প্রথমে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন দণ্ডাধিকারিক চন্দ্রবর্মা। তবে, পরিচয় পত্র ও নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখে কুমারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন তিনি, পুষ্পকেতু মথুরায় অবস্থান করছেন হরিষেণের প্রতিভূরূপে, এ সংবাদ তিনি জানতেন আগেই।

দ্রুত স্নানাহার সেরে, অতিথিশালারই একটি বিশ্রাম কক্ষে আলোচনায় বসেন পুষ্পকেতু, উল্মুক ও চন্দ্রবর্মা। দীপের আলোয় ছায়াময় পরিবেশ, সকলেরই মুখভাব থমথমে।

'সবকিছু এমন দ্রুত ঘটে গেলো, বড় অসহায় বোধ করছি কুমার, তবু আপনি এসেছেন, এতে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাচ্ছি।' চন্দ্রবর্মা পুষ্পকেতুকে উদ্দেশ্য করে বলেন।

'পরিস্থিতি জটিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই; উগ্রসেনের মৃত্যু, উত্তর সীমান্তে শত্রুর আক্রমণ... আমি কেন যেন বিষয়গুলিকে আলাদা করে ভাবতে পারছি না। আপনি দয়া করে বিশদে বর্ণনা করুন সব কথা।'

'সেদিন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথি, কার্যালয়ের কর্ম শেষ করে উপারিক গিয়েছেন গণিকালয়ে, বসন্তমল্লিকার গৃহে। সেখানে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে নিজ বাসস্থানে ফেরেন তিনি, কিছুদিন যাবৎ গৃহিনী পিত্রালয়ে, তাই একাই বাস করছিলেন সেখানে। ফিরে এসে আহার সেরে শুতে যান উগ্রসেন, এরপরে তাঁকে আর কেউ জীবিত দেখেনি। ভোরবেলায় গৃহসেবক তাঁর কক্ষে কোনও সাড়া না পেয়ে দ্বার ভাঙার ব্যবস্থা করে, ভিতরে প্রবেশ করে সে দেখে তিনি ভূতলে পরে আছেন, চারিপাশে বমন, চক্ষুদুটি বিস্ফারিত, মুখভাব যন্ত্রনায়

বিকৃত। এরপর, ভৃত্যদের চিৎকারে রক্ষীরা ছুটে আসে কক্ষে, বৈদ্যরাজকেও ডেকে আনে তাদের একজন, কিন্তু তিনি এসে জানান মৃত্যু ঘটেছে রাত্রিকালেই, তাঁর কিছু করার নেই আর।' ঘটনা বর্ণনা করেন চন্দ্রবর্মা।

'বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে এই কি মত বৈদ্যের?'

'হ্যাঁ, লক্ষণ দেখে সেরকমই জানিয়েছেন মার্তণ্ডদেব।'

'গৃহ ভৃত্য, পাচক এদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে নিশ্চয়?'

'তাদের প্রত্যেককে কারাগৃহে বন্দী করা হয়েছে, তবে অপরাধ স্বীকার করেনি কেউই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর ব্যক্তিগত সেবক জটাধরকে দিয়ে পরীক্ষা না করিয়ে উপারিক কিছু খেতেন না, সেদিনও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অথচ জটাধর দিব্য সুস্থ আছে এখনও।'

'কি জাতীয় বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু বলতে পেরেছেন বৈদ্য?'

'না, সঠিক করে কিছু বলতে পারেননি।'

'বিষ পানাহার ব্যতীত অন্যভাবেও তো প্রয়োগ করা যেতে পারে, আপনারা সে সম্ভবনার কথা ভেবেছেন কি?' পুষ্পকেতুর এই প্রশ্নে হতচকিত হয়ে পড়েন চন্দ্রবর্মা।

'না এ কথা ভেবে দেখিনি আমরা কেউই।'

'শব পরীক্ষা করেছেন যে আধিকারিক, আমি তাঁর সাথে একবার কথা বলতে চাই, আপনি ব্যবস্থা করুন। উপারিকের পরিবারে কে কে আছেন? তাঁদের সাথেও সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন, আর গৃহকর্মীদের আমি নিজে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই।'

পরদিন সকালে আধিকারিক সুস্মিতের সাথে দেখা করেন পুষ্পকেতু দণ্ডাধিকারিকের কার্যালয়ে, সেখানেই কথাবার্তা শুরু হয় দুজনের।

'মৃত্যুর কারন বিষপ্রয়োগ, এই আপনার মত?'

'হ্যাঁ, বৈদ্যরাজ মার্তণ্ডদেবও তাই মনে করেন।'

'শব পরীক্ষার কালে কোনও আঘাতের চিহ্ন লক্ষ্য করেছিলেন কি?'

'মাটিতে পড়ে গিয়ে কপালে আঘাত লেগেছিল।'

'ঠিক সেরকম আঘাতের কথা বলছি না, ধরুন ছুরিকাঘাত বা সূচীছিদ্র জাতীয়।' পুষ্পকেতুর কথায় কিছুটা বিস্মিত হলেও বুঝতে দেন না সুস্মিত।

'না সে ধরণের কিছু চোখে পড়ে নি। কিন্তু হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করছেন কেন?'

'বিষক্রিয়া পানাহারের মাধ্যমে না হয়ে অন্য প্রকারেও তো হয়ে থাকতে পারে, আমি সেই সম্ভাবনার কথা ভাবছি।'

'তাঁর গ্রীবায় কিছু নখর চিহ্ন ছিল, তবে সেগুলি দু এক দিনের পুরোনো। আর সে চিহ্ন খুবই অগভীর, বিষক্রিয়া নয় রতিক্রিয়ার প্রতীক সেগুলি' ; সুস্মিতের কথায় হেসে ফেলেন উল্মুক গম্ভীর আলোচনার মাঝেও।

'ঠিক কি ধরনের বিষ প্রয়োগ হয়েছে, আন্দাজ করেছেন কিছু?'

'সঠিক করে বলতে পারিনা, তবে লক্ষণ দেখে দুটি বিষের কথাই মনে হয়েছে, ধুতুরা অথবা শঙ্খবিষ। বমন, শরীরে খিঁচ ধরা, অক্ষিপটল ঘোলাটে, এগুলি থেকে সেরকম ধারণাই জন্মাচ্ছে।'

'বুঝলাম। মৃত্যুর সময় সম্পর্কে আপনার কি ধারনা?'

'রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যে মৃত্যু ঘটেছে, মৃতদেহের অবস্থা দেখে সেরকমই আন্দাজ হয়।'

'ধুতুরা থেকে বিষক্রিয়া হতে এক থেকে দুই ঘন্টা সময় লাগে, বিষের মাত্রা বেশী হলে ঘন্টা খানেকের মধ্যেই প্রাণনাশ। শঙ্খবিষের ক্ষেত্রে কিরূপ সময় লাগতে পারে?'

'একথা বলা শক্ত, এটি ধাতব বিষ, স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করলে লক্ষণ প্রকাশ পেতে কয়েকদিনও লাগতে পারে, প্রাণঘাতী হয় না এটি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই। তবে বেশীমাত্রায় সেবন করলে সেক্ষেত্রেও দু এক ঘন্টা।'

***

এরপর সুস্মিতের কাছে বিদায় নিয়ে উপারিকের গৃহে উপস্থিত হন দুই বন্ধু, উদ্দেশ্য তাঁর পত্নী রাজশ্রীর সাথে আলাপ করা। এছাড়া গৃহসেবকদেরও সেখানেই নিয়ে আসবে কারা প্রতীহারী।

সদ্যবিধবা রাজশ্রীর কান্নাভেজা মুখখানি শ্রান্ত, মলিন, ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা বিহ্বলও। জটিলা তার পাশটিতে দাঁড়িয়ে থেকে সাহস জোগায়।

'আপনি পিত্রালয়ে কতদিন আগে গিয়েছিলেন?'

'মাসাধিক কাল হবে; ওঁর শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না, কর্তা বললেন ঘুরে এসো, পিতা মাতার সান্নিধ্যে স্বাস্থ্য ফিরবে'; জটিলা জবাব দেয় তড়িঘড়ি।

'সে সময় আপনার স্বামীর যাতায়াত ছিল কি আপনার পিতৃগৃহে?' জটিলাকে উপেক্ষা করে প্রশ্ন করেন পুষ্পকেতু।

'অবশ্যই, সপ্তাহান্তে অন্ততঃ একবার তো যেতেনই, স্ত্রী কন্যার প্রতি বড় স্নেহশীল ছিলেন তিনি', আবার নিজে থেকে উত্তর দেয় জটিলা।

'ভদ্রে, আমি আপনার সাথে আলাপ করতে এসেছি; আপনার স্বামী্র হত্যা শুধু আপনার পরিবার নয়, সমগ্র মগধের জন্য বড় ক্ষতি। আশা রাখব সে কথা মনে রেখে সাহায্য করবেন আপনি'; পুষ্পকেতুর কথায় বিরক্তির সুর স্পষ্ট হয়। রাজশ্রী এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন, তিনি দৃঢ়স্বরে জটিলাকে কক্ষ ত্যাগ করতে আদেশ করেন, ক্ষুব্ধ হলেও মনিবপত্নীকে চটাতে সাহস করে না জটিলা।

'ক্ষমা করবেন আর্য, বহূকালের পুরানো দাসী, আমাকে আগলাতে চায় কঠিন পরিস্থিতি থেকে'; কথাটি বলতে গিয়ে চোখ ভিজে আসে রাজশ্রীর।

'দেখুন, আমাদের হাতে সময় অল্প, তাই স্পষ্ট প্রশ্ন করছি, স্বামীর সাথে আপনার সম্পর্ক কিরূপ ছিল? তিনি যে গণিকাগৃহে যাতায়াত করেন আপনি জানতেন?' পুষ্পকেতুর প্রশ্ন শুনে কিছুটা সময় নেন রাজশ্রী, তারপরে ধীরে কিন্তু দ্বিধাহীন স্বরে জানান নিজের বক্তব্য।

'আমার স্বামী যে শুদ্ধ চরিত্রের পুরুষ ছিলেন না সে কথা আমি জানি; এখন বসন্তমল্লিকা, এরপূর্বে অন্য নারী, আমাদের দাম্পত্যজীবনের ধারাই ছিল এই। আমি ভবিতব্যকে মেনে নিতে পারিনি, আপ্রান চেষ্টা চালিয়েছিলাম তাঁর মন ফেরাতে, তাতে ফল উল্টোই হয়েছে ক্রমাগত। শেষে গুরুদেবের পরামর্শে কিছুদিন ধরে পিত্রালয়ে ছিলাম, আশা ছিল তিনি খোঁজ রাখবেন, বা নিজে থেকে উদ্যোগ নেবেন আমাদের ফিরিয়ে আনার। কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি, উপোরন্তু গণিকাগৃহে তাঁর যাতায়াত বেড়েছে।'

'গৃহসেবকদের কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?'

'এরা প্রত্যেকেই পুরাতন ভৃত্য, তাছাড়া আমার স্বামী অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, আমাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন না তিনি নিজের সুরক্ষার ব্যাপারে। তবে তাঁর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে কেউ যদি জিঘাংসা পোষন করে থাকে, সে কথা অন্য।'

এরপর রাজশ্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভৃত্যদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন পুষ্পকেতু। পাচক ও তার সহকারী জানায়, রোজকার মতই রন্ধন শেষ হতে তারা প্রভুর ফেরার অপেক্ষায় রন্ধনশালেই ছিল। তিনি ফিরে এলে জটাধর এসে আহার্য নিয়ে যায়। সেদিনের খাদ্যতালিকায় ছিল ঘৃত তণ্ডুল, পর্পট, কুষ্মাণ্ডের ঘন্ট, মুদ্গযুষ আর ক্ষীর। এরপর জটাধরের সাথে শুরু হয় কথোপকথন। জটাধর যুবাপুরুষ, শক্তসমর্থ চেহারা, চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ।

'কতদিন হল এই কর্মে নিযুক্ত আছ?'

'আমার পিতা উপারিকের কার্যালয়ে কর্ম করতেন, সেই সূত্রে আমি কর্ম পাই; প্রথমে কার্যালয়ের সেবক ছিলাম, পরে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ব্যক্তিগত সেবক নিযুক্ত করেন প্রভু। সেও আজ পাঁচ বৎসর

হবে।'

'তুমি কি শুধু গৃহেই তাঁর দেখাশোনা করতে?'

'আজ্ঞে না, প্রভুর সাথে সকল সময় থাকতাম, গৃহ, কার্যালয়, এমনকি নগরীর বাইরে গেলে সেখানেও।'

'বেশ, তাহলে সেদিন সন্ধ্যায় ঠিক কি ঘটেছিল বর্ণনা কর।'

'কিছুদিন যাবৎ প্রভু গৃহে ফিরতেন সায়াহ্নে, প্রায় প্রথম প্রহর গভীর হতে; সেদিনও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। গৃহে ফিরে আমাকে জানান তিনি ক্ষুধার্ত নন, আহার্য না আনতে। কিন্তু আমি বারংবার অনুরোধ করায় সামান্য আহার্য মুখে দেন। এরপর আমাকে ছুটি দিয়ে কক্ষদ্বার বন্ধ করে শুতে যান তিনি।'

'ক্ষুধার্ত ছিলেন না কেন?' এ প্রশ্ন শুনে জটাধরকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত দেখায়, একটু সময় নিয়ে সে উত্তর দেয়।

'বসন্তমল্লিকার গৃহে সুরাপানের মাত্রা বেশী হলে, গৃহে সামান্যই ভোজন করতেন; সেদিনও সম্ভবতঃ তাই হয়েছিল, নেশাগ্রস্ত ছিলেন প্রভু।'

'সম্ভবতঃ বলছ কেন, তুমি উপস্থিত ছিলে না সেখানে?'

'না, গণিকাগৃহে আমাকে নিয়ে যেতেন না তিনি, সঙ্গে রক্ষীরা থাকত তখন।'

'রাত্রে তুমি প্রভুর কক্ষের বাইরে শয়ন করতে কি?'

'না, প্রভুপত্নী পছন্দ করতেন না এই ব্যবস্থা, দ্বিতলে প্রভুর পরিবার আর তাদের দেখাশোনার জন্য জটিলা থাকত রাত্রে; আমি অন্দরের অলিন্দে শয়ন করতাম একতলায়।'

'কিন্তু প্রভুপত্নীর অনুপস্থিতিতেও ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি?'

'না, রাত্রে বাড়ী ফিরে প্রভু নির্জনতা পছন্দ করতেন, অনেক সময় গণিকাগৃহেই রাত্রিবাস করেছেন এর মাঝে।'

'উপারিক সেদিন রাতে আহার অল্পই করেছিলেন, আর পানীয়?'

'জল পান করেছিলেন; নেশা হলে তৃষ্ণা বাড়ে, আমি দুটি জলের কুম্ভিকা রেখে গিয়েছিলাম সেকারণে। সকালে দুটিই খালি পড়েছিল।'

'কুম্ভিকার জলও কি তোমাকে দিয়ে পরীক্ষা করাতেন উপারিক?'

'হ্যাঁ, করাতেন।'

'সেদিনও করিয়েছিলেন কি?'

'আগেই বলেছি তিনি নেশাগ্রস্ত ছিলেন, তবে আমি নিজহতেই পান করেছিলাম পরীক্ষার জন্য।'

***

'রহস্য জটিল হয়ে উঠছে ক্রমশঃ, পানীয় জলে বিষ ছিল কিনা এখন আর পরীক্ষার উপায় নেই, জটাধরের মুখের কথাই মেনে নিতে হবে।' উপারিকের গৃহ থেকে বেরিয়ে দণ্ডাধিকারিকের সাথে দেখা করেন পুষ্পকেতু, সেখানেই পরিস্থিতি পর্যালোচনা শুরু হয় নতুন করে।

'আপনি কি জটাধরকেই সন্দেহ করছেন কুমার?'

'সুযোগ তারই সবচেয়ে বেশী ছিল পানাহারে বিষ মেশানোর। উত্তর সীমান্ত থেকে কোনও সংবাদ পেয়েছেন কি আর?'

'না, হিসেব মত সেনা পৌছে থাকবে গতকাল রাতের মধ্যে, এরপর দূত এখানে আসতে অন্ততঃ আরও তিনদিন, শুক্লপক্ষের আগে কিছু জানা সম্ভব নয়। তবে দূর্গপতি বলভদ্র বিচক্ষণ সেনানায়ক, আমাদের সাহায্য পেয়ে প্রতিরোধে সক্ষম হবেন, এ আমি নিশ্চিত।'

'আমরা মথুরায় কোনও সংবাদ পেলাম না সীমা শত্রুর, এটা কি একটি আশ্চর্যের বিষয় নয়?'

‘বলভদ্রের প্রহরীবাহিনী একটি সীমান্তবর্তী গ্রামে কিছু অচেনা মানুষের জটলা লক্ষ্য করেছিল, আর তারপর দূরস্থ বনপ্রান্তরে রাত্রিকালে আগুনের শিখা লক্ষিত হয়, সেই থেকেই সাবধান হয়ে সাহায্য চেয়ে পাঠান তিনি। গোপনীয়তা রক্ষার্থে এই তথ্য পাঁচকান হতে দেননি দূর্গপতি।’

‘শ্রীদামের সাথে একবার কথা বলতে চাই ভদ্র, আপনি ব্যবস্থা করুন। স্বীকারোক্তি না পেলেও, অন্ততঃ কিছু আভাস যদি পাওয়া যায় তার সাথে আলাপ করে, সেই চেষ্টা করা দরকার।’ পুষ্পকেতুর কপালে চিন্তার ভাঁজ, সমস্ত ঘটনাক্রম তাঁকে গভীর অস্বস্তিতে ফেলেছে বোঝা যায়।

***

শ্রীদামের কারাকক্ষে মুখোমুখি পুষ্পকেতু ও শ্রীদাম, সাথে আছেন উল্মুকও। বাল্যবন্ধুকে সঙ্গে রাখা পরিবেশ কিছুটা লঘু করতে; প্রথাগত জিজ্ঞাসাবাদে কাজ হবে না বিশেষ এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

‘ভদ্র শ্রীদাম, আমাকে আপনার শত্রু মনে করবেন না, কান্যকুব্জের পরিস্থিতি কিছু জটিল, সেকারণে আপনার সাহায্য চাইছি আমি। আপনি এতকালের কর্মচারী, যদি এতটুকু আনুগত্য থেকে থাকে নিজ কার্যালয়ের প্রতি, অবশ্যই সব কথা খুলে বলবেন আপনি।’ পুষ্পকেতুর অনিন্দ্যকান্তি ও পরিশীলিত ব্যবহারে কিছুটা হলেও নমনীয় হয়েছেন শ্রীদাম বোঝা যায়।

‘পরিস্থিতি জটিল কিরকম?’ কৌতুহলী মনে হয় তাকে।

‘আপনি বোধকরি জানেননা, সম্প্রতি উপারিক উগ্রসেনের মৃত্যু ঘটেছে বিষক্রিয়ায়।’ সংবাদটি আচমকা পরিবেশন করে শ্রীদামের মুখভাব পর্যবেক্ষন করেন পুষ্পকেতু। সেখানে ফুটে ওঠে বিস্ময় ও শোকের ছায়া।

‘এখন খুলে বলবেন কি আপনার সব কথা? আপনার মৌনতা আমাদের ভাবতে বাধ্য করবে যে এই মৃত্যুর সাথে আপনার যোগ আছে।’

‘না, এ মিথ্যা! সর্বৈব মিথ্যা! যে অপরাধই করে থাকি আমি, প্রভুর প্রাননাশের কোনও চেষ্টা তাতে ছিল না।’

‘তাহলে দয়া করে খুলে বলুন সব কথা।’

দীর্ঘক্ষণ মৌন থেকে, বোধকরি নিজের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে সিদ্ধান্ত নেন শ্রীদাম, এরপর ধীরে ধীরে নিজের বক্তব্য জানান; তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগে মৃদু, কিছুটা স্বগোক্তির মত শোনায়; মনযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করেন দুইবন্ধু।

‘অপত্য স্নেহ বড় ভীষণ বস্তু। আমার কনিষ্ঠপুত্র প্রিয়ংকর শিশুকাল থেকেই বড় দামাল, একরোখা, বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে খেলাধুলা আর দুষ্টুমিতেই ছিল মনযোগী। তার ছোটখাটো অপরাধগুলি আমার পত্নী লুকিয়ে যেতেন আমার কাছে, কিন্তু বড় হতে মিথ্যাভাষণ, গৃহ থেকে মুল্যবান বস্তু চুরি এজাতীয় ঘটনা ঘটতেই থাকে, অনেক শাসন করেও উপায় হয় নি কিছু। শেষে, পাঁচ বৎসর পূর্বে নিজের মাতার সমস্ত অলংকার চুরি করে দেশান্তরী হয় সে। আমরা লোকলজ্জার বশে রটিয়ে দিই সে সন্ন্যাস নিতে গৃহত্যাগী হয়েছে। দীর্ঘদিন সংবাদ ছিল না তার, আমিও তল্লাস করার চেষ্টা করিনি বিশেষ। অবশেষে বছর তিনেক আগে এক পত্র পাই তার কাছ থেকে, সেটি নিয়ে এসেছিল এক ভৃগুকচ্ছের বণিক। সেই পত্রে জানতে পারি পুত্র সেই দেশেই স্থিতু হয়েছে, পশুপতি নামের এক বিত্তবান মণিকারের সাথে কাজ করছে। এরপর নিয়মিত পত্র আদান প্রদান চলেছে, পশুপতির কর্মচারী নগরে এলে নিয়ে আসত পুত্রের সংবাদ। এরপর জানতে পারি সে পশুপতির একটি কন্যাকে বিবাহ করেছে। হঠাৎ গত ভাদ্রে পশুপতি নিজে এসে হাজির হন আমার গৃহে, তিনি জানান, এক রোমক বণিক প্রিয়ংকরের বিরুদ্ধে প্রতারনার অভিযোগ এনেছে, নকল রত্ন আসল বলে বিক্রয় করেছে সে উচ্চমূল্যে। বিদেশী বণিককে প্রতারণা ঘৃণ্য অপরাধ, এর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন সে দেশে, কারাবন্দী হয়েছে পুত্র আমার। এদিকে তার পত্নী সন্তানসম্ভবা, স্বামীর চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে সেও। পশুপতি বিহ্বল হয়ে ছুটে এসেছিলেন আমার কাছে। তিনি রোমক বণিকের অর্থ ফেরৎ দিতে চেয়েছিলেন, বণিক মানতে চায় নি, দণ্ডাধিকারিকের কাছেও আবেদন জানান এ নিয়ে। অনেক মিনতির পরে

জরিমানা ধার্য হয় রোমক বণিকের প্রতারিত অর্থ ও তার সাথে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা । পশুপতির সধ্যাতীত ছিল সে জরিমানা, তাই আমার কাছে ছুটে আসেন তিনি। আমি সামান্য প্রশাসনিক কর্মচারী, এত অর্থ আমিই বা পাই কিরূপে। এদিকে বিচারের দিন এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ, মুল্য ধরে দিতে না পারলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অবধারিত। এর পরে আর স্থির থাকতে পারিনি আমি, বাধ্য হয়ে তহবিল তছরূপ করি, কিন্তু তাতেও একসাথে অত স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ আমার ক্ষমতার বাইরে। গত কয়েকমাসে কিছু কিছু করে পাঁচশত দিনার দিতে পেরেছিলাম, আশা ছিল হয়তো প্রিয়ংকরের তরুণী ভার্যার কথা চিন্তা করে অন্ততঃ দণ্ডাধিকারিকের মন গলবে। হা হতোস্মি! দণ্ডাধিকারিক জানতে পেরে যান প্রিয়ংকর মগধের নাগরিক, পশ্চিমা ক্ষত্রপদের সাথে আমাদের শীতল সম্পর্ক বাধা হয়ে দাঁড়ায় এ ক্ষেত্রে। পশুপতি সেকারণেই আবার ছুটে এসেছিলেন আমার কাছে, যেভাবেই হোক আরও কিছু অর্থ জোগাড় করে দিতেই হবে তাঁকে। এই কমাসে তাঁরও অর্থদণ্ড গেছে যথেষ্ট, উপরোক্ত ভৃগুকচ্ছে ব্যবসা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে তাঁর পক্ষে। লোকলজ্জা ও অসম্মানের ভয়ে গোপন সাক্ষাৎ ভিন্ন উপায় ছিল না। জানি না পশুপতির সম্পর্কে উপারিক কিভাবে জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু নিজমুখে নিজের কলঙ্কের কথা স্বীকার করতে পারিনি আমি! বড় বিশ্বাস করতেন আমাকে প্রভু’ ; বক্তব্য শেষ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন শ্রীদাম।

স্তব্ধ হয়ে থাকেন পুষ্পকেতু ও উল্মুক কয়েক মুহূর্ত, এই নতুন কাহিনী তাঁদের কাছে আকস্মিক।

‘আপনাকে আরও একটি সংবাদ জানানো আমার কর্তব্য, কারাবাসকালে পশুপতির মৃত্যু ঘটেছে।’ কক্ষত্যাগের আগে পুষ্পকেতু কথাটি বলে যান। সংবাদ শুনে শ্রীদামের চক্ষুদুটি জ্বলে ওঠে না জানি কোন রূদ্ধ আবেগে।

***

‘শ্রীদামের স্বীকারোক্তি কি বিশ্বাসযোগ্য, তোমার কি মনে হয় কেতু?’ কারাগৃহ থেকে ফেরার পথে প্রশ্ন করেন উল্মুক।

‘সে যতটুকু বলেছে তা সত্য, তবে সম্পূর্ণ সত্য কিনা বলা শক্ত।’

‘তুমি ঠিক কি বলতে চাইছ?’

‘ধর যদি ভৃগুকচ্ছের দণ্ডাধিকারিক, শ্রীদামের পরিচয় জেনে শুধু অর্থ নয়, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য দাবী করে থাকেন, সে বিষয়ে আমরা এখনও অন্ধকারে।’

‘এখন কি করবে ভাবছ তাহলে?’

‘আপাততঃ একবার বসন্তমল্লিকার সাথে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন, সে যদি কোনও নতুন তথ্য দিতে পারে!’

*** ***

অধ্যায় ৭

পশ্চিমাকাশে অপরাহ্নের রক্তিমাভা ছড়িয়েছে ইতিমধ্যেই, পুষ্পকেতু ও উল্মুক উপস্থিত হন বসন্তমল্লিকার আলয়ে, কিছু আগে তাঁদের আগমন বার্তা দিয়ে গেছে রক্ষী, তাই নটী অপেক্ষা করছিল রাজপুরুষদের জন্য, তার সাথে মাতৃসমা গুণধরীও উপস্থিত পরিস্থিতির গাম্ভীর্য বুঝে। হাতে সময় অল্প, বসন্তমল্লিকাকে লোকিকতার সুযোগ না দিয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন পুষ্পকেতু।

‘উপারিক কি রোজই আসতেন এখানে?’

‘হ্যাঁ প্রায় রোজই, অবশ্য যদি না কর্ম উপলক্ষে বাইরে যান।’

‘কতদিন হল তিনি আসছেন এই গৃহে?’

‘প্রায় বৎসর খানেক।’

‘আপনি কতদিন হল এই কাজ করছেন?’

‘আমার এই গৃহ অতিথিদের জন্য নূতন করে উন্মুক্ত হয় বিগত বসন্ত পূর্ণিমায়, সেদিন মল্লিকার নৃত্য দেখে ধন্য ধন্য পড়ে যায় অতিথিদের মাঝে, উপারিকও উপস্থিত ছিলেন উৎসবে, তার পর থেকেই তাঁর যাতায়াত এই গৃহে।’এবারে উত্তর দেয় গুণধরী।

‘ইনি কি আপনার কন্যা?’ পুষ্পকেতু গুণধরীকে প্রশ্ন করেন।

‘জন্ম দিইনি ওকে, তবে আমার পালিতা কন্যা অবশ্যই।’

‘ভদ্রে, দুর্ঘটনার দিন উপারিক আপনার গৃহে আসার পরবর্তী ঘটনাবলী একটু ভালো করে ভেবে আমাকে বর্ণনা করুন, সামান্য কথাও বাদ দেবেন না দয়া করে।’ বসন্তমল্লিকাকে অনুরোধ করেন পুষ্পকেতু।

‘সেদিন রোজকার মতই কার্যালয় থেকে এখানে আসেন উপারিক, তখনও দিনের আলো ছিল অল্প। এরপর নৃত্য-বাদ্য চলে বেশ কিছুক্ষণ, একটি নূতন নৃত্যাভিনয় তৈরি করেছিলাম কয়েকদিনের পরিশ্রমে, সেটি ওইদিন পরিবেশন করি। প্রভু খুশী হয়ে পারিতোষিক দেন, দেখতে দেখতে রাত্রি হয়ে আসে, তিনি থেকে যেতে চেয়েছিলেন, আমিই বারণ করি। অবশেষে রাত্রির প্রথম প্রহর গভীর হতে বিদায় নেন তিনি। এখন মনে হচ্ছে, কেন যেতে দিলাম সেদিন, এখানে থাকলে প্রাণসংশয় হতো না তাঁর।’ নটীর স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে কান্নায়।

‘আপনি থেকে যেতে বাধা দিলেন কেন সেদিন?’

‘আমার কারনে তাঁর পরিবারে অশান্তি, দুর্নাম ছড়াচ্ছে গণিকালয়ে রাত্রিবাসের ফলে, তাঁর পত্নীর কাছ থেকে সেরকমই বার্তা নিয়ে এসেছিল এক দাসী। তার বাক্যযন্ত্রণা কাতর করেছিল আমায়, গণিকারও হৃদয় থাকে আর্য, কেন ভুলে যায় গৃহবাসী মানুষ কে জানে!’ কথাকটি বলতে গিয়ে চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নামে, দিনান্তের ম্লান আলোয় এই মুখখানি কোনও নটীশ্রেষ্ঠার নয়, যেন এক অসহায় তরুণীর। নিস্তব্ধতা নেমে আসে কক্ষে কিছুক্ষণের জন্য, পুষ্পকেতু আবার শুরু করেন তারপর।

‘সেদিন উপারিক পানাহার করেছিলেন কিছ এখানে?’

‘হ্যাঁ, রোজকার মতই সুরাপান করেছিলেন, সাথে ছিল মৎস্যাণ্ড ভাজা আর পর্পট।’

‘কে পরিবেশন করেছিল সেসব?’

‘আপনি জানেন বোধহয়, তিনি পরীক্ষা বিনা কিছু গ্রহণ করতেন না। আমিই নিজে আস্বাদন করে তার পর দিয়েছিলাম পানাহার; যতবার সুরাপাত্রে তরল ঢেলেছি, আমাকে চুমুক দিতে হয়েছে পরিবেষনের আগে। সেদিন সুরাপান মাত্রা ছাড়িয়েছিল, ওঁর কারনে আমারও ঘোর লেগে গিয়েছিল।’

বার্তালাপ শেষ করে অতিথিশালার পথ ধরেন দুইবন্ধু, পুষ্পকেতু গভীর চিন্তায় অন্যমনস্ক, উল্মুক পরিবেশ হালকা করতে বাক্যালাপ শুরু করেন।

‘নটী ভারি সুন্দরী, একথা কিন্তু মানতেই হয় কি বল? এমন মুখশ্রী, দেহসৌষ্ঠব রাজ পরিবারেও সহসা চোখে পড়েনা। স্বাভাবিক ভাবেই উপারিক আকর্ষিত হয়েছিলেন তার প্রতি। নগরীর শ্রেষ্ঠ গণিকা, সে তো উপারিকের করায়ত্ব হবেই।’

‘কি বললে?’ চমকে ওঠেন পুষ্পকেতু। ‘শকট ঘোরাও, অতিথিশালা নয় দণ্ডাধিকারিকের কার্যালয়ে যাব’, সারথীকে নির্দেশ দেন তিনি।

‘হঠাৎ হল কি তোমার, অমন ক্ষেপে উঠলে যে?’

‘আজ কি তিথি?’

‘কেন, ত্রয়োদশী।’

‘মানে কাল অমাবস্যা!’

‘সেরকমই তো হওয়ার কথা জানি’, উল্মুক পরিহাস করার চেষ্টা করেন।

‘এতক্ষনে কিছুটা পরিষ্কার হয়ে আসছে অন্ধকার।’

‘বল কি হে! অমাবস্যায় আলোর দিশা! দিনে দিনে হেঁয়ালী হয়ে উঠছ তুমি।’

***

দণ্ডাধিকারিক গৃহে ফেরার উদ্যোগ করছিলেন, এর মধ্যে পুষ্পকেতুকে কার্যালয়ে ব্যস্তপায়ে আসতে দেখে অবাক হয়ে পড়েন।

‘কি ব্যাপার কুমার, আবার কিছু অঘটন ঘটল নাকি?’

‘এখনও ঘটে নি, তবে আমার ধারণা ঘটতে চলেছে খুব শীঘ্রই।’

‘একটু খুলে বলবেন কি?’

‘তার আগে আধিকারিক সুস্মিতকে এখানে আনানোর ব্যবস্থা করুন।’ পুষ্পকেতুর কথায় সুস্মিতকে আনতে তাঁর গৃহে লোক যায় তক্ষুণি।

‘উত্তর সীমায় কি পরিমাণ সেনা পাঠিয়েছেন আপনারা?’

‘অর্ধেকের অধিক সেনা গেছে সেখানে; দেড় সহস্র অশ্বারোহী, তিন সহস্র পদাতিক ও পঞ্চাশজন ধনুর্বিদ।’

‘বলভদ্রের পত্র নিয়ে কে এসেছিল এখানে?’

‘দূর্গের এক অশ্বারোহী, পত্রে বলভদ্রের নামাঙ্কিত শীলমোহর ছিল; পত্রের শীলও অক্ষত ছিল, আমি নিজে পরীক্ষা করেছি।’

‘শুধুমাত্র পত্রের ভরসায় এতবড় সেনা পাঠিয়ে দিলেন আপনারা? সাধারণতঃ সত্যতা পরীক্ষার জন্য গোপন সঙ্কেত বাক্যের ব্যবস্থা থাকে।’

‘আসলে, ঠিক তার আগের দিনই মৃত্যু ঘটেছে উপারিকের, শ্রীদামও চরবৃত্তির কারণে কারারূদ্ধ। এসকল বিষয় উপারিক নিজেই পরিচালনা করতেন, অন্য কারুকে বিশ্বাস করতেন না তিনি। আপনি কি কোনও শঠতার আভাস পাচ্ছেন এর মধ্যে? কিন্তু এরূপ পরিহাস করে কার কি লাভ?’

‘এ এক গভীর ষড়যন্ত্র, বুঝতে পারছেন না আপনি? আজ ত্রয়োদশী, কাল অমাবস্যা, কান্যকুব্জ শিবিরে সেনাবল অর্ধেকেরও কম; এদিকে নগরে বিশৃংখলা।’

‘সেনা শিবিরে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা করছেন আপনি?’

‘তার চেয়েও বেশী কিছু।’ কথাবার্তার মাঝেই আধিকারিক সুস্মিত এসে পড়েন।

‘ভদ্র সুস্মিত, আপনার কাছে কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল আমার।’

‘বলুন?’ আচমকা ডাক পেয়ে অবাক হয়েছেন সুস্মিত বোঝা যায়, তবে পুষ্পকেতুর গম্ভীর মুখভাব দেখে পরিস্থিতি অনুমান করে নেন তিনি।

‘শঙ্খবিষের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে বিষক্রিয়া বিলম্বিত করা সম্ভব কি?’

‘হ্যাঁ, সম্ভব, সেকারনেই তিলে তিলে বিষক্রীয়া ঘটাতে এই বিষ ব্যবহৃত হয়। তবে ঠিক কী পরিমাণে ও কত সময় পূর্বে এই বিষ প্রয়োগ করলে কাঙ্ক্ষিত সময়ে মৃত্যু ঘটবে তা এক অতি বিচক্ষণ বিষবিজ্ঞানী ভিন্ন নির্ধারন করা শক্ত।’

‘আপনি কি সন্দেহ করছেন একটু খুলে বলবেন কুমার’ চন্দ্রবর্মা বিহ্বল বোধ করেন অবস্থার গতিকে।

‘সব কিছুই বুঝিয়ে বলব আপনাকে, কিন্তু তার আগে বজ্রবাহুকে সংবাদ পাঠান যেন যত শীঘ্র সম্ভব দক্ষিণ সীমান্তে সেনা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। আমার ধারনা আসল বিপদ এরাকন্যার সীমান্তে। শ্রীদামের কারাবাস, তার কয়েকদিনের মধ্যে উপারিকের হত্যা, আর ঠিক তার পরের দিনই উত্তর সীমান্ত থেকে সাহায্যের বার্তা, ঘটনাগুলি কেমন পরস্পর যুক্ত নয়? কোনও বৃহত্তর স্বার্থে যদি এই ঘটনা গুলি পরপর ঘটানো হয়ে থাকে, তবে তার উদ্দেশ্য কি হতে পারে? শ্রীদামের কারাবাস হলে, উপারিক একা হয়ে

পড়বেন, উপারিকের মৃত্যু ঘটলে, প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়বে, আর সেই সুযোগে উত্তরে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে দক্ষিণসীমা অবহেলিত হবে।'

'কিন্তু এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেব শুধুমাত্র অনুমানের উপর ভিত্তি করে?' চন্দ্রবর্মা তখনও দ্বিধাগ্রস্ত।

'বেশ তবে অপেক্ষা করে থাকুন; পরবর্তী ঘটনাবলী আমি বলে যাচ্ছি, সময় হলে মিলিয়ে নেবেন। কাল অমাবস্যার রাত্রে কান্যকুব্জ শিবিরে অগ্নিকাণ্ড জাতীয় কিছু গোলমাল সৃষ্টি হবে, তাতে ছত্রভঙ্গ হবে শিবির, এই সুযোগে বজ্রবাহূর প্রাণনাশের চেষ্টাও হতে পারে। একই রাত্রে এরাকন্যা দুর্গে বিদিশার সেনা আক্রমণ করবে আতর্কিতে, দুর্গ থেকে সংবাদ পাঠালেও সেই রাত্রের মধ্যে সাহায্য পৌঁছানো অসম্ভব হবে। দিবাকাল শুরু হতে হতে এরাকন্যা চলে যাবে বিদিশার দখলে। এরপর পাটলীপুত্রে সংবাদ প্রেরণ, পুনরায় যুদ্ধ এতকিছু দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি, নানা বিষয়ে ব্যস্ত সম্রাট ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের জন্য আবার যুদ্ধে আগ্রহী না হতেও পারেন। অতএব, এরাকন্যা পুনর্দখল করতে পারলে সবমিলিয়ে লাভবান হবে বিদিশাই, বুঝতে পারছেন তো?'

পুষ্পকেতুর ব্যাখ্যা শুনে শীতের রাতেও ঘামতে শুরু করেন চন্দ্রবর্মা, এত কঠিন পরিস্থিতিতে এর আগে কখনও পরেননি তিনি। অবশেষে বজ্রবাহূকে সবকথা বিস্তারে জানিয়ে পত্র পাঠানো স্থির হয়, পত্র নিয়ে যাবেন কান্যকুব্জের মহাপ্রতিহারী স্বয়ং।

'উপারিকের হত্যা কি তবে জটাধরই করেছে বলে আপনার সন্দেহ? জটাধর খাদ্য পরীক্ষা করেছে কিনা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় লক্ষ্য করেননি উপারিক, সে তো বোঝাই যাচ্ছে।' পত্রপ্রেরণ শেষে কার্যালয়েই রাত্রির আহারের বন্দোবস্ত হয়েছে, আহার করতে করতে প্রশ্ন করেন চন্দ্রবর্মা।

'দেখুন আমার মতে বিষ প্রয়োগ যেই করে থাকুক, হত্যার জন্য দায়ী বিদিশার রাজসিংহাসন। হ্যাঁ, তবে জটাধর এর মধ্যে যুক্ত নয়।'

'সে ছাড়া আর কারই বা সুযোগ ছিল?' প্রশ্ন করেন উল্মুক।

'বসন্তমল্লিকা। হ্যাঁ বিষপ্রয়োগ সেই করেছিল সুরাভাণ্ডে।'

'কি বলছ কেতু! সে নিজে প্রতিবার পান করেছে সেই সুরা পরিবেশনের আগে।'

'গুপ্তচরতন্ত্রের বড় হাতিয়ার গুপ্তহত্যা, আর গুপ্তহত্যার গুরুত্বপূর্ণ সেনানী বিষকন্যা, শোননি সেকথা?'

'বসন্তমল্লিকা বিষকন্যা?' চন্দ্রবর্মা ও উল্মুক সমস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

'দরিদ্র ঘরের সুন্দরী কন্যাদের শিশুকালেই সংগ্রহ করে অল্পমাত্রায় বিষপ্রয়োগের মাধ্যমে বিষে অভেদ্য করে তোলা হয়, এদের বেশীরভাগই সইতে পারেনা এই প্রক্রিয়া, অকালেই প্রাণ যায় তাদের। কিন্তু যারা উত্তীর্ণ হয়, নৃত্য, বাদ্য, লাস্য এবং রতিশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে তারা হয়ে ওঠে এক একটি ভীষণ অস্ত্র। জানি এদের সম্পর্কে অনেক রকম উপকথা শোনা যায়, যে এদের নিঃশ্বাসে বিষ, অঙ্গ স্পর্শ করলেও মৃত্যু; কিন্তু সেসব কল্পকথা। আসলে এরা বিষবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ এবং এদের শরীর সাধারণ মানুষের তুলনায় অধিক মাত্রায় সহ্য করতে পারে বিষের প্রকোপ। সেইদিন রাত্রে উগ্রসেন নেশাগ্রস্ত নয়, বিষগ্রস্ত ছিলেন, সেকারনেই স্বাভাবিক বুদ্ধিদৃপ্তি কাজ করছিল না গৃহে ফিরে, অতিরিক্ত তৃষ্ণার কারণও ওই শঙ্খবিষ। বসন্তমল্লিকাও পান করেছিল সুরাপাত্র থেকে, তারও ঘোর লেগেছিল বিষ থেকে।'

'এখন তাহলে কি কর্তব্য কুমার? রক্ষী পাঠাই নটীকে গ্রেপ্তার করতে?'

'এখনই নয়, আমরা ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছি জানলে, হয়তো শত্রুপক্ষ কালকের পরিবর্তে আজকেই আক্রমণ করবে। আগে বজ্রবাহূকে প্রস্তুত হতে দিন, আমরা ভোর রাত্রে যাব গণিকাগৃহে।'

*** ***

অধ্যায় ৮

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর গত প্রায়, বাইরে শৃগাল ও পেচকের ডাক ভিন্ন আর কোনও শব্দ নেই। তনুশ্রীর শয়নকক্ষের জানালায় করাঘাত, মৃদু অথচ স্পষ্ট।

'কে? কে ওখানে?' সচকিত হয়ে প্রশ্ন করে ওঠে সে।

'আমি চারুদত্ত, চিৎকার করোনা, জানালার কপাট খোল।'

'আপনি? এপথ দিয়ে!' জানালার লাগোয়া একটি আম্রবৃক্ষ, সেটির সাহায্যে উপরে এসেছেন শ্রেষ্ঠী সন্দেহ থাকে না। তনুশ্রী তাড়াতাড়ি কপাট খুলে ভিতরে নিয়ে আসে তাঁকে। কালো চাদরের ভিতরে বসুদত্তের যোদ্ধার সাজ আজকে, বুকে বর্ম, কোমরে তরবারি। বিস্ময় মাত্রা ছাড়ায় তনুশ্রীর।

'সকল কথা বলার সময় নেই এখন, শুধু জানতে চাই আমার সাথে যাবে তুমি শ্রী?'

'কোথায়?'

'এই দেশ ছেড়ে অন্য কোনখানে, যেখানে মগধ সাম্রাজ্যের ছায়া পড়বে না।'

'কিন্তু কেন? দেশান্তরী হতে চান কেন প্রভু?'

'যদি বলি এই দেশ আমার নয়, তবে?' তনুশ্রীর মুখভাবে পরিবর্তন দেখা দেয় ধীরে, যেন কিছু বুঝতে চেষ্টা করছে সে।

'আপনি বিদেশী! তবে কি গুপ্তচর? ব্যবহার করেছিলেন আমায়?'

'হ্যাঁ গুপ্তচর একথা ঠিক, বসন্তমল্লিকার সাথে যোগাযোগ রাখতেই এই গৃহে আমার যাতায়াতের শুরু। কিন্তু বিশ্বাস কর, তোমাকে সত্যিই ভালবেসেছি আমি, যেমনটি আর কাউকে কখনও বাসিনি। বল প্রিয়ে যাবে আমার সাথে?'

'না! চলে যান আপনি এই মূহূর্তে, আর কখনও যোগাযোগের চেষ্টা করবেন না', অবরূদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে তনুশ্রী।

'তবে কি তুমি বিশ্বাস করোনা আমার অকপট প্রেমে? ভালোবাসনা আমায়?' মধ্যবয়সী প্রেমিকের কণ্ঠস্বরে নবযুবকের আকুলতা; কয়েক মূহুর্তের জন্য বুঝিবা নিজেকে হারিয়ে ফেলে গণিকা।

'আপনাকে বিশ্বাস করি, জানি আপনি হৃদয়বান, মহৎপুরুষ। কিন্তু আমাদের পথ আর কোনোদিনই এক হতে পারে না। আপনাকে ভালোবাসি ভদ্র, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভালোবাসি আমার মগধকে; চলে যান আপনি' ; কান্নায় ভেঙে পরে সে।

'তুমি অসামান্যা, নারীশ্রেষ্ঠা, আশীর্বাদ করি জীবনে সুখী হও।' কথাগুলি ধীরে উচ্চারণ করে আবার জানালা পথে অদৃশ্য হন বিদিশার গুপ্তবাহিনীর সেনানায়ক চন্দ্রচূড়।

ভোর হয়ে আসে, পূবের আকাশ গৈরিক আচ্ছাদনে ধ্যানগম্ভীর; স্তব্ধ তনুশ্রী দূরপানে চেয়ে বসে থাকে জানালার প্রান্তে। এই পথ চাওয়া বুঝি আর শেষ হবে না তার কোনোদিন।

***

কয়েকজন রক্ষী সাথে নিয়ে ভোর হতেই বসন্তমল্লিকার গৃহে হানা দিয়েছেন চন্দ্রবর্মা; সাথে আছেন পুষ্পকেতু ও উল্মুক। গৃহরক্ষী ও দাসীদের বাধা উপেক্ষা করে নটীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন সকলে। এত ভোরেও বসন্তমল্লিকা জেগেই ছিল, বসন ভূষন দেখে মনে হয় সে অপেক্ষায় ছিল কারও।

'আপনারা?' চমকে ওঠে সে দণ্ডাধিকারিকের ক্ষুদ্র দলটিকে দেখে।

'উপারিককে হত্যা ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বন্দী করতে এসেছি তোমাকে, স্বপক্ষে কিছু বলার থাকলে তুমি বলতে পার।'

‘ওঃ, এই ব্যাপার। আপনাকে কাল দেখেই ভয় হয়েছিল আর্য, বুঝিবা সব বৃথা গেলো শেষ অবধি’, পুষ্পকেতুর দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বলে ওঠে নটী।

‘তোমাকে যেতে হবে আমাদের সাথে’, কথাটি বলে এক রক্ষীর দিকে ইঙ্গিত করেন চন্দ্রবর্মা। সে হাত বাঁধতে যেতেই ছিটকে সরে যায় বসন্তমল্লিকা, আর সেই সাথে চকিতে কোমর থেকে বের করে আনে একটি ক্ষুদ্রছুরিকা, সেটি আমূল বসিয়ে দেয় সে নিজের বক্ষে।

‘এ কি করলে?’ পুষ্পকেতু ছুটে যান তার ভূপতিত দেহটিকে তুলে ধরতে।

‘আমাদের মত রমনীর জীবনে সমাপতন এ ভাবেই আসে দেব। আপনাকে দেখে বড় ভালো লেগেছিল, জানি আপনি মহৎপ্রাণ, কথা রাখবেন।’এটুকু বলেই হাঁপাতে থাকে বসন্তমল্লিকা, তার নাক মুখ থেকে রক্ত ছলকে ওঠে।

‘যদি দেশদ্রোহীতা না হয়, অবশ্যই রাখব তোমার অনুরোধ, তুমি বল।’

‘গুণধরী আর তনুশ্রী আমার সত্যকার পরিচয় জানে না, বেশ কিছুকাল আগে তীর্থ থেকে ফিরছিল গুণধরী, আমি পথে তার পায়ে পড়ে আশ্রয়ভিক্ষা করি। সরল বিশ্বাসে আমায় কাছে টেনে নিয়েছিল সে, মেয়ে বলে পরিচয় দিয়েছিল সমাজে। ওদের আপনারা শাস্তি দেবেন না দয়া করে।’ নিজের হাতদুটি জোড় করার চেষ্টা করে সে, অশ্রু ঝরে পড়ে চোখের কোন বেয়ে।

‘বেশ, কথা দিলাম; প্রমাণ না পেলে তাদের বন্দী করা হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হও।’ পুষ্পকেতুর আশ্বাসবাণী শুনে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে তার ঠোঁটের কোণে, আর সেই সাথে স্থির হয়ে যায় আঁখি পল্লব।

***

‘ভদ্র শ্রীদাম, আপনার অপরাধ গম্ভীর, কিন্তু তা দেশদ্রোহিতা নয়, একথা জেনেছি আমরা। আর সেকারনেই একটি সাহায্য চাইছি আপনার কাছে।’ কারাকক্ষে শ্রীদামের সাথে আবার দেখা করতে গেছেন পুষ্পকেতু।

‘বলুন কি জানতে চান?’

‘পশুপতির সম্পর্কে উগ্রসেনকে কে সংবাদ দিয়েছিল, অনুমান করতে পারেন কি?’

‘অনুমান নয়, দৃঢ় ভাবেই বলতে পারি কে সে।’

‘কে সে?’

‘স্বর্ণকার ধনঞ্জয়। এর আগেও দু একটি বিদেশী চরের সংবাদ সে এনেছিল, কিন্তু ধরা পড়েনি তারা কেউই, এমনকি অকাট্য প্রমানও কিছু মেলেনি তাদের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি উপারিক তাকে বেশ কিছু অর্থ দেবার নির্দেশ দেন, এখন আমার ধারণা সে-ই পশুপতির ব্যাপারে তাঁকে জানিয়েছিল, আর সেকারনেই এই পারিশ্রমিক।’

***

ধনঞ্জয়ের গৃহে হানা দিয়ে দেখা গেলো বাইরে থেকে কপাট বন্ধ, গৃহ শূন্য। পরিবার পরিজন কেউ থাকত না তার সাথে, শয্যা দেখে মনে হয় ভোর রাত্রেই গৃহ ত্যাগ করেছে সে।

‘আমার মনে হয়, বসন্তমল্লিকা তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল, দুজনে নগর ত্যাগ করত লোক চলাচল শুরু হবার আগেই। তবে আমাদের গণিকালয়ে ঢুকতে দেখে ধনঞ্জয় একাই পলায়ন করেছে‘; পুষ্পকেতু মন্তব্য করেন।

'এখন বজ্রবাহূর কাছ থেকে সংবাদের অপেক্ষা, আপনার অনুমানের উপর ভিত্তি করে অনেক বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছি কুমার।'

'পশ্চাতাপ হচ্ছে কি এর জন্যে?'

'না, তবে উদ্বেগ হচ্ছে কিছুটা বলতে দ্বিধা নেই।'

চন্দ্রবর্মার উদ্বেগ দীর্ঘস্থায়ী হয়না, মধ্যরাত্রে সংবাদ আসে, এরাকন্যা দুর্গ আক্রমণ করতে গিয়ে পরাজিত হয়ে পিছু হঠেছে বিদিশার সেনা। তাদের পিছু নিয়ে সেনাপতি সত্যনাগকে বন্দী করেছেন বজ্রবাহূ। দুইদিন পরে উত্তর সীমান্ত থেকে দূত মুখে সংবাদ আসে, ভুয়ো লিপি পেয়ে অযথা সেনা পাঠানো হয়েছিল উত্তরে, তারা এখন ফিরতি পথে দিন দুয়েকের মধ্যেই কান্যকুব্জে পৌঁছবে।

***

দুইমাস কেটে গেছে, পাটলীপুত্রে ফিরেছেন দুইবন্ধু। হরিষেণের গৃহে একান্ত সাক্ষাতে পুষ্পকেতুর সাথে আলাপ করছেন মহামন্ত্রী।

'তোমাকে নতুন করে আর কি অভিবাদন জানাব বৎস! শ্রীধরবর্মন বিনাশর্তে বশ্যতা স্বীকার করেছেন, পরিবর্তে তাঁকে মগধ রাজছত্রের হয়ে নিজ রাজ্য শাসনের অনুমতি দিয়েছেন সম্রাট, সত্যনাগও মুক্তি পেয়েছেন, তবে তিনি সেনাপতি পদ থেকে অব্যহতি নিয়েছেন। শ্রীধরবর্মনের দ্বিতীয়া কন্যাটির সাথে কুমার মকরগুপ্তের বিবাহ স্থির হয়েছে। এই উপলক্ষে সম্রাট আগামী পূর্ণিমা তিথিতে রাজসভায় তোমাকে সম্মানিত করতে চান, প্রস্তুত থেক।'

'এ আমার পরম সৌভাগ্য দেব, আপনার কাছে আমি চির ঋণী।'

'ও কথা বোল না পুত্র, নিজের আলোকেই তুমি উজ্জ্বল, বুদ্ধিমত্তার সাথে, যে কোমল হৃদয়টি তোমার আছে, ধরে রেখো তা চিরকাল। কল্যাণ হোক।'

***

পায়ে হাঁটা গ্রাম্যপথ, তার একপাশে বয়ে যাচ্ছে বেত্রবতী নদী, ছায়াঘেরা বন পেরিয়ে যতদূর চোখ যায় উন্মুক্ত প্রান্তর। শ্বেত শুভ্র পোশাক, পক্ককেশ, হাতে যষ্ঠী, কিন্তু ঋজু দেহ; দৃঢ় পায়ে হেঁটে চলেছেন এক বৃদ্ধ। যুদ্ধ, ক্ষমতার পরিবর্তন, ষড়যন্ত্র, শত্রু-মিত্র, বিজেতা- পরাজিত, সকল ঘটনা ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে ঐতিহাসিকের পরিপ্রেক্ষিতে; কিন্তু এসবের আড়ালে রয়েছে কতজনের আদর্শ, আত্মত্যাগ, আকিঞ্চন, তার খবর কে রাখে? শঙ্কুদেব চলেছেন প্রয়াগের উদ্দেশ্যে, একা; এই তীর্থযাত্রা তাঁর পশ্চাতাপ, না আত্মানুসন্ধান কে বলতে পারে?

*** ***

লেখকের টিকা:

সাঁচীর কনকেড়া শিলালিপি ও এরান বা এরাকন্যার একটি প্রস্তরলিপি থেকে রাজা শ্রীধরবর্মন ও তাঁর নাগবংশীয় সেনাপতি সত্যনাগের উল্লেখ পাওয়া যায়, সত্যনাগ মথুরার রাজা গণপতি নাগের শ্যালক ছিলেন। এরাকন্যায় সমুদ্রগুপ্তের নামাঙ্কিত একটি শিলালিপি ও বিজয়স্তম্ভ থেকে ধারণা করা যায় যে পরবর্তীকালে শ্রীধরবর্মন সমুদ্রগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। এই উপন্যাসিকায় যে সব ঐতিহাসিক

ঘটনার উল্লেখ আছে অর্থাৎ মথুরার নাগবংশের উচ্ছেদ, এরাকন্যার দখল এবং পরে যুদ্ধে পরাজিত শ্রীধরবর্মনের কন্যার সাথে গুপ্ত রাজবংশের বৈবাহিক সম্পর্ক, পশ্চিমা ক্ষত্রপদের সাথে সমুদ্রগুপ্তের শীতল সম্পর্ক এগুলি সবই প্রমাণিত তথ্য। বাকি গল্প আমার কল্পনা প্রসূত, তবে কোথাও আমার কল্পনা যুক্তিকে লঙ্ঘণ করেনি।

দুরূহ শব্দের অর্থ :

কিংশুক – কৃষ্ণচূড়া, মন্দার – পলাশ, উপারিক – রাজ্যপাল, পাচক – রাঁধুনি, পরিবস্ত্র – পর্দা, মন্দুরা – নীচু ডিভান, গুরুরত্ন – পোখরাজ, মরকত – পান্না, নিধানিকা – তাক, উরুবেলা – বর্তমান বুদ্ধগয়া, শঙ্খবিষ – সেঁকোবিষ বা আর্সেনিক